5.

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ।
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

वर्ग संख्या
Class No. B 294.5

पुस्तक संख्या
Book No. S 786

रा० पु०/ N. L. 38.

MGIPC—S4—9 LNL/66—13-12-66—1,50,000.

তন্ত্রের আলো

* *
*

শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার

*
* *

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স
৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ : '৫৪

B
294.
S 78

NATIONAL LIBRARY
No. 1544
Date 7.8.56
CALCUTTA

SHELF

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশার্স, ৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—১২, হইতে প্রকাশিত।

* * *

শ্রীফণিভূষণ রায় কর্তৃক প্রবর্ত্তক প্রিণ্টিং এণ্ড হাফটোন লিঃ ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—১২, হইতে মুদ্রিত।

RARE BOOK

* *
*

দাম : চার টাকা

তন্ত্রের আলো

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের
শ্রীচরণ কমলে—

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
তন্ত্র-সাধনায় ভূমিকা	...	...	১
শিব-তত্ত্ব	...	...	৬
শক্তি ও তত্ত্ব	..	..	৭
শিব ও শক্তি	...	...	৯
সাংখ্য ও তত্ত্ব	...	...	১১
পরম জিজ্ঞাসা	...	...	১৪
শক্তি-তত্ত্ব	..	...	১৬
শক্তির উন্মেষ	...	...	২৫
সদ্বিদ্যা	...	...	৩৪
সম্ভূতি	...	...	৪১
সম্ভূতির স্বরূপ	...	...	৪৭
জীব ও ঈশ্বর	...	...	৫৪
মানস ও অতিমানস জ্ঞান	...	...	৬২
কাল ও দেশ	...	...	৭২
দর্শন ও রহস্যবাদ	...	...	৮৪
বিদেহ ও জ্যোতির্দ্দেহ	...	...	৯৬
অধ্যাত্ম-যজ্ঞ	...	...	১১৩
শব্দছন্দ ও জ্যোতিশ্ছন্দ	...	...	১২০
অধ্যাত্মবহ্নি : অগ্নি, সূর্য্য, সোম	...	...	১২৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
তন্ত্র : বেদান্ত : পাতঞ্জল	১৩৩
বেদান্ত ও তন্ত্র	১৩৩
তন্ত্র ও পাতঞ্জল যোগ	১৩৬
তন্ত্র ও পাতঞ্জল যোগে সমাধি ও সাধনা	১৪১
ছন্দঃ ও সমাধি	১৪৩
শক্তি ও কলা	১৪৫
তন্ত্রের সাধনা ও সিদ্ধি	১৫২
কুণ্ডলিনী যোগ	১৫২
কুণ্ডলিনী ও জীবনীশক্তি	১৫৩
কুণ্ডলিনীর কূজন	১৫৭
শক্তির কেন্দ্র	১৬২
দীক্ষা ও শক্তিপাত	১৭১
উপসংহার : তন্ত্র ও জীবন	১৮৬

* * *

তন্ত্র-সাধনার ভূমিকা

ভারতবর্ষের সাধনায় তন্ত্রের একটি বিশেষত্ব আছে। উপনিষদের জ্ঞান তন্ত্রে অনাদৃত হয়নি, বরং তন্ত্রের সাধনার শেষ ভূমিকা শিব-উপলব্ধি ব্রহ্ম-উপলব্ধিরই স্বরূপ। তন্ত্রের পূর্ণ দীক্ষায় এই অদ্বৈত জ্ঞানের উন্মেষ। পরন্তু তন্ত্র মানব জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন সাধনা। জীবন-কোরকের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় বিদ্যায়, ছন্দে, বীর্য্যে, শ্রীতে, সম্পদে, প্রতিষ্ঠায়, অমৃতে, অভয়ে। একদিকে তন্ত্র যেমন দেয় সূক্ষ্ম ভোগ ও যোগৈশ্বর্য্য এবং ইচ্ছাশক্তির অপূর্ব্ব বিকাশ, অন্য দিকে তেমনি তন্ত্র-সাধককে ব্রহ্ম-ভূমিকায় করে প্রতিষ্ঠা। তন্ত্র-সাধনায় জ্ঞান, শ্রী ও আনন্দ, সব কিছুর উন্মেষ শক্তিকে স্বীকার করেই হয়। শক্তিই তন্ত্রের সর্ব্বস্ব। এই শক্তি অপূর্ব্বতার বিকাশ করে,—সত্তার ঊর্দ্ধগ্রাম, মধ্যগ্রাম, নিম্নগ্রাম শক্তির স্পন্দনে ঝঙ্কৃত হয় এবং আলোকসম্পাতে দীপ্ত ও স্বচ্ছ হয়। কোথাও এতটুকু তামসিক আবরণ থাকে না। সমস্ত সত্তাকে দীপ্ত করে' ক্রিয়াশীল করা তন্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য না হ'লেও, তান্ত্রিক সাধনার উহা আনুষঙ্গিক ফল। জীবন-বেদিকায় সত্য ও শক্তির প্রতিষ্ঠা এর মুখ্য কার্য্য হ'লেও, জীবনবাদের পূর্ণ স্বীকৃতি ও তার আহ্বান তন্ত্র-সাধনার বিশেষত্ব। জীবনের তুচ্ছ বা মহান, কোন বিকাশকেই তন্ত্র অস্বীকার বা অনাদর করে না। বস্তুতঃ জীবন শক্তিতেই ধৃত ও পুষ্ট; এই শক্তির আহ্বানে জীবনের অস্ফুট-বিকাশকে স্ফুট, অরমণীয় বিকাশকে রমণীয় করে' তুলে। পূর্ণ জীবনের আহ্বান তন্ত্রের পরমাকর্ষণ। সাধনার প্রতি পদে প্রাণ স্পন্দিত হয় বৃহত্তর প্রাণশক্তিতে, বিজ্ঞান স্ফূর্ত্ত হয় বৃহত্তর দীপ্তিতে, শক্তি স্ফীত হয় পূর্ণতর শক্তির সংবেগে। তন্ত্রের দৃষ্টিতে এই মূলীভূত শক্তি সৃষ্টির সকল পর্য্যায়ে ক্রিয়াশীল। দেবতা, মানব, গন্ধর্ব্ব এই শক্তির ছন্দে উজ্জীবিত। তন্ত্র সাধনায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রি

জীবনের স্বাধীন গতি। শুধু তাই নয়, শক্তির সঙ্গে একান্ত ঐক্য অনুভূতিতে দিব্য মহিমা, জ্ঞান ও সত্তার লাভ।

তন্ত্রের সাধনার বহু সম্ভাবনা আছে। মানুষী সম্পদ ও বৃত্তিকে তন্ত্র লাঘব জ্ঞান করেনি, বরং তার পূর্ণতা সম্পাদন করবার চেষ্টা করেছে। মানুষের ভিতর সুপ্ত বরণীয় ও রমণীয় শক্তির উদ্বোধন করে' তন্ত্র-সাধনা মানব জীবনকে শুদ্ধতর, বৃহত্তর করে। সত্তাকে ছন্দোবদ্ধ করে' প্রাণসঞ্চারে ও বিজ্ঞানদীপ্তিতে উদ্ভাসিত করে; স্মৃতি ও মেধাকে দীপ্ত করে' সূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয় দেয় এবং কল্যাণময় জীবনছন্দে বিশ্বের অপরূপ সৌন্দর্য্যে সাধককে অভিষিক্ত করে।

তন্ত্র-সাধনা পূর্ণ সাধনা। সত্তার নিম্নতম কেন্দ্র হ'তে উচ্চতম কেন্দ্রের বিকাশ এ সাধনায় স্বতঃই স্ফূর্ত্ত হয়, যেহেতু সত্তার কেন্দ্রগুলি একই সূত্রে গ্রথিত। ঊর্দ্ধলোক হ'তে বিজ্ঞানের আলোকে অধঃলোক দীপ্ত করে' সত্তাকে বৃহত্তর প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করতে থাকে। ভক্তি, যোগ, জ্ঞান ও আনুষ্ঠানিক শাস্ত্রীয় কর্ম্ম তন্ত্রে স্বীকৃত। তন্ত্র কোন মতবাদের প্রতিষ্ঠা নয়, জ্ঞানের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি। সাধনার লক্ষ্যে এ পথে যা-কিছুর উপযোগিতা আছে, তা সাদরে গৃহীত হয়েছে। অবশ্য প্রত্যেক সাধনার সিদ্ধিবিশেষ আছে; যা কাম্য, সাধনায় তাই উপস্থিত হয়। সাধনা বিশেষের সকল ইঙ্গিতই তন্ত্রে আছে। পারিবারিক ধর্ম্ম, উপাসনাধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম, ধর্ম্মচক্র প্রতিষ্ঠা, সবারই বিবৃতি তন্ত্রে আছে। জীবনের সফলতার এমন পরিপূর্ণ নির্দ্দেশ অন্যত্র অল্পই দৃষ্ট হয়। মনে হয়, তন্ত্র যেন সমস্ত গোটা জীবনের আলেখ্য। মানবজীবনকে সমষ্টির সত্তা হ'তে বিচ্ছিন্ন করে' তন্ত্রে দেখা হয়নি। মানুষের সূক্ষ্ম দিব্য জগতের সহিত অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ তন্ত্রে স্বীকৃত। জীবনের শোভনতর বিকাশ ও মহিমা এই দিব্য সত্তার সংস্পর্শে সার্থক হয়।

দেবতাবাদ তন্ত্রে মুক্তভাবে স্বীকৃত। দেবতা তন্ত্র-সাধনায় প্রত্যক্ষী-

ভূত হয়, তাদের শক্তি মানুষের পক্ষে কার্য্যকরী হয়। দেবতা শক্তিরই স্ফুটতর বিকাশ। দেবতা মন্ত্ররূপী। মন্ত্র ছন্দরূপী। ছন্দ অব্যক্ত শক্তির ব্যক্ত বিকাশ। ছন্দই দেবতারূপে মূর্ত্ত। শক্তি অনন্ত ছন্দে উল্লসিত। এই উল্লাস রমণীয়, দীপ্ত প্রাণের মূর্চ্ছনায় সঞ্জীবিত। এই জন্যই দেবতায় শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে দিব্য রূপে ও ছটায় বিভূষিত। মন্ত্র-ছন্দে সাধকে দেবতার আবেশ। শক্তি-তরঙ্গে চিত্ত-সত্তায় দিব্য ভাবের উদ্দীপ্তি—শ্রী, তেজ, স্বচ্ছতা, মহিমার প্রকাশ।

দেবতার বোধ ও বিকাশ মন্ত্র-ছন্দের ফলবিশেষ হ'লেও, তন্ত্র-উপাসনা কিন্তু এতেই আবদ্ধ হয়নি। জীবনের আরও উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর পরিণতি হয় যখন মন্ত্র চিত্তের পটভূমিকা ভেদ করে' ভক্তির কল্যাণ-ছন্দ ও জ্ঞানের প্রশান্ত মহিমা স্পর্শ করে। এই জন্য দেবতা-উপাসনা ব্রহ্মোপাসনা হ'তে পৃথক্। দেবতার উপাসনায় দৃষ্টি বিশেষ বিষয়ে আবদ্ধ। ব্রহ্মোপাসনায় দৃষ্টি উদার, এমন কি সূক্ষ্ম ও কারণ জগতেও আবদ্ধ নয়। এই কার্য্য ও কারণ ব্রহ্মবিজ্ঞান, অনাবরিত সত্তা স্বরূপমুক্তির কারণ। উপাসনা দেয় কার্য্য ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ পুরুষের সন্ধান এবং শক্তির সবিশেষ ছন্দের স্থানে নির্ব্বিশেষ রূপ ও নির্ব্বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান ও প্রতিষ্ঠা।

তন্ত্রের কৌশল অদ্ভুত। সত্তার স্তরের পর স্তর উন্মোচন, বিভিন্ন শক্তির পরিচয়, ক্রমশঃ উর্দ্ধ সত্তা ও শক্তির দিকে অগ্রসর। কামনা-বহ্নির সমতায় গভীর সত্তায় উর্দ্ধ শক্তি ও ভক্তির উন্মেষ, যা দেয় জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা। তন্ত্রে ভক্তির বিশেষ স্থান আছে; হৃদয়-ক্ষেত্রের শুদ্ধি আনে ভক্তি। ভক্তির স্ফুরণে হৃদয়ে স্বচ্ছতা ও আনন্দ এবং মহাশক্তির উন্মেষ—এই মহাশক্তি বদ্ধ-সৃষ্টি ছিন্ন করে' জ্ঞানের উদার স্থিতি ও প্রশান্তিতে দেয় প্রতিষ্ঠা। ইহাই তান্ত্রিক উপাসনার চরম ফল। অবশ্য অন্যান্য উপাসনাবিশেষও দেয় আনন্দের মূর্ত্ত ও সুখময় বিকাশ। ভক্তি

দিব্যভাবে সত্তাকে সঞ্চারিত করে' মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। ভক্তির আতিশয্যে সাধক আনন্দ-ছন্দানুরাগে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে উচ্চতর সম্ভাবনাকে অনুসরণ না করে'।

তন্ত্র-সাধনায় চিত্তসত্তার প্রসারতায় ও পরিচ্ছন্নতায় মন অধিকতর শক্তি-সম্পদের অধিকারী হয়—সাধারণ মানবত্বে অন্তর্নিহিত অতি-মানবত্বের প্রকাশ হয়। তন্ত্রের সাধক মুক্তিই শুধু লাভ করে না—এই শরীর সর্ব্ববিধ মলশূন্য হওয়ায় অশেষ শক্তি-বিকাশের আধার হয়। বেদান্ত মতে প্রারব্ধ অবশ্য ভোক্তব্য। তন্ত্র-মতে শক্তির দ্বারা প্রারব্ধও উৎক্রান্ত হওয়া যায়। কারণ, শক্তি-সঞ্চারে ও অনুপ্রবেশে প্রাচীন সংস্কারের ও কর্ম্মের বিলীন ও নবীনের সংগঠন সম্ভব হয়। শক্তির অনুপ্রেরণা নিয়ত হয় এবং শক্তির অঙ্গীকারে, আহ্বানে ও অনুপ্রবেশে সাধকের শক্তির সঙ্কীর্ণতা ও প্রাচীন সংস্কার ও অভুক্ত কর্ম্মধারার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী করে' তুলে। শক্তির অবতারণায় মানুষের চিত্ত-সত্তা হয় উজ্জ্বল আর ব্যাপকরূপে ক্রিয়াশীল। এরূপ অতিমানসিক শক্তির আধারস্বরূপ সাধন-সিদ্ধ পুরুষেরা তাঁদের সূক্ষ্ম শক্তির দ্বারা মানবসমাজকে লক্ষ্যে ও অলক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করে' দিব্য সমাজ ও ধর্ম্মচক্র সংস্থাপন করে' থাকেন। স্বরূপোপলব্ধ পুরুষের এমনি শক্তি! মহাশক্তির আধার হয়ে শক্তি বিকীরণ করে' মানব-সংহতি ও ধর্ম্মচক্র সৃষ্টি করেন। এই জন্য তন্ত্রসিদ্ধ সাধকেরা অধ্যাত্ম-চক্র পরিকল্পনা করেন। এই চক্রে হয় সমষ্টিগত অধ্যাত্মশক্তির জাগরণ ও শক্তিব্যূহের রচনা। এই অধিকার তান্ত্রিক যোগেই সম্ভব। সাংখ্যাদি মার্গে এরূপ সম্ভাবনা নাই, বা থাকলেও তা আদৃত হয় না; কারণ, শক্তিকে বা প্রকৃতিকে অতিক্রম করাই সেখানে লক্ষ্য।

চিত্ত-সত্তা পুঞ্জীভূত শক্তি-স্পন্দন। শক্তির সঙ্কোচে ইহার সঙ্কোচ। শক্তির সঙ্কোচ দূরীভূত হ'লে চিত্ত-সত্তা হয় ব্যাপক এবং সকল

সঙ্কুচিত স্বার্থ হ'তে মুক্ত। এরূপ উদার, ব্যাপক সত্তায় জীবনের কোন সংবেগ থাকে না। এরূপ চিত্ত-সত্তে বিশ্ব প্রতিবিম্বিত হয়; এরূপ চিত্তবিশিষ্ট পুরুষ ঈশ্বরবৎ বিচরণ করেন। উদার সঙ্কল্পের দ্বারা বিশ্বের কল্যাণে নিযুক্ত হন। উন্মুক্ত জ্ঞান দেয় অবাধিত সঙ্কল্প। সেই সঙ্কল্প করে বিশ্বের কল্যাণের উদ্বোধন ও ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তন।

জীব ও ঈশ্বরের ভেদ চিত্তের বদ্ধ ও উন্মুক্ত ভাব নিয়ে। চিত্তের সম্প্রসারণেই অস্ফুট ঈশ্বরত্বের সঞ্চার। এই সম্প্রসারণে জীবত্বের ক্ষীণতা এবং উদার সার্ব্বভৌমিক সত্তার বিকাশ যা সর্ব্বদেশে ও কালে এক অবাধিত চেতন-সত্তার অনুভব করে। বিস্ময়ের বিষয়, তন্ত্রসিদ্ধ সাধক সঙ্কল্পের দ্বারা বিরাট ও অণুপরিণাম লাভ করতে পারে; বিরাটত্ব ও অণুত্ব শক্তির প্রসার ও সঙ্কোচেরই নামান্তর। অথচ সাধক কোনটিতেই বদ্ধ হয় না; মুক্ত-চেতনার স্বভাবই এই। মুক্ত পুরুষ এইভাবেই বিচরণ করেন, কিন্তু তাঁর স্বাধিকার ব্রহ্মৈক্যতা কখনও লুপ্ত হয় না। এই স্বাধিকারসম্পন্ন হয়ে' তন্ত্রসাধক স্বাধীনভাবে চিত্তের সঙ্কোচ ও প্রসার করে। কারণ, এই দুইই হ'ল তাঁর উপাধি—স্বরূপ নয়; উপাধি স্বেচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বিশ্বব্যাপারের জন্য।

* * *

শিব-তত্ত্ব

ভারতের সংস্কৃতিতে তন্ত্রের স্থান কি এবং কোথায় তা জানতে হ'লে উপাসনার স্বরূপানুসন্ধান করতে হয়। এমন প্রদেশ নাই যেখানে তন্ত্র প্রবর্ত্তিত কোন না কোন সাধন-প্রণালী দেখতে না পাওয়া যায়। বৈদিক সাধনার পর এরূপ সার্ব্বভৌমিক সাধনা আর দৃষ্ট হয় না। বিশেষ অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, ভারতীয় সাধনার একটি মূল ভিত্তি আছে—কোন কোন অংশে ভেদ থাকলেও, এদের নিগূঢ় রূপ প্রধানতঃ একরূপ, যদিও প্রণালীর ভিতর আপাতদৃষ্টিতে ভেদ প্রতীয়মান হবে।

যতটা বোঝা যায়, তাতে মনে হয়, দার্শনিক মতবাদ যাই হোক না কেন, সকল দর্শনে তত্ত্বোপলব্ধি করার জন্য অনুশাসনের ও উপাসনার প্রবর্ত্তন হয়েছিল, কারণ তত্ত্ব সাক্ষাৎকার শুধু মনন দ্বারা হয় না, মননের পর ধ্যানের অবশ্যম্ভাবিতা আছে। এই ধ্যানে নানা তত্ত্বের স্ফুরণ এবং ধ্যানালোকে লব্ধতত্ত্বই পরম শ্রেয়ের কারণ। এজন্য বোধ হয় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি সাধনার পথ ছিল এবং সেই সব পথ তন্ত্রে উক্ত হয়েছে। তন্ত্র ঠিক বিচার-শাস্ত্র নয়, ইহা পূর্ণাববোধের জন্য যোগানুশাসন। তন্ত্র যোগ ও উপাসনা শাস্ত্র। সম্প্রদায় বিশেষের নানা সাধনার কথা তন্ত্রে (যেমন শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি) থাকলেও, তন্ত্রের আলোচনা করলে একটা জিনিষ স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, তত্ত্বানুভাবকে দ্বার করে' একটা মহাসমন্বয় তন্ত্র-শাস্ত্রের পরম প্রতিপাদ্য। তন্ত্রের মতবাদের উৎপন্ন হয়েছে অনুভূতির ক্রমস্তর হ'তে। এইসব স্তরকে নিয়ে তন্ত্র প্রত্যেক মতবাদের যথাযথ স্থান বিন্যাস করতে চেষ্টা করেছে।

তন্ত্র-শাস্ত্রে যেমন নিগমের কথা আছে, তেমনি আগমের কথাও আছে।

সৃষ্টি ও তার বিচার হ'ল দার্শনিকের ও তত্ত্বজ্ঞের প্রধান কথা। যিনি সৃষ্টির উদ্গম স্থান ও লয়ের কেন্দ্রস্থানের বিষয় সম্যক্ পরিচিত, তিনি যথার্থ তত্ত্ববেত্তা। এই জন্যই তন্ত্র-শাস্ত্র এমনি কৌশল উদ্ভাবন করেছে যাতে আরোহক্রমে চেতনার স্তরে স্তরে সৃষ্টিতে অনুপ্রবেশ এবং অবরোহক্রমে সৃষ্টির স্তরের উপর স্তরের চেতনায় অনুপ্রবেশ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়। এ বিদ্যা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ বিদ্যা। বিন্দুমাত্র সংশয়ের কোন কারণ থাকে না। সাধনার সাথে সাথে শুধু সামান্য জ্ঞান নয়, বিশেষ বিজ্ঞান হয়। এই বিজ্ঞানেই পরমপুরুষার্থ। এজন্য তন্ত্র কোন বিচার-বিতর্কের মধ্যে প্রবিষ্ট না হয়ে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, কারণাতীত বা পরম কারণ সত্তার সন্ধান দেয়। তত্ত্ব এক বা বহু, তন্ত্রে ইহা বিচারের বিষয় নয়—উপলব্ধির বিষয়, এবং উপলব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে তন্ত্রে দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, অদ্বৈত সকল তত্ত্বের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন মতের কারণ হচ্ছে সত্তার নানা স্তরে ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধি ;—যার সাধনার ক্রম যেরূপ, তার উপলব্ধিও তদ্রূপ। বাহ্যদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে, তন্ত্রের এত সাধনা বুঝি পরস্পর ভিন্ন ও কথঞ্চিৎ বিরোধী। বস্তুতঃ তা নয়। তন্ত্রে উপলব্ধির স্তরভেদে তত্ত্বের নির্দ্দেশ করেছে এবং উপলব্ধির সামঞ্জস্য করতে চেষ্টা করেছে।

শক্তি ও তত্ত্ব :

শক্তি তন্ত্র-সাধনার প্রধান স্তম্ভ। এই শক্তির স্ফুরণে নানা তত্ত্বের ও পরমতত্ত্বের অনুভব। শক্তি কি—এই হ'ল তন্ত্রের প্রধান কথা। বেদান্ত (অদ্বৈত) শক্তিকে অনির্ব্বচনীয়রূপে প্রতিপন্ন করেছে। পূর্ণরূপে সৎ নয়, অথচ অসৎ বা অলীক নয়—এই জন্য শক্তি অনির্ব্বচনীয় ; শক্তিকে অপেক্ষা ক'রেই বিশ্ব রচনা। অন্যান্য বেদান্তে (যথা দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি) শক্তি নিত্য পদার্থরূপে অঙ্গীকৃত হয়েছে। তন্ত্রে

শক্তি নিত্য তত্ত্ব। অদ্বৈত বেদান্ত শক্তির অনাদিত্ব স্বীকার করলেও, অনন্তত্ব স্বীকার করেনি, কারণ মুক্তির ভূমিকাতে শক্তির শুধু বিলয় নয়—পূর্ণ বাধ হয়। এইজন্যই অদ্বৈত বেদান্তে শক্তির সকল বিকাশের স্বীকৃতি থাকলেও, তার তাত্ত্বিকত্বের স্বীকৃতি নেই।

তন্ত্রের এ বিষয়ে মত ভিন্ন। শক্তি তন্ত্রমতে নিত্য পদার্থ। এর উন্মেষ, বিকাশ, নিমীলন আছে, কিন্তু পূর্ণ বাধ নেই। শক্তি অনাদি, অনন্ত। শক্তির সহিত পরমতত্ত্ব (Reality) শিবের সম্বন্ধ অভিন্ন। শিবে আশ্রিত হয়ে শক্তি বিরাজ করে এবং অবিরাম সৃষ্টির ও গতির কারণ হয়। এ বিষয়ে বৈষ্ণব ও শৈবাগমে কোন মতভেদ নেই। উভয়ই শক্তিবাদী। কিন্তু শক্তির প্রকাশের রূপ নিয়ে মতভেদ আছে। বৈষ্ণবমতে শক্তির বিকাশ বিশেষ বিকাশ, নির্ব্বিশেষ বিকাশ নয়। এইজন্যই কি লীলা বিভূতিতে, কি নিত্য বিভূতিতে শক্তির বিকাশ রূপে ও লীলায়। শক্তির স্বরূপ নানারূপে ও নানাভাবে বিজ্ঞানের বৃত্তিতে ও আনন্দের লহরীতে প্রকাশ পায়। এ বৃত্তির অফুরন্ত বিকাশ বিশ্বাতীত সত্তায় সর্ব্বত্রই নাম ও রূপ নিয়ে হয়—কখনও যদি সকল স্মৃতি চ্যুত হয়ে বিকাশ হয়, তাহা ক্ষণিক—স্মৃতিতেই বিজ্ঞানে আনন্দে উদ্ভূত হয়ে বিকাশের পূর্ণত্ব ও মূর্ত্তত্ব লাভ করে। আনন্দালোকে এই মূর্ত্তত্বের অবভাস—অবশ্য বিকাশ মূর্ত্ত হ'লেও, তার ব্যাপকত্ব আছে—শক্তির স্বভাবই এই—মূর্ত্ত হয়েও ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হওয়া। শক্তির সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ প্রকাশ আছে। শুধু মূর্ত্ত-বিশ্বে নয়, অমূর্ত্ত-বিশ্বেও শক্তির বিকাশ আছে—যা উদার, প্রশান্ত ও রূপহীন। শক্তির এখানে পরিণাম নেই, আছে প্রকাশ। শক্তি তরঙ্গায়িত হ'লেও তার কম্পন কোন রূপ নেয় না। এই শক্তি পরাশক্তি, সর্ব্বদাই শিবে অবস্থিত, নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ স্পন্দনে সঞ্চারিত। সবিশেষ স্পন্দনে নাম ও রূপের জগৎ প্রকাশিত, নির্ব্বিশেষ স্পন্দনে নাম-রূপের অতীত

বিশ্বের প্রকাশ। বিশ্ব-বিকাশে শক্তির প্রাথমিক বিকাশ নির্ব্বিশেষ; এর পূর্ব্বে শক্তি শিবে স্তিমিত। এই অবস্থান একটা স্পন্দীভূত অবস্থা (equilibrium), একে নিমীলন বলা হয়। সত্যই এখানে স্পন্দহীন শক্তি সকল-প্রকাশ ও সৃজন-সঞ্চারশূন্য হয়ে থাকে। এ অবস্থা পরম শিবের অবস্থা, নির্ব্বিশেষ স্থিতির অবস্থা। সকল প্রযত্নের লয়ের অবস্থা; জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়াশূন্যের অবস্থা। সাধারণতঃ শৈবাগমে এর নাম "শূন্য"। শূন্য শব্দটা বৌদ্ধ যুগের পর হ'তে ব্যবহৃত হয়; বৌদ্ধ-নির্ব্বাণকে অনুরূপ ইঙ্গিত করবার উপায় না থাকবার জন্য শূন্য বলেই অভিহিত করা হয়। বস্তুতঃ এটা অতিমানসিক তত্ত্ব (supra-conceptual), একে কোন মানসিক পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। তেমনি শৈবাগমে পরম তত্ত্বকে শূন্য বলা হয়; এও অতিমানসিক, সকল সংজ্ঞা ও ধারণা বা জ্ঞানের অতিরিক্ত তত্ত্ব, কোন ধারণার বা জ্ঞানের বিষয় নয়, তাই একে বলা হয় "শূন্য"। তাই বলে এটা "কিছু নয়" এ-ও নয়, "এটা কিছু" এ-ও নয়। "কিছু" বা "কিছু নয়", এ হ'ল মানস জ্ঞান। "কিছু নয়" বল্লেও নির্দ্দেশ, "কিছু" বল্লেও নির্দ্দেশ; পরতত্ত্ব এসব নির্দ্দেশের অতীত। অতএব এসব মানস ধারণা হ'তে মুক্তির নির্দ্দেশের জন্য একে "শূন্য" বলা হয়।

শিব ও শক্তি :

শিব "শূন্য" হ'লেও শক্তির আশ্রয়। শক্তির সঞ্চারে এই বিশ্ব ও বিশ্বাতীত বিশ্বের উৎপত্তি। তন্ত্র এই শক্তির ধৃতির ও ক্রিয়ার আশ্রয় শিবে দেখতে পান। রহস্যের বিষয় হচ্ছে, এই শক্তি কি উন্মীলনে, কি নিমীলনে কোন আশ্রয় বা স্থিতি ভিন্ন থাকতে পারে না। এইজন্য শক্তির স্বরূপভূত বিকাশ একটা কেন্দ্র অবলম্বন করে' হয়। এই কেন্দ্র পূর্ণরূপে মানস ধারণার অতীত; যখন কেন্দ্র বলে' তাকে

অভিহিত করা হয়, তাকে সঙ্কীর্ণ করা হয়। গতি যতই কেন্দ্রাভিমুখী হয় ততই কিন্তু এরূপ কেন্দ্রের কথাই মনে হবে; কেন্দ্র কোন বিশেষ কেন্দ্র নয়, এ কেন্দ্রে যেন সকল কেন্দ্রেরই—বিশ্বের ও বিশ্বাতীত প্রকাশের—লয় হয়। অতএব কেন্দ্র-সংজ্ঞা সাধারণ সংজ্ঞা—শুধু বুঝাবার জন্য—এর কোন স্থির প্রত্যয় নেই। কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টিতে একথা খুবই সত্য যে, প্রকাশ ও শক্তির পশ্চাতে একটি ধৃতি আছে, যাকে অবলম্বন করে' শক্তির উন্মেষ। এই ধৃতি "শূন্য" বা পরমসত্তা। এই ধৃতিই বিশ্ব-মূল; স্বরূপ তার যতই অবোধ্য হউক, এটুকু কিন্তু ভাষায় না বলে' উপায় নেই, নতুবা ধৃতিহীন ও কেন্দ্রহীন বিশ্বের কল্পনা করতে হয় (cosmic pointlessness)। সৃষ্টি শুধু গতি, কোথাও ধৃতি নেই—একটা নিরবচ্ছিন্ন গতি, কিন্তু পশ্চাতে কোন অবস্থিতি বা ধৃতি (Reality) নেই—এরূপ অবৈধ কল্পনা তন্ত্রে কোথাও নেই, কেননা তা অনুভব-যুক্তিবিরুদ্ধ। অনুভব হচ্ছে শক্তি কেন্দ্রস্থিত। কেন্দ্রচ্যুত হয়ে শক্তি কোথাও থাকে না। শুধু শক্তির স্ফুরণ বা প্রবাহ অনুভবে পাওয়া যায় না। সকল অনুভূতির মূল স্ব-সংবেদ্য জ্ঞান। অভিজ্ঞতা বলে দেয় কিরূপে সেই জ্ঞানের আশ্রয়ে ক্রিয়ার সঞ্চার এবং তাতেই আবার তার লয়। ইহা যুক্তিবিরুদ্ধও বটে; কেননা, সঞ্চরণশীল শক্তি কেন্দ্রহীন হ'লে শক্তির বিকাশ নিরর্থক ও অর্থহীন হয়ে পড়ে। শক্তির নিরবচ্ছিন্ন বিকাশের কোন অর্থই হয় না। যদি শক্তির কোন মূল না থাকে—তাহ'লে শক্তির নির্ব্বিশেষ বা সবিশেষ রূপের কোন সার্থকতা থাকে না।

উত্তরে বলা যেতে পারে, শক্তির এইই স্বরূপ; এবং শক্তি যখন অতিমানস তত্ত্ব, তার বিকাশের অর্থেরই বা দাবী করা কেন? তার স্বভাবই অবিরাম সৃজন, অবিরাম গতি শক্তিরই স্বরূপ; অর্থ সেখানেই পরিস্ফুট যেখানে শক্তির রুদ্ধ-প্রবাহে প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার।

গতির এই কেন্দ্রশূন্যতা ও অবিরাম গতির, তার স্বরূপ, আদি ও অন্ত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রতিক্রিয়া দৃষ্টিশক্তিকে রুদ্ধ-গতিতে আবদ্ধ করেছে, তার অবিরাম নৃত্যপরায়ণা সচঞ্চল গতির মহিমাকে আবৃত করেছে।

কিন্তু শক্তির এই অবিরাম মুগ্ধকর গতির সাক্ষ্য দেয় কে? যে সাক্ষ্য দেয় সে ত গতিস্বরূপ নয়। গতির সাক্ষী গতি কখনই হ'তে পারে না। প্লেটোও হিরাকলিটাসের দর্শনের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, শুধু গতি-প্রবাহ স্বীকার করলে জ্ঞানের সম্ভাবনা আদৌ থাকে না। কোন জ্ঞানই হ'তে পারে না যদি স্থিতিশীল কিছু না থাকে। প্রবাহ, গতি, স্পন্দনকে বরণ করে' নিই, যেহেতু জীবনের বিকাশ এর ভিতর দিয়ে। কিন্তু বিকাশের মূলে যে ধৃতি, তাকে বাদ দিলে তত্ত্বের হয় হানি। গতির সাক্ষী না থাকলে গতির কোন প্রকাশ হয় না। গতির সাক্ষী তো গতি হ'তে পারে না। অতএব বলতে হবে শক্তি বা গতি পরম-তত্ত্ব হ'তে পারে না। এই কারণে তন্ত্র-শাস্ত্রে ধৃতির আশ্রয়ে গতিকে কল্পনা করা হয়েছে। তত্ত্ব শুধু ধৃতিও (Being) নয়; কারণ, গতিহীন ধৃতিতে বিশ্ব-বিকাশের কোন উপাদান থাকে না। এ বিশ্ব-বিকাশের মূলে আছে শক্তি। তাই তন্ত্রে শিব-ই তত্ত্ব নন, শক্তি-ই তত্ত্ব নন। তত্ত্ব শিব-শক্তি।

সাংখ্য ও তন্ত্র :

তন্ত্রের সহিত সাংখ্যের, বিশেষতঃ সাধনায় অনেক সাদৃশ্য। তন্ত্র কিন্তু সাংখ্যের দ্বৈত পুরুষ ও প্রকৃতির বিভিন্নতা স্বীকার করেনি। সাংখ্যের পুরুষ দৃশি, চেতনা। প্রকৃতি সৃজন-শক্তি—পুরুষের সান্নিধ্যে পুরুষকে সৃজন দ্বারা, ভোগ ও লয়ের দ্বারা মোক্ষ দিবার জন্য চেষ্টিত। শক্তির স্পন্দনে সৃষ্টি। পুরুষ তা উপহিত হয়ে ভোগ করে। চিত্তের অবসিত অধিকারে প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় মোক্ষ নিষ্পন্ন হয়।

তন্ত্র শুদ্ধ-পুরুষে বিভিন্ন উপাদানে সৃষ্টির বা লয়ের আনন্দ গ্রহণ করেনি। ভোগ ও মোক্ষ, সৃজন ও লয়, তন্ত্র মতে নিত্য শিবে অবস্থিত। শক্তিরই দুই রূপ প্রকাশ, এক কেন্দ্রচ্যুত (eccentric) সঙ্কুচিত প্রকাশ, আর এক কেন্দ্রগ ও ক্রমপ্রসারিত প্রকাশ; এই প্রসারতায় শক্তির স্থূল হ'তে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হ'তে কারণ, কারণ হ'তে কারণাতীত অবস্থা প্রাপ্তি। সঙ্কোচ অপসারণে শিবে স্পন্দনশূন্য স্থিতি। শক্তির দুই অবস্থা—সৃষ্টিতে শক্তি দ্বান্দ্বিক ভাব প্রাপ্ত হয়। কেন্দ্রচ্যুতি হ'লে শক্তি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে ক্রিয়াশীলা হয়। এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে শক্তি দ্বিধা বিভক্ত হয়। বিন্দু (frequency) শ্বেত ও রক্ত ভাব প্রাপ্ত হয়। শ্বেতবিন্দু স্থির, রক্তবিন্দু ক্রিয়াশীল। এই জন্য শ্বেতবিন্দুকে বলা হয় শিব, রক্তবিন্দুকে বলা হয় শক্তি। বস্তুতঃ শ্বেতবিন্দু শক্তির প্রাথমিক অবস্থা। সঞ্চার আরম্ভ হ'লেও, সঞ্চরণ প্রকট নয় বলেই শ্বেতবিন্দুকে শিব বলা হয়। কিন্তু শক্তির আধিক্য (frequency) যখন বর্দ্ধিত হয়, তখনই রক্তবিন্দুর আবির্ভাব—এখানে স্পন্দন অধিকতর হবার ফলেই ক্রিয়ার প্রকাশ। শ্বেতবিন্দুতে স্পন্দনের এত আধিক্য না থাকার জন্য ক্রিয়া হ'তে স্থিতির প্রকাশ বেশী। প্রাথমিক প্রকাশ শক্তির নির্ব্বিশেষে প্রকাশ, কোন বিশেষরূপে সঞ্চারিত না হয়েই শুদ্ধ বিন্দুর প্রকাশ। বিন্দুর কথা তন্ত্রের বিশেষ কথা। এ কথার পর্য্যালোচনা পরে করা হবে। এখানে শুধু লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, তন্ত্র সাংখ্যের ন্যায় শক্তিকে পৃথক্ তত্ত্বে পর্য্যবসিত করেনি—শক্তি নিত্য পদার্থ। মহাশক্তি বা পরাশক্তি প্রকৃতির ঊর্দ্ধে ক্রিয়াশীল,—এখানে আভাস (expression) আছে, পরিণাম নেই। প্রকৃতিতে পরিণাম আছে, আভাস নেই। বস্তুতঃ এই শক্তির আভাস ও পরিণামের ভেদ বিশেষরূপে না বুঝতে পারলে সাংখ্য হ'তে তন্ত্রের (শৈবাগমের ও বৈষ্ণবাগমের) পার্থক্য বোঝা যাবে

না। এই আভাসবাদ ও পরিণামবাদ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে। এ শক্তি অতিমানস-তত্ত্ব—কারণ শক্তি শিবেরই স্বরূপ। শক্তি প্রাথমিক স্তরে স্পন্দীভূত অবস্থায় থাকলেও, এর প্রকাশ হয় সহজ ও স্বাভাবিক। যেহেতু বিকাশই এর স্বভাব। অধ্যাপক হোয়াইটহেড (Whitehead) শক্তিকে প্রাথমিক সৃজন-বৃত্তি (primordial creativity) বলে' অভিহিত করেছেন, যা হ'তে বিচিত্র নবীনের আগম (creativity is the princple of novelty)। সকল রূপের (forms) পশ্চাতে আছে এই সৃজন-শক্তি। পরিণামী সৃষ্টির মূলে যে প্রকৃতি আছে, তা পরিণামী বিকাশের মূল মহাশক্তিরই ছায়া। এই অপরিণামী বিকাশের বিশ্ব আমাদের জগৎ হ'তে পৃথক—সতত প্রযত্নশীল, সতত প্রকাশশীল। এখানে শক্তির ক্রিয়া প্রসারিত, কোথাও সঙ্কুচিত নয়। ই প্রসারিত শক্তির স্পন্দনের যখন প্রাথমিক সঙ্কোচ প্রাপ্তি, তখনই াথমিক "আমি-বোধের" সৃষ্টি। এই 'আমি' বিশাত্মা বোধেরও তীত। কেন্দ্ররূপে চৈতন্যের এখানে প্রথম স্ফুরণ।

অতএব দেখা যাচ্ছে পরম শিবে "আমি" বোধ নেই—কারণ, এরূপ ধিও সঙ্কোচ-বৃত্তি। কিন্তু সঙ্কোচ বলতে বুঝব না চেতনার ীর্ণতা প্রাপ্তি; সঙ্কোচ বলতে বুঝব নির্ব্বিশেষ চেতনার প্রাথমিক ংভাবের স্ফুরণ। অহংভাব তো নির্ব্বিশেষ চেতনায় থাকে না, তনা সেখানে পূর্ণ সমতাযুক্ত এবং সকল সঞ্চারের অতীত। শিব তত্ত্বে ান পৃথকীকরণ (differentiation) থাকতে পারে না। কোন ন্ত্রী-বোধ বা ভাব এতে থাকে না। কারণ সকল আপেক্ষিকতা হ'তে মুক্ত অবস্থা। শক্তি সঙ্কোচ ও বিকাশের আশ্রয় হ'লেও, শক্তির । এর কোন বৃদ্ধি বা লাঘব হয় না। শক্তির কোন ক্রিয়া একে করে না, যদিও এর আশ্রয়ে শক্তি ক্রিয়াশীল।

শিব ও শক্তি একই তত্ত্ব—সকল সম্বন্ধের অতীত। সম্বন্ধ ধারণা

করা—একটা পদ্ধতি হয়েছে বলে' বলতে হয়; এদের সম্বন্ধ অবিনা সম্বন্ধ। তত্ত্ব দুই হ'লে প্রকৃত সম্বন্ধ ধারণা করা যায়। কিন্তু যেখানে তত্ত্ব এক সেখানে এ ধারণার কথাই ওঠে না। ধৃতির দিক দিয়ে দেখলে শিবই তত্ত্ব আর গতির দিক দিয়ে দেখলে শক্তিই তত্ত্ব। বস্তুতঃ ধৃতি ও গতি একই তত্ত্ব। ধৃতি-গতি নিয়ে তত্ত্ব অখণ্ড।

পরম-জিজ্ঞাসা :

কথাটা আরও পরিষ্কার হবে, যদি জ্ঞান ও ক্রিয়ার সম্বন্ধের বিচার করি। বস্তুতঃ বেদান্তে, সাংখ্যে, তন্ত্রে পরম-জিজ্ঞাসা হচ্ছে, জ্ঞানে ক্রি[illegible] আছে কি না? জ্ঞান সক্রিয় ব্যাপার কি না?—না, পূর্ণরূপে ক্রিয়াহীন[illegible] সাংখ্যের উত্তর দৃশি-স্বরূপ পুরুষ-তত্ত্বে কোন ক্রিয়া নাই, ইহা নিষ্ক্রিয় ক্রিয়া প্রকৃতির সঞ্চার, পুরুষে ইহার কোন উন্মেষ নাই—এমন [illegible] অবভাসরূপ ক্রিয়াও পুরুষে নাই; বেদান্তে পর-তত্ত্ব নিষ্ক্রিয়, নির্বিক[illegible] জ্ঞানঘন, জ্ঞানস্বরূপ। তন্ত্রের মত বিভিন্ন। জ্ঞানের সহিত ক্রি[illegible] সম্বন্ধ অভিন্ন—অর্থাৎ জ্ঞান নিষ্ক্রিয় নয়। জ্ঞানের বিস্তৃতির স[illegible] ক্রিয়ার বিস্তৃতি। জ্ঞানের বৃদ্ধিতে শক্তির বৃদ্ধি। কথাটা রহস্য[illegible] বলে মনে হয়। দেখতে পাওয়া যায়, জ্ঞানের পরিসরতায় শ[illegible] স্পন্দীভূত বিকাশ। স্থূল-বুদ্ধির নিকট সংঘাতেই শক্তির স্ফু[illegible] যেখানে সংঘাত নেই, সেখানেও শক্তি ক্রিয়াশীল অতি সূক্ষ্মর[illegible] কিন্তু অব্যাহত রূপে। শক্তির সূক্ষ্মতর গতি আমাদের উদ্ভাসিত [illegible] না, তাই মনে হয় পরম প্রশান্তির ভিতর যেন কোন শক্তি [illegible] শক্তি সেখানে সকল ক্ষুদ্র-বৃত্তি লয় করে' তার নির্বিশেষ স্বরূপের [illegible] ধাবিত। এই শক্তি মহা বা পরম-শক্তি। এখানে শক্তি উ[illegible] ব্যাকৃত প্রসার নেই—এ অব্যাকৃত। এ অব্যাকৃতে দ্বন্দ্ব নেই [illegible] শক্তি নেই—এ কথা সত্য নয়।

দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া হ'তে উন্মুক্ত-জ্ঞান যেমন স্বরূপে স্থিত, তেমনি ব্যক্ত প্রকাশ হ'তে মুক্ত-শক্তি স্বরূপে ধাবিত। জ্ঞানের সমতায় শক্তির সমতা। জ্ঞানের নিরুপাধিকতায় শক্তির নির্ব্বিশেষতা। এ ভাবে জ্ঞানের ও শক্তির অভিন্নতা। জ্ঞানেরই উন্মেষ ভিন্ন শক্তি আর কিছু নয়। জ্ঞানের পূর্ণ স্থিতি-স্বরূপতা ভিন্ন শিব আর কিছু নয়। তন্ত্রের লক্ষ্য শিবত্ব উপলব্ধি ; কারণ, শিবই পরম বস্তু ও তত্ত্ব। এই শিব-তত্ত্বের উদ্বোধন না হওয়া পর্য্যন্ত সাধনায় ঊর্দ্ধগতির বিরাম নেই। শক্তির প্রগতি যত মহিমাময় হোক না কেন, শিব-তত্ত্বের উপলব্ধিতেই পূর্ণ পুরুষার্থ। শিব-মহিমার নিকট শক্তির প্রগতি এবং দ্যোতনাও তুচ্ছ। অবশ্য শক্তির ঊর্দ্ধ প্রগতিতেই আবার সত্যেরও সম্যক্ পরিচয়।

* *
*

শক্তি-তত্ত্ব

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে তন্ত্রের প্রধান স্তম্ভ শক্তি। একে বলা হয় 'প্রকাশ' (আবৃত আত্মস্বরূপজ্যোতির) (বারিবষ্যা রহস্য)। এই শক্তির জ্ঞান এবং স্বরূপ বোঝা আবশ্যক। এর উপর নির্ভর করে' তন্ত্র-তত্ত্বের সম্যক্ এবং পূর্ণ সাধনা। শক্তির স্বরূপ জ্ঞান হ'তে অভিন্ন। জ্ঞানের সঞ্চারে শক্তির প্রকাশ। জ্ঞানের প্রকাশই শক্তি। জ্ঞান স্পন্দীভূত হয়ে প্রকাশশীল হয়। এই প্রকাশশীলতা শক্তিতেই সম্ভব। জ্ঞানের দুটি অবস্থা—(১) স্থির, নিষ্কম্প ভূমিকা, (২) সঞ্চারীভূত, প্রকাশশীল অবস্থা। একে বলা হয় 'বিমর্ষ'। এই প্রকাশশীল অবস্থাই শক্তির প্রধান ভূমিকা। জ্ঞান প্রকাশশীল হ'লে আনন্দ ও ক্রিয়ার প্রকাশ। এই প্রকাশশীলতার মূলে আছে ইচ্ছা (will)। ইচ্ছা, আনন্দ, ক্রিয়া এ সবই শক্তির বিমল বিকাশবিশেষ। এদের মূলে আছে নিত্য অবভাস। বারিবষ্যা রহস্যে বলা হয়েছে, শক্তির নৈসর্গিকী স্ফুরণ আছে (নৈসর্গিকী স্ফুরত্তা বিমর্ষরূপাঽস্যবর্ত্ততে শক্তিঃ)।

প্রাথমিক জ্ঞান নিজের স্বরূপেই থাকে, তাতে কোন প্রকাশ থাকে না—কারণ তা নির্ব্বিশেষ (indeterminate)। এই নির্ব্বিশেষ জ্ঞানে সবিশেষের (determinate) বীজ অন্তর্নিহিত। নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ তন্ত্রমতে বিরুদ্ধ পদার্থ নয়। শক্তির স্ফুরণে নির্ব্বিশেষই সবিশেষ। যেখানে শক্তির স্ফুরণ নেই, সেখানেই নির্ব্বিশেষ আর যেখানে শক্তির স্ফুরণ, সেখানেই সবিশেষের বিকাশ। নির্ব্বিশেষে সবিশেষের উন্মেষ সৃষ্টির প্রাথমিক বা সূক্ষ্ম অবস্থা। তন্ত্রে নির্ব্বিশেষ বস্তু একেবারেই শক্তিহীন বা শক্তিশূন্য নয়। শক্তি শিবেরই প্রকাশ-শক্তি, ধৃতিরই স্পন্দিত অবস্থা। এই স্পন্দনে একটা কালিকত্ব (Periodicity) আছে, অর্থাৎ শক্তির স্পন্দিত ভাব নিত্য নয়—প্রকাশোন্মুখ অবস্থায় থাকে, লয়ে থাকে না। লয়ে

শিব-ভাব প্রধান, প্রকাশে শক্তি-ভাব প্রধান। কিরূপে নিত্য শিব-স্বরূপ অবভাস শক্তির স্ফুরণে অমূর্ত্ত হয়েও মূর্ত্ত হয়, তা কল্পনার অতীত। তবে এই বলা যায়, শক্তির সঞ্চার হলেই নির্ব্বিশেষ শিবস্বরূপতার ভেতর প্রাথমিক শক্তির বিকাশ কোন রূপ নেয় না; এখানে শক্তির উদার বৃত্তি যেন শিবকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। শিবস্বরূপতা হতে চ্যুত হয়েও যেন শক্তি শিবের ন্যায় বিরাজ করে। তন্ত্রসাধনায় যাঁরা কুশল তাঁরা শক্তির একটা বৃত্তিবিশেষের কথা বলে থাকেন—ব্যাপিনী বৃত্তি। ইহা শক্তির সঙ্কোচ বৃত্তি নয়, উদার ও প্রশান্ত বৃত্তি। নিস্তরঙ্গ অবস্থা চ্যুতি হলেই শক্তির প্রকাশ মহাশূন্যে লীলায়িত হয়, দেশ বা কালে আবদ্ধ হয় না। এই লীলায়িত ব্যাপিকা-বৃত্তি শিবের স্বরূপেই প্রতিভাত। শক্তির প্রাথমিক সঞ্চরণ কালেই হবে—এ ধারণা মানস ধারণা। মন কালে শক্তির সঞ্চরণ দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু অতিমানস স্বরূপভূত প্রকাশ কালের অতীত—এখানে কাল নেই। কাল তখনই সুস্পষ্ট হয়, যখন শক্তির প্রকাশ ক্রমিকরূপে হতে থাকে। অক্রম প্রকাশে সাধারণ কাল নেই। অক্রমিক প্রকাশ যুগপৎ প্রকাশ। বস্তুতঃ যুগপৎ বলাও ঠিক হবে না, কারণ দৈহিক বা কায়িক ব্যবধান বা ক্রম এখানে নেই। এ এক রকম স্তর যা মানস ধারণার অতীত, মানস ধারণায় সুব্যক্ত হয় না। দেশের ব্যবধান, কালের ক্রমিক ভাব এ অবস্থায় থাকে না। অতএব এ অবস্থাতে শক্তির সাধারণ রূপ, যা দেশ বা কালে মূর্ত্ত হয়ে প্রকাশ পায়, তা থাকে না।

এখানে শক্তি শিবের সহিত অভিন্ন হয়ে প্রকাশিত। ভেদ-সৃষ্টি এখানে হয় না। এ অবস্থা নিষ্ক্রিয়। সক্রিয় হলেও, নিষ্ক্রিয়ই যেন সক্রিয়—এই জ্ঞান হয় সুস্পষ্ট। অভেদ ধারণা এ স্তরে। কারণ এখানে শিব ও শক্তি প্রায় অবিভাজ্যরূপেই (undifferentiated) থাকে, যদিও সঞ্চরণশীলতা ও সঞ্চারভাব তাদের শক্তিত্বের ও শিবত্বের

নির্ণায়ক হয়। এমন কি কোন কেন্দ্রও রচনা করে না; যদিও তা[illegible] স্বভাব কেন্দ্র সৃষ্টি করা। শিব তো কেন্দ্রহীন কেন্দ্র, কালে তার কো[illegible] অবস্থিতি (location) নাই—স্থিতিস্বরূপের অবস্থিতি কল্পনা করা[illegible] কোন সার্থকতা নেই।

শক্তির এই অমূর্ত্ত প্রকাশ অতি-প্রাথমিক অবস্থা (primordial) হোয়াইটহেড্ (Whitehead) যাকে বলেছেন, প্রাথমিক সৃজন-বে[illegible] (premordial creativity)। তা প্রাথমিক হলেও, তার কাজ হচ্ছে বহুকে একত্র করা। বহু ও একের ভিতর ছন্দোবদ্ধ মিলনে শক্তি[illegible] পরিচয়। শক্তি বহুকে এক করছে, বহুর ভিতর নবীন মূর্চ্ছনা জাগি[illegible] তুলছে—বিস্তৃতকে সংযুক্ত করে' পুরাতন হতে নবীনের মূর্চ্ছনা জাগি[illegible] তুলছে। নবীন পুরাতনের বহুর সংযোগ, এবং পুরাতন বহুর মধ্যে এ[illegible] একটি নূতন স্বাতন্ত্রিক সত্তা। Whitehead-এর ঠিক কথাটি এই—[illegible] পরতত্ত্ব হচ্ছে তাই যা বিচ্ছিন্নকে সংযোগ করে, যাতে নবীনে[illegible] অভ্যুদয়।*

হোয়াইটহেড্-এর মতে প্রাথমিক সৃজনবেগ (premordia[illegible] creativity) মূর্ত্ত হয়ে বিকশিত হয়। তন্ত্রমতে শক্তির প্রাথমিক সঞ্চা[illegible] অমূর্ত্ত, মূর্ত্ত সৃষ্টি হয় অনেক নিম্নকার স্তরে, যখন শক্তি ক্রমশঃ পরিণ[illegible] প্রাপ্ত হয়। সৃষ্টিতে পরিণামের পূর্ব্বে অপরিণামী শক্তির বিকা[illegible] তন্ত্রে স্বীকৃত। এই অপরিণামী বিকাশ স্থূল সূক্ষ্ম কারণ জগতে[illegible] অতীত। এটা শক্তির স্বরূপ অভিব্যক্তি, যাতে আছে শুধু প্রকা[illegible] কিন্তু নেই কোন পরিণাম। শক্তির প্রকাশ ও পরিণামে যথেষ্ট পার্থক[illegible] আছে। প্রকাশে ক্রিয়া ও সঞ্চার আছে, যা জ্ঞানময় ও আনন্দময়[illegible] কিন্তু পরিণামে মূর্ত্ত প্রকাশের সহিত জ্ঞান ও আনন্দ থাকলে[illegible]

* The ultimate metaphysical principle is the advance fr[illegible] junctions to conjunction, creating a novel entity other than t[illegible] entities given in disjunction.

তা স্বরূপ প্রকাশ ও আনন্দ হতে পৃথক। শক্তির বিকাশে শক্তির ব্যাপকত্বের স্থানে ঘনত্বের (concentration) উদ্ভব হয়। এই ঘনত্ব এমনি অবস্থায় উপনীত হয় যেখানে চেতনার প্রসার থাকে না—চেতনা ক্রমশঃই গুন্ধীভূত হয়ে আসে। অভিনব গুপ্ত বলেছেন, জড়ত্ব শুদ্ধ প্রকাশ। অপরিণামী প্রকাশ বিস্তৃত (diffusive), পরিণামী প্রকাশ গুন্ধীভূত (concentrated)। শক্তির সঞ্চারের এই ভেদকে অবলম্বন করে' প্রকৃতির উচ্চ স্তরের কল্পনা হয়েছে, যেখানে শক্তির ঝঙ্কার ও আভাস আছে, পরিণাম নাই। প্রাকৃত সৃষ্টিতে তন্ত্র সাংখ্যের মত পরিণাম স্বীকার করেছে—কিন্তু অপ্রাকৃত বিশ্বে চৈতন্যের সক্রিয় অবভাস স্বীকার করেছে। প্রকৃতির ঊর্দ্ধে এই বিশ্বচেতনা দীপ্ত ; চেতনার দীপ্তি এই প্রাকৃত বিশ্বে স্তিমিত ও ম্লান।

এই প্রকৃতি ও তাহার ঊর্দ্ধ স্তর একই শক্তির বিকাশ। শক্তি এক স্থানে উদার ও বিস্তৃত, আর এক স্থানে সঙ্কুচিত ও সীমাবদ্ধ। একই শক্তি সৃষ্টিতে বিকশিত। ঘনীভূত বিকাশে প্রকৃতির সৃষ্টি। কিন্তু বিকাশের স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হয়। এই পরিবর্ত্তনের জন্য মনে হয় যেন শক্তির অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত প্রকাশ স্বরূপতঃ ভিন্ন। সাংখ্য হতে তন্ত্রের প্রধান ভেদ প্রকৃতির স্বরূপ নিয়ে। সাংখ্যে প্রকৃতি চেতনা হতে ভিন্ন বস্তু, তন্ত্রে প্রকৃতি চেতনারই সঙ্কোচ। এই জন্যই তন্ত্রে সৃষ্টির স্তরগুলিকে চেতন-শক্তির সহিত একই পর্য্যায়ে ফেলা হয়। ঘনীভূত অবস্থা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হতে পারে, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হয়ে চেতনার স্পন্দন ও দীপ্তির পূর্ণাশ্রয় হতে পারে। প্রকৃতি ও প্রকাশের জগতের তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই। একথা সত্য হলেও, প্রকৃতির নিয়ামকতা ও প্রকৃতির ঊর্দ্ধ জগতের নিয়ামকতা এক নহে। শক্তির স্বরূপের ক্রিয়া প্রকৃতির ক্রিয়া হতে ভিন্ন। শক্তির পরিণাম নেই, প্রকৃতির পরিণাম আছে। এই জন্যই তন্ত্রে কার্য্যের স্বরূপ সম্বন্ধে দুটি মত পোষণ

RA... OK

করা হয়—(১) কার্য্য শক্তির আভাস, (২) কার্য্য প্রকৃতির পরিণাম এই দুই বাদের উপর তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতি-জগতে তন্ত্র সাংখ্যের পরিণামবাদ স্বীকার করেছে। কার্য্য কারণের পরিণতি। বৃক্ষ বীজেরই পরিণতি। পরিণাম সূক্ষ্মের স্থূলতা প্রাপ্তি।

এই পরিণাম আছে বলেই প্রকৃতি-জগতে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় আছে— সৃষ্টিতে উদ্গম, স্থিতিতে বিকাশের পূর্ণতা প্রাপ্তি, লয়ে পুনরায় সঙ্কোচ এরূপ প্রবাহশীল (process) হয়ে প্রকৃতি কার্য্যকরী হয়। কিন্তু এই প্রবাহ কালনিবদ্ধ, কালেই ইহার উদ্ভব, কালেই ধ্বংস। প্রকৃতির ক্রিয়া সতত পরিণামশীল বলেই স্থির কোন অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। শক্তির কম্পন এখানে অস্থির এবং নিত্যই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়ে প্রকাশ। প্রকৃতির জগৎ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে অস্থির বলেই মনে হবে, যদিও স্থূল বুদ্ধির নিকট এর অস্থিরতার ভাণ সর্ব্বদা যেন স্ফুট নয়। মন এমনি যে, এই অস্থির পরিণাম-প্রবাহে স্থৈর্য্য খোঁজে এবং একে স্থিতিশীল করতে প্রযত্ন করে। পরিণতির একটা কালিক ব্যাপ্তি (duration) থাকলেও, পরিণামের বিলয় অবশ্যম্ভাবী। এ জন্যই সাংখ্যাচার্য্যেরা প্রকৃতির রূপান্তরে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। প্রকৃতির যতই উজ্জ্বল পরিণাম হউক, সে পরিণাম নিত্য হতে পারে না। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতেও রজঃ ও তমঃ গুণের ক্রিয়া থাকে। এর জন্যই পুরুষতত্ত্বের অনুসন্ধান হয়েছে।

শৈবাচার্য্যেরা এই প্রকৃতির পরিণাম ভিন্ন শক্তির অন্যরূপ বিকাশ স্বীকার করেন। তাকে বলা হয় আভাস। চিতি-শক্তির প্রকাশের পরিণাম হয় না বা সতত স্পন্দিত হলেও, তার প্রকাশের অভাব হয় না, অথবা তার ভিতর কোন রূপান্তর সৃষ্টি হয় না। একেই আভাসবাদ বলা হয়। তন্ত্রমতে কার্য্য কারণের প্রকাশ (expression) মাত্র, কোন পরিণাম (transformation) নয়। চৈতন্যে চিতি-শক্তি

নিহিত। এই চিতি-শক্তি ক্রিয়াশীল হয়ে স্পন্দিত হয়। এ স্পন্দনে প্রকাশ আছে, পরিণাম নেই। প্রকাশই আভাস। আভাস শক্তির স্বরূপভূত প্রকাশ; এতে শক্তির কোন সঙ্কোচ (concentration) নেই। এই জন্য প্রকৃতির জগৎ হতে চিতি-শক্তির জগৎ পূর্ণরূপে পৃথক্। চিতি-শক্তি প্রকৃতির ঊর্দ্ধজগতে কেন্দ্রীভূত হয়, কিন্তু পরিণত হয় না। এ বিশ্বচেতনায় দীপ্ত, চেতনায় সঞ্জীবিত—চেতনাই এর উপাদান কারণ। শক্তি যখন শিবের আশ্রয়ে পূর্ণরূপে স্তিমিত, তখন এই বিশ্বের প্রকাশ থাকে না। কিন্তু শক্তি স্পন্দীভূত হলেই এর প্রকাশ। অবশ্য এই প্রকাশ শিবের অন্তর্নিহিত, যদিও ক্রিয়াপ্রধান। চিতি-শক্তি স্পন্দনাত্মিকা। প্রাথমিক স্পন্দনে কোন বিষয়-বিষয়ীভাব থাকে না। তেজোময় শুদ্ধ প্রকাশময় স্পন্দনে এর বিকাশ। যে প্রকাশে পরিণাম নেই, তাই আভাস। শৈবমতে ইহা সাত্ত্বিকী বুদ্ধির বিকাশ নয়—কারণ বুদ্ধির বিকাশ যতই স্বচ্ছ ও শুদ্ধ হোক, তারও পরিণাম আছে, বুদ্ধি স্বয়ং পরিণত হয়ে অহংকার হয়েছে। কিন্তু তন্ত্রে চিতির স্পন্দনে শক্তিছন্দ থাকলেও, পরিণতি থাকে না।

এই জ্যোতির্ময় লোক ছন্দে উজ্জীবিত। আভাসে ছন্দ আছে—চিতি-শক্তির গতি ছান্দসিক—এর প্রত্যেক প্রকাশ ছন্দ-নিয়ন্ত্রিত, চেতনা ছন্দের আশ্রয়। প্রকৃতির ক্রিয়ার ভিতর ছন্দ পূর্ণপ্রতিষ্ঠ নয়; বৈষম্য যেখানে ক্রিয়াশীল, শক্তির শোভন ও কল্যাণ প্রকাশ সেখানে প্রতিহত। সাম্য ও বৈষম্যই চিতির, শক্তির ও প্রকৃতির ক্রিয়ার নির্ণায়ক। চেতনা সঙ্কীর্ণতামুক্ত বলেই এর সাম্য, ব্যাপকতা, ছন্দশীল শক্তি অনুভূত হয়।

আভাসবাদে কার্য্য কারণের প্রকাশ, কার্য্য কারণস্বরূপ হয়েও, প্রকাশে হয় ভিন্ন। এজন্য কারণস্বরূপ এখানে স্তিমিত নয়, পরিস্ফুট। কার্য্য কারণের শুদ্ধ ও স্ফুট প্রকাশ। শুধু শক্তির প্রকাশভেদে এর বৈশিষ্ট্য,

কারণে কোন বৈশিষ্ট্য নেই, কার্য্যে প্রকাশের বৈশিষ্ট্য আছে—প্রকাশের গতিতে প্রকাশের নানা রূপ—এই রূপ নিয়ে কার্য্যের বিভিন্নতা। কিন্তু প্রকাশ এখানে এত স্বচ্ছ যে, মূল কারণের স্বরূপ কোথাও আবৃত হয় না—সর্ব্বত্রই কার্য্যে কারণের সন্ধান পাওয়া যায়। এই কারণের সহিত নিত্য সম্বন্ধ থাকে বলে' প্রকৃতির স্পন্দন হতে চিতির স্পন্দন ভিন্ন, সমতা ও ছন্দযুক্ত। স্বানুভব এইরূপ ছন্দযুক্ত স্পন্দনের সুখস্বরূপতা, জ্ঞান-স্বরূপতার এবং প্রকৃতি-বিভিন্নতার পরিচয় দেয়।

এইরূপ প্রকৃতির উর্দ্ধে শুদ্ধ প্রকাশ অদ্বৈতবাদেও স্বীকৃত হয়েছে। ঈশ্বরের সত্ত্ব বিশুদ্ধ, ঈশ্বর-ভূমিকা তেজোদ্দীপ্ত ও অসঙ্কুচিত জ্ঞানপূর্ণ। মায়া হতে অবিদ্যার ভেদ এই। মায়া শুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান, অবিদ্যা মলিন সত্ত্বপ্রধান। মলিন বলেই অবিদ্যা বৈষম্যপূর্ণ, শুদ্ধ বলেই মায়া সাম্যপূর্ণ। অবশ্য মায়া শুদ্ধ বলেই চেতনার দীপ্তিতে পূর্ণ এবং এর জগৎ অবিদ্যার জগৎ হতে ভিন্ন। এখানে শাশ্বত দীপ্তি ও শান্তি, অসঙ্কুচিত শক্তি ও জ্ঞান। এ মায়া বিদ্যা, সতত উজ্জ্বল ও প্রভাবিশিষ্ট। একে চিতি-শক্তি বলা যায় না, কারণ নির্ব্বিশেষ চেতনার স্বরূপে কোন শক্তি নেই, কোন স্পন্দন নেই। তবুও এই মায়া চিতি-শক্তির ন্যায় উজ্জ্বল ও প্রকাশক। ব্রহ্ম কারণরূপ এই শক্তিকে আশ্রয় করে' সগুণ রূপে প্রতিভাত হন। এই শক্তিকে অবলম্বন করে' উপাধিবিশিষ্ট হন।

তত্ত্ববিচারে পদার্থের স্বরূপ যাই নির্ণীত হোক, একথা অস্বীকার করা যায় না যে, প্রকৃতির উর্দ্ধে শৈব ও বেদান্ত দর্শনে একটি জগৎ স্বীকৃত হয়েছে, যা শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ এবং যার প্রকাশ নিরবচ্ছিন্ন ও অপ্রতিহত। বেদান্তে এর প্রকাশকে অনিত্য বলা হয়েছে, কারণ মুক্তি-ভূমিকায় এই প্রকাশের লয় হয়। শৈবাগমে এই প্রকাশ নিরতিশয় ও নিরন্তর বলেই মুক্তির ভূমিকায় এর অনুভব হয়। মুক্তি নির্ব্বিশেষ অনুভূতি—এই অর্থে যে এখানে সৃষ্টি, সৃষ্টির উর্দ্ধস্তর, শক্তি ও শিব—সবরে:

যৌগপদ্য অনুভূতি হয়। কারণ কার্য্যপরম্পরায় ব্যবচ্ছেদ হয় না—সশক্তিক শিবের অনুভব হয়—তত্ত্বের লয় অসম্ভব, যদিও তত্ত্বের স্ফুট ও অস্ফুট প্রকাশ সম্ভব। মুক্ত পুরুষ শিবস্বরূপ হয়ে নিরূপাধিক ও সোপাধিক বিশ্বের যুগপৎ প্রকাশ উপলব্ধি করেন। বেদান্ত এই যৌগপদ্য অনুভব পরামুক্তিতে স্বীকার করে না—কারণ মুক্তি নির্ব্বিশেষের অনুভূতি, এতে বিশেষ থাকে না। যেহেতু শক্তি বা মায়া স্বরূপান্তর্গত নহে; স্বরূপানুভূতি শুদ্ধ চেতনার অনুভূতি, চেতনাযুক্ত স্পন্দনের অনুভূতি নয়। শৈবাগমে শক্তির নিষ্ক্রিয়, স্পন্দনীভূত অবস্থা স্বীকৃত হলেও, শক্তির নিরবচ্ছিন্ন বাধ স্বীকৃত হয় না বলেই এরূপ অবস্থাতেও শক্তি শিবের অন্তর্নিহিত হয়ে থাকে। শক্তি সৃজনোন্মুখ না হয়ে মুক্তিতে লয়াভিমুখী হয়—এই লয়ে প্রকৃতি শক্তিতে ও কার্য্য-ব্রহ্ম কারণ-ব্রহ্মে লীন হয়—লয় কিন্তু বাধ নয়। লয়ের আবশ্যকতা আছে, তা না হ'লে কারণ স্বরূপপ্রাপ্ত হয় না, এবং কারণস্বরূপে শক্তির কোন অমূর্ত্ত বা মূর্ত্ত স্পন্দন থাকে না। শিবময় স্থিতি লাভ করতে হ'লে শক্তির অস্পন্দনীভূত অবস্থা লাভ করতে হয়—এই অস্পন্দীভূত অবস্থাই মুক্তি। শক্তির স্পন্দন যেমন সৃষ্টির বা প্রকাশের কারণ, নিরোধিকা শক্তি তেমনি মুক্তির কারণ। নিরোধ-ভূমিকার বৈশিষ্ট্য এই যে, নিরোধে শক্তির সবিশেষ ক্রিয়ার বীজ পরিলক্ষিত হয়—নিরোধে চেতনার ব্যাপক বৃত্তির জাগরণ হয়। এই ব্যাপক বৃত্তিতে শক্তির সৃজনবেগ ও প্রকাশ-চেষ্টা সবই উদ্ভাসিত হয়; ব্যাপকাভিমুখী সঞ্চার থাকে বলেই সঙ্কোচের আকর্ষণ থাকে না। এইরূপ অসঙ্কোচ দৃষ্টিতে বিশ্ব ও বিশ্বাতীত বিশ্বের সকল স্তর উদ্ভাসিত হয় এবং শেষ ভূমিকায় এই বিশ্ব-দৃশ্য অতিক্রম করে' শিব-ভূমিকার প্রাপ্তি হয়। এই ভূমিকা শুদ্ধ জ্ঞান-ভূমিকা। শক্তি স্তিমিত, শিব স্ফুট। শক্তি স্পন্দীভূত হ'লেও, পরম শিবে শক্তি নিস্পন্দ। স্পন্দ ও নিস্পন্দ গতিবিশিষ্ট অনুভূতিই শ্রেষ্ঠতম অনুভূতি।

শক্তির তিনটি অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম অবস্থা একটি পূর্ণ সাম্যের অবস্থা (complete equilibrium)। এখানে শিব-শক্তিতে কোন্ ভেদ লক্ষ্য হয় না; দ্বান্দ্বিক ভাবশূন্য অবস্থা। এখানে কোনরূপ পৃথকীকরণ (polarisation) হয় না—এমন কি অহং, ইদংরূপও নয়। জ্ঞান এখানে নির্ব্বিশেষ। দ্বিতীয় ভূমিকায় শক্তি প্রকাশমণ্ডিত হয়ে একতত্ত্বরূপে প্রতিভাত হয়। সকল প্রকাশের সহিত শক্তি শিবযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হন। এ অবস্থা একীভূত সমষ্টির স্ফুরণের অবস্থা (a state of integral consciousness)। উর্দ্ধ ও অধের মিলিত অবস্থা। এর নীচুকার অবস্থা—এখানে উর্দ্ধের সহিত অধের মিলনভূমি—উর্দ্ধের আলোকসম্পাতে অধের জ্ঞান হয় এবং উর্দ্ধের সহিত অধের কিরূপ সম্মেলন আর সমন্বয়ই বা কি—এ সকলের জ্ঞান হয়। সমষ্টিগত পূর্ণ জ্ঞান (integral consciousness) এ ভূমিতে নেই—কারণ এ ভূমিকাতে ভেদজ্ঞান বেশ পরিস্ফুট (distinct) হয় না—তারা সমষ্টির অন্তর্গত হয়েই থাকে, তাদের স্বরূপ এবং কার্য্যের বোধ পরিষ্কার নয়। এরও নিম্নভূমিকায় জ্ঞান ভেদকে পরিগৃহীত করেই হয়।

মানুষের ভেতর চিরন্তন আস্পৃহা আছে ভূমা ও বৃহতের দিকে। এই ভূমার অন্বেষণে সত্তার আবরণগুলি উন্মোচিত হয়—মানুষ বৃহৎ ও অখণ্ড আনন্দের দিকে ধাবিত হয়। প্রথমতঃ অখণ্ড মানবত্বের দিকে ধাবিত হয়। অখণ্ড মানবত্বে তৃপ্তি না পেয়ে উচ্চতর অনুভবের দিকে ধাবিত হয়, পরিচিত হয় দিব্য কল্যাণ সত্তার সহিত—যারা দ্যুলোকে অধিষ্ঠিত, মানবকে উচ্চ পথে আরূঢ় করবার জন্য চেষ্টিত। কিন্তু এ অনুসন্ধানেও মানুষের তৃপ্তি হয় না। প্রকৃতির স্তরে সূক্ষ্মানুভূতি হতে মুক্ত হয়ে মানুষ ক্রমশঃ প্রকৃতির অতীত রাজ্যে প্রবিষ্ট হয়—এখানে অপ্রাকৃত ছন্দঃ ও জ্যোতিঃ তার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। সে এমন ভূমিতে অধিষ্ঠিত হয়, যা' প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বিশ্বের সন্ধিস্থান। এ স্থান উর্দ্ধ

জ্যোতিতে পূর্ণ—এই জ্যোতিঃসূত্র নিয়ে সে আরও ঊর্দ্ধতর লোকে ধাবিত হয়ে অম্লান অখণ্ড দীপ্তির সহিত পরিচিত হয়। এখানে স্পন্দন আছে কিন্তু তা এত প্রশান্ত যে, ক্রিয়ার চেয়ে জ্ঞানের ও অখণ্ডতার প্রকাশই অধিকতর। চেতনার এই প্রশান্ত ভাতিতে নিম্নের ভূমি আচ্ছন্ন হয়ে যায়; জ্যোতির এবং শান্তির পরিপূর্ণতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শান্ত জ্যোতিচ্ছন্দের অন্তরের অন্তরে থাকে অবিকম্প স্থিতিস্বরূপতা।

শক্তির উন্মেষ :

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, শক্তির দুটি অবস্থা—একটি স্পন্দনহীন অবস্থা—স্থিতিস্বরূপতায় সাম্যরূপে অবস্থিতি, অপরটি তরঙ্গায়িত বিকাশ। এই বিকাশাভিমুখী শক্তি ক্রমশঃ স্ফুট হতে স্ফুটতর হয়। অমূর্ত্তের স্বরূপে মূর্ত্তের ভাণ। তন্ত্রশাস্ত্রে এ রহস্য অত্যন্ত গভীর—শুধু বুদ্ধি-বিচারে নয়, সাধনার অপূর্ব্বতায়। শক্তির সাধক শক্তির এই দুই প্রকার উন্মেষ সাক্ষাৎ করেন, কিরূপে শক্তি ক্রমশঃ ঘনীভূতরূপে স্পন্দিত হয়ে নির্ব্বিশেষতার ভিতর মূর্ত্তত্ব প্রাপ্ত হয়, তার পরিষ্কার বোধের পরিচিতি হয়। শক্তির নির্ব্বিশেষতা বলতে বুঝতে হবে, শক্তির স্পন্দন কোন রূপ নেয় নি—কোন মূর্ত্ত আকারে পরিস্ফুট হয় নি। শিবকেন্দ্রে প্রথম সঞ্চারে শক্তির এই নিরাবরণ ভাব ও প্রকাশ মন সম্যক্ ধারণা করতে পারে না, কারণ এর তখন কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না, এমন কি শক্তির বৃত্তির সম্যক্ বোধও থাকে না। •বৈশিষ্ট্যের উদ্বোধক—বৃত্তিহীন, আবরণহীন উন্মেষ নয়। এ অবস্থায় শক্তির বিচ্ছুরণ (radiation) আছে, কিন্তু কোন মূর্ত্ত-বৃত্তি (form) নাই। এই বিচ্ছুরণ শুদ্ধ স্পন্দন, শিবস্বরূপে স্পন্দন; এ স্পন্দন সৃষ্টির আদিম স্পন্দন হলেও, এর ভিতর কোথাও মূর্ত্ত সঞ্চার নাই—এখানে জ্ঞানের প্রকাশরূপতা, আনন্দের হৃদ্রূপতা, ইচ্ছার ক্রিয়াশীলতা

থাকলেও, এদের কোন মূর্ত্তপ্রকাশ নাই—জ্ঞান, আনন্দ ও ক্রিয়া নিরুপাধিক। শক্তির এই প্রাথমিক বিচ্ছুরণ আলোকময়, বিকাশময়, অনাবৃত হেতু আনন্দময়—ইচ্ছা নিরুপাধিকতার জন্য ক্রিয়াস্বরূপ, সাবলীল ও সহজ গতিস্বরূপ। শক্তির এই প্রকাশ ধ্যানগম্য—এর গভীর রসাস্বাদন যোগীরাই করতে পারেন। কারণ একে প্রত্যক্ষ করতে হলে যে অতি মানসিক অনুভবসম্পন্ন হতে হয়, তা মাত্র যোগচর্য্যা দ্বারাই লভ্য। অরূপ বিশ্বের রূপহীন স্পন্দন (radiation) ক্রমশঃ রূপ (form) নেয়—এ রূপ কিন্তু সৃষ্টিতে অভিব্যক্ত রূপ নয়—এ রূপ শক্তির প্রাথমিক মূর্ত্তি হলেও, এ প্রাকৃত কিছু নয়। সৃষ্টিতে অভিব্যক্ত রূপ প্রকৃতির কার্য্য—এগুলির নিত্য সঞ্চার নেই। কিন্তু অরূপের রূপ অতিমানস রূপ।

শক্তির ক্রিয়া যখন প্রাথমিক রূপ নেয় তখন তাকে বলা হয় বিন্দু। বিন্দু শক্তির কেন্দ্রীভূত বিকাশ, বিন্দুর প্রাথমিক অবস্থা শুধু সঙ্করণ (agitation), দ্বিতীয় অবস্থা ঘনীভূত অবস্থা। ইহার পূর্ব্বাবস্থায় শক্তি কোন কেন্দ্র রচনা করে না। বিচ্ছুরিত শক্তি ক্রমশঃ কেন্দ্র রচনা করে। শক্তির সঞ্চার একটুখানি ঘনীভূত হয়ে এলে বিন্দুর প্রকাশ—বিন্দু স্বচ্ছ বিকাশ, তেজোময়, জ্যোতির্ম্ময়। এই বিকাশের স্বরূপ নির্ভর করে শক্তির সঞ্চারের পরিমাণের উপর। যেখানে সঞ্চার আরম্ভ হয়েছে অথচ সঞ্চরণ খুব তীব্র নয়, সেখানে শ্বেতবিন্দুর প্রকাশ। শ্বেতবিন্দুতে স্পন্দনে সাম্য ভাব থাকে—সঞ্চার এখানে গভীর ও ব্যাপক, গতি হতে স্থিতির ভাবের প্রকাশ অধিকতর। এই জন্য শ্বেতবিন্দুকে শিব বলা হয়। শক্তির গতি যখন আধিক্য (frequency) প্রাপ্ত হয়—যেখানে সঞ্চার অত্যন্ত দ্রুত, তখনই রক্তবিন্দুর আবির্ভাব। এইজন্য রক্তবিন্দুকে শক্তি বলা হয়। কিন্তু সঞ্চারের তারতম্য অনুযায়ী কোথাও স্থিতিপ্রধান, কোথাও শক্তিপ্রধান। এই শিবশক্তি পরমশিব নয়—এঁদের বিকাশ হয় শক্তির প্রাথমিক উন্মেষে।

এঁরাই প্রাথমিক বিশিষ্ট (determinate) তত্ত্ব। কিন্তু এই বিন্দুদ্বয় শ্বেত ও রক্তবিশিষ্ট তত্ত্ব হলেও, এতে অবিশেষ ভাব থেকে যায়, যেহেতু বিন্দু সঞ্চার ভিন্ন কিছু নয়—কোন গুণ-গুণী সম্বন্ধের স্ফুরণ এখানে নেই। এমন কি বিন্দুর ভিতর অহংভাবেরও স্ফুরণ হয় না। শক্তির স্ফুরন্ত সঞ্চারে এর প্রকাশ—এও চেতনার প্রকাশ, কিন্তু কোন গুণধর্ম্ম নিয়ে নয়, কারণ চেতনা তখনও অহংভাবে স্ফুরিত হয়নি। চেতনার সঞ্চার যখন অত্যন্ত বেশী হয়ে ক্রিয়াশীলতায় স্ফুট হয়, তখনই রক্তবিন্দুর সৃষ্টি। লক্ষ্য করবার বিষয়, এই তান্ত্রিকমতে চেতনার বিকাশ বিন্দু। কারণ শক্তি চিদ্স্বরূপা।*

বিন্দু প্রকাশময়†। এই প্রকাশময় শক্তির ভিতর অস্ফুট সৃজনবোধ (creative ideation) সঞ্চারিত হলে নাদের কম্পন গোচরীভূত হয়। বিন্দু প্রাথমিক প্রকাশ, নাদ প্রাথমিক শব্দহীন শব্দ, তন্ত্রের ভাষায় অব্যক্ত রব। সারদাতিলকে উক্ত হয়েছে, বিন্দুই শিব, বীজ শক্তি ; নাদ

---

* চেতনার বিকাশ শক্তির সর্ব্বশেষ বিকাশ—তন্ত্র এই মত পোষণ করে না। তন্ত্রে অভিব্যক্তি স্বীকৃত হয়, কিন্তু সেই অভিব্যক্তির গতি জড় হতে চৈতন্যে নয়—বরং চেতনার ক্রমসঙ্কুচিত গতি বা অবস্থা-সৃষ্টি সত্যিকার চেতনার অভিব্যক্তি নয়, চেতনার ক্রমবিলুপ্তি। তত্ত্ব যখন ক্রমোচ্চ স্তর প্রাপ্ত হয়, তাকে বলা হয় অভিব্যক্তি, যেখানে তত্ত্ব ক্রমশঃ নিম্নভূমি প্রাপ্ত হয়, তাকে বলা যেতে পারে বিচ্যুতি। অধুনাতন দার্শনিকতায় চেতনাকে শক্তির সর্ব্বশেষ স্বচ্ছতম প্রকাশ বলা হয়, শক্তি বিকাশে ক্রমস্বচ্ছতা প্রাপ্ত হয়ে চেতনা রূপ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে' দার্শনিকেরা এরূপ স্থূল হতে সূক্ষ্মের অভিব্যক্তির কথা বলে থাকেন। স্থূল প্রকৃতি হতে প্রাণ, মন, জ্ঞান, বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। তন্ত্র কিন্তু ঠিক বিপরীত মত পোষণ করে। শক্তি জ্ঞানরূপা; তা হতে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে জ্ঞানেন্দ্র, ইচ্ছা, ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার সঙ্কুচিত অবস্থা প্রকৃতি ও প্রকৃতির অন্তর্গত অস্মিতা অহংকার মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং তন্মাত্রার সৃষ্টি হয়।

† বারিবস্তরহস্যে উক্ত হয়েছে—বিশ্বসিসৃক্ষায় প্রকাশরূপং ব্রহ্ম স্বকীয়ং শক্তিমবলোকয়িতুং তদভিমুখীভূয় তদন্তর্দ্দেজোরূপেণ প্রবিশ্য শুক্লবিন্দুতাময়তে।

এদের সম্বন্ধের প্রাথমিক স্ফুরণ। স্বচ্ছন্দ তন্ত্রে উক্ত হয়েছে, বিন্দু ঈশ্বর, নাদ সদাশিব। নাদে শক্তি প্রসারিত—বিন্দুতে ঘনীভূত।* নাদ অশব্দের শব্দ—এখানে ক্রিয়াশক্তি প্রধান, বিন্দুতে জ্ঞান-শক্তি প্রধান। নাদে ক্রিয়াশক্তি স্ফুট, অতএব নাদে শক্তির সঞ্চার অধিকতর—নাদে শক্তির সঞ্চার বেশ অনুভব করা যায়। তন্ত্রমতে বিন্দু তেজঃ তন্মাত্রা নহে, নাদ শব্দ তন্মাত্রা নহে—দুই-ই শক্তির জ্ঞানরূপী ও ক্রিয়ারূপী প্রকাশ। চিদ্‌শক্তি ক্রিয়াপ্রধান হ'লে নাদের বিকাশ আরম্ভ হয়—এ-ও অব্যক্ত কিন্তু বিকাশ মধুর নিনাদে শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, যোগীর ধ্যানগম্য। ক্রিয়াপ্রধান বলে' শক্তির সঞ্চার এখানে দ্রুত, অধিকতর—এজন্য বিন্দু অপেক্ষা নাদ সহজে অধিগম্য। নাদ ও বিন্দু শক্তির উচ্চতম স্তরের প্রকাশ, এ প্রকাশে কোন রূপ (form) থাকে না—এদের ভেদ শুধু স্পন্দনের আধিক্য ও সঙ্কোচ নিয়ে। শ্বেতবিন্দু হতে রক্তবিন্দুতে শক্তির ঘনীভূত সঞ্চার অধিকতর; এই জন্যই বলতে হয়, নাদের সহিত রক্তবিন্দুর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর। শক্তি ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়ে বিন্দু ও নাদ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। নাদ রক্তবিন্দুর পরবর্ত্তী অবস্থা; কারণ, শক্তির ঘনত্ব রক্তবিন্দুতে যে পরিমাণে বর্ত্তমান, নাদে তার চেয়ে অধিকতর। রক্তবিন্দুই জ্ঞান ও ক্রিয়ার মধ্যবর্ত্তী অবস্থা।

---

* তন্ত্রসাধনায় নাদ-বিন্দু সম্বন্ধে সম্যক ধারণা আবশ্যক। এ ধারণা নিয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, নাদ প্রসারিত সত্ত্বা। বিন্দু মন-সত্ত্বা। মন সত্ত্বা বলে' বিন্দু নাদ অপেক্ষা নিম্নতর সত্ত্বা নয়। বস্তুতঃ এখানে উচ্চতর বা নিম্নতরের কথা উঠতেই পারে না। এঁরা একই শক্তির বিকাশ। ক্রিয়া নিয়ে এদের ভেদ। সাধনার ভূমিকায় নাদের প্রসারিত বিকাশে চিত্তের লয় হয়, এবং তখনই বিন্দু-সত্ত্বার আবির্ভাব হয়। নাদের প্রসার জ্ঞানময় বিকাশে অন্তর্হিত হয়। এই বিকাশের সাক্ষী পরম-শিব। ভাস্কর রায় এজন্য বিন্দু ও মহাবিন্দুর উল্লেখ করেছেন, এবং নাদকে মহাবিন্দুতে প্রবেশ করিবার পথ বলে নির্ণয় করেছেন।

জ্ঞানের ভিতর ইচ্ছার সংবেগের অঙ্কুর রক্তবিন্দুতে হয়—শ্বেতবিন্দুতে হয় না; ইচ্ছার সংবেগ হয় বলে' ক্রিয়ার অঙ্কুর এতে থাকে, যা নাদে স্ফুটতর হয়ে প্রকাশ পায়। শ্বেতবিন্দুতে যার আভাস মাত্র, রক্তবিন্দুতে তার উদ্গম, নাদে তার প্রকাশ। জ্ঞানের প্রাথমিক প্রকাশে ইচ্ছার সঞ্চার অপেক্ষা আনন্দ অনুভূত হয়। আনন্দ জ্ঞানেরই পূর্ণতার বোধ। জ্ঞান ও আনন্দ অবিমিশ্র, স্ফুটপ্রকাশই আনন্দ—এ আনন্দ শুধু হ্লাদ নয়; এ জ্ঞানের স্বরূপ। জ্ঞানের ভিতর আনন্দের সঞ্চারে প্রকাশের স্ফূর্ত্তি—এই স্ফূর্ত্তিতে শক্তির সঞ্চরণ অধিকতর। সঞ্চরণে এই আনন্দ জ্ঞান হতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আনন্দ প্রকাশ হ'লেও, এতে আছে স্ফূর্ত্তি, যা জ্ঞানে শান্ত। এই স্ফূর্ত্তি ক্রমশঃ বৈশিষ্ট্যের দিকে ধাবিত হয়। আনন্দের স্বরূপে আছে উদ্বেলতা। জ্ঞান স্বরূপে শান্ত, আনন্দ উদ্বেল। আনন্দ উদ্বেল বলেই রূপ নেবার চেষ্টা এতে আছে; এই চেষ্টা নাদে স্ফুটতর। আনন্দে ক্রিয়ার সঞ্চার; আনন্দের মূর্ত্তবিকাশই তো সৃষ্টি। আনন্দের সহিত ইচ্ছা ও ক্রিয়ার সম্বন্ধ আছে, আনন্দ এদের উপজীব্য।

নাদে ইচ্ছা ও ক্রিয়া স্ফুট। ক্রিয়ার প্রাথমিক বিকাশ নাদে। এই নাদ যত ঘনীভূত হয়ে প্রকাশিত হয়, ক্রিয়াসংবেগ ততই হয় সুস্পষ্ট—এই ক্রিয়া ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়ে চেতনার কেন্দ্র সৃষ্টি করে। নাদ ও বিন্দু অবস্থায় চেতনা সঞ্চরণশীল হয়েও কোন কেন্দ্রীভূত হয় না; এদের গতি প্রকাশ ও ক্রিয়া প্রসারীভূত, এরাই চেতনার নির্ব্বিশেষ প্রকাশ (indeterminate expression)। যদিও ক্রিয়াশীল, তথাপি সেই ক্রিয়ার কোন রূপ নেই—সঞ্চরণ মাত্র, একটা সম্বন্ধহীন নির্ব্বিশেষ সঞ্চরণ। এটাই প্রাথমিক বিকাশ।

এই প্রাথমিক স্পন্দনে যখন অহংএর স্ফুরণ হয়, তখনই শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়, চেতনা কেন্দ্রগত হয়, 'আমি'-বোধ স্ফুট হয়। চেতনা কেন্দ্রগত হওয়ায় জ্ঞান নিরুপাধিক স্বরূপ ত্যাগ করে এবং অহং

কেন্দ্রে স্ফূর্ত্ত হয়। তখন তার ক্রিয়া হয় এই কেন্দ্রকে অবলম্বন করে। নিরুপাধিক চেতনার কোন কেন্দ্র থাকে না বলেই তার ভিতর কোন ক্রিয়া কেন্দ্রগত হয়ে প্রকাশ পায় না—কিন্তু জ্ঞান যখন কেন্দ্রগত হয় তখন ক্রিয়ারও স্ফূর্ত্তি হয় কেন্দ্রকে নিয়েই। জ্ঞানের এই কেন্দ্রগ ভাবকে সাংখ্যে বলা হয়েছে—অস্মিতা। কিন্তু সাংখ্যে জ্ঞান কেন্দ্রীভূ হয় প্রকৃতিকে বা মহত্তত্ত্বকে নিয়ে—কারণ, সাংখ্য চিতি-শক্তি বলে কোন পদার্থ স্বীকার করে না।

তন্ত্রে কিন্তু এই কেন্দ্রীভূত জ্ঞান পরাশক্তিকে বা চিতি-শক্তি অবলম্বন করেই। 'আমি'-বোধ জ্ঞানের প্রাথমিক সঙ্কোচ। এই সঙ্কে শক্তির পুঞ্জীভূত বিকাশ। একেই তন্ত্রশাস্ত্রে সদাশিব-তত্ত্ব বলা হয়।

এই প্রাথমিক বোধ শুদ্ধ আমিরূপে স্ফুট। এই আমির কো আবরণ নাই, কোন পার্থক্য বা ব্যক্তিত্ব বোধ (individuality) নাই কোন ব্যক্তিত্বের ভাণ হতে পারে না—কারণ, ব্যক্তিত্বের ভাণ সমষ্টি ব্যক্তিত্বে হতে পারে, শুদ্ধ আমিতে হয় না, হ'তে পারে না। এ অবস্থা 'আমি-বোধ' ভিন্ন কিছু থাকে না বলে' এই 'আমি'-বোধকে জ্ঞাতা ব যায় না; যেহেতু, জ্ঞাতৃত্ব বিষয়-বিষয়ী বোধকে নিয়ে প্রকাশ পা যেখানে শুদ্ধ 'আমি', যেখানে বিষয় নেই—সেখানে 'আমি'-বোধকে বিষয়ীও বলা যায় না। এ শুদ্ধ জ্ঞানের কেন্দ্রগত বোধমাত্র। এ অবস্থা তখনই হয়, যখন জ্ঞান বিষয়-বিষয়ী সম্বন্ধ হতে মুক্ত হয়। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-শূন্য কেন্দ্রগত জ্ঞানবোধই 'আমি'-বোধ। সূক্ষ্ম-স্থূল, সূক্ষ্ম-কারণের অতীত এই 'আমি'-বোধ। শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল জ্ঞানই স্বরূপ। জ্ঞান সর্ব্বদাই অহংবৃত্তিযুক্ত, বিশ্বদৃশ্য এখানে নাই; চিতি-স্পন্দন শুদ্ধ 'আমি'রূপে প্রবাহিত।

এই 'আমি'-বোধ বোধমাত্র হলেও, এই বোধে শক্তির স্ফুরণ থাকে, চিতি-শক্তি জ্ঞানে নিত্য স্ফুরিত হয়। অন্যভাবে বলা যেতে পারে—

এই অবস্থায় ইচ্ছা ও ক্রিয়া আছে কিন্তু তা' খুব স্ফুট নয়। এই ইচ্ছা স্ফুট হলেই ইহা কেন্দ্রাপসারিণী হয়ে ইদং-রূপে প্রতিভাত হয়। এখানে ইদংএর স্ফুরণ অধিকতর—জ্ঞান যেন শক্তিরূপে প্রকাশ পায়; জ্ঞানের ইদংতারূপ জ্ঞানেরই স্বরূপ—জ্ঞান ভিন্ন কিছু নয়—জ্ঞান আত্মবিষয়ক হয়ে প্রকাশিত হয় মাত্র। বস্তুতঃ এখানে জ্ঞান ভিন্ন বিষয় নেই—জ্ঞানের আমি-কেন্দ্র হতে স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি প্রবাহিত হয়ে ইদং রূপ নেয়; জ্ঞান হতে শক্তি এখানে প্রধান, শক্তি ইদংরূপে স্ফুট হয়। জ্ঞান যেন নিজের আলেখ্য পটেতেই দেখতে পায়। এ অবস্থায় ইদংএর ভাণ অধিকতর; কারণ, চিতি-শক্তির সমাবেশ হয় সেখানে এবং বিষয়রূপে। এ বিষয়-বোধের স্ফূর্তির সহিত কিন্তু "আমি-বোধ" বিলয় হয় না। এ তত্ত্বকে ঈশ্বরতত্ত্ব বলে। ঈশ্বরতত্ত্বে ইদংতার ভাণ (objectivity) স্ফূর্তি অধিকতর।

এই যে জ্ঞানের স্বকেন্দ্র হতে অপসারণ এবং ইদংরূপে অবভাস, এর ভিতর কোন সম্বন্ধবোধ স্ফূর্ত হয় না। কারণ, চিতি ও চিতি-শক্তির ক্রিয়া বিভাজ্য নয়—বিভাজ্য হলে ভেদ হয়, ভেদ হলে সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়। জলধারা যেমন গোমুখী হ'তে কখনই ভিন্ন হয় না, কিন্তু আমরা দেখি ভিন্ন, চিতি-শক্তির প্রবাহ চেতনা হতে কখনই ভিন্ন হয় না, যদিও চিতি-শক্তি ইদংতা রূপ নিয়ে যেন বিষয়রূপে প্রতিভাত হয়। জ্ঞানের এই এক ভূমিকায় ভেদশূন্য হয়ে অহংতা ও ইদংতা রূপের সৃষ্টি হয়। এ জ্ঞানও অপরোক্ষ জ্ঞান। শক্তিই নির্গত হয়ে নিজ কেন্দ্রকেই বিষয় করে। বস্তুতঃ জ্ঞান এখানে এমনই যে, কোন মানস-কল্পনা দ্বারা একে ধরা যায় না—যুগপৎ একই প্রত্যক্ষে অহং ও ইদংএর ভাণ হয় সম্বন্ধশূন্য হয়ে—সম্বন্ধের পরোক্ষত্ব ও দূরত্ব এখানে থাকে না।

এ ভূমিকায় ইদংতার প্রাধান্য—চেতনার প্রাথমিক পরিসরতার প্রকাশ। চেতনায় এই পরিসরতায় ইদং-অভিমুখী হওয়া স্বাভাবিক, তা না হলে পরিসরতার কোন অর্থ থাকে না। পরিসরতা যদিও কেন্দ্র

হতে পৃথক্ নয়, তথাপি এই কেন্দ্রগত-বোধ পরিসরতায় স্ফুট হয় না বলেই চিতির এই পরিসরতার কেন্দ্রাপসারিণী ইচ্ছা রূপেই প্রতিভাত হয়।

চিতিশক্তি কিন্তু কখনই কেন্দ্রচ্যুত হয় না; এই জন্যই জ্ঞানের আরও নিম্ন ভূমিকায় এই কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি পুনরায় কেন্দ্রাভিমুখী হয়। কিন্তু কেন্দ্রাভিমুখী হওয়ায় আমরা এই বুঝব না যে, যে-কেন্দ্র হতে নির্গত হয়েছিল সেখানেই পুনরাবৃত্তি হয়েছে; শক্তি চেতনায় বিলয় হয়েছে। শক্তির স্ফুরণ আরম্ভ হলে তার লয় সহসা হয় না—উন্মেষের গতিতে। কেন্দ্রাভিমুখী হলেও, ইদংতা অহংতায় লয় পায় না, তাদের সমন্বয় হয় জ্ঞানের প্রকাশের আর এক পর্য্যায়ে। ইদংতা অহংতা ভিন্ন থাকতে পারে না, অহংতা ইদংতা ভিন্ন স্বরূপ প্রকাশের কোন উপায় নেই—পারস্পরিক এই সন্নিবিষ্টতার পূর্ণ বিকাশ হয় যখন এদের সমন্বয় হয়—যেখানে ইদংতা তার স্বরূপকে পায় অহংতার ভিতর, অহংতা তার প্রকাশকে পায় ইদংতার ভিতর। জ্ঞানের এই ভূমিকাকে তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয় সদ্বিদ্যা।

প্রকৃতির উর্দ্ধে চিতিশক্তি অপরিণামী-প্রকাশ সদাশিব, ঈশ্বর ও সদ্বিদ্যারূপে প্রকাশ পায়। এই প্রকাশ কিন্তু ক্রমশঃ ঘনীভূত হতে থাকে। সদাশিবতত্ত্বে চেতনার কেন্দ্রীভাব সদ্বিদ্যায় আরও স্ফুটতর: এতে দুটী ভাবের সম্বন্ধ হয়—যা সদাশিবতত্ত্বে নাই। প্রাথমিক অহংবোধ যখন ইদংবোধের সহিত যুক্ত ও সমন্বিত হয়, তখনই চিতি-শক্তির দুই ধারার গঙ্গা ও যমুনার ন্যায় সঙ্গম হয়। উর্দ্ধধারা সমন্বিত হয় বলেই সদ্বিদ্যার ভিতর তাদের পুষ্টতার রূপ ও ঘনীভূত বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। জ্ঞানের এই ভূমিকায় উর্দ্ধ তত্ত্বগুলির নিম্নে প্রতিভাস হয়। জ্ঞান-বিকাশের গভীর অর্থ আছে। জ্ঞান এখানে নবীন ভাবে প্রকাশশীল, বিশিষ্টরূপে জ্ঞানের প্রকাশ হয় এই ভূমিকায়। কারণ অহং ইদংবিশিষ্ট হলেও, এই বিশিষ্ট জ্ঞানে অহং ইদংএর একীভূত ভাবই আছে, সম্বন্ধ নাই। এই একীভূত জ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞান; অহং ইদংএর

এখানে কোন দূরত্ব নেই, কোন পার্থক্য নেই। স্বরূপভূত (indeterminate) জ্ঞানের দুটি বিকাশ একীভূত (synthesised) হয়। একীভূত অর্থ এই যে, সম্বন্ধযুক্ত হয়ে ঐক্যরূপে প্রতীত হওয়া। বস্তুতঃ জ্ঞানে এরূপাবস্থায় সম্বন্ধের ভাণ হলেও, সে সম্বন্ধ কোন দূরত্ব বা ভেদ সৃষ্টি না করেই হয়—সমগ্র জ্ঞানটি সম্বন্ধকে গর্ভে করে প্রজ্বলিত হয় বিজ্ঞানালোকে।

* *
*

সদ্বিদ্যা

সদ্বিদ্যা বিজ্ঞানের কেন্দ্র। এই বিজ্ঞান স্বপ্রকাশ বস্তু—এর অন্তর স্বচ্ছ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত। সদ্বিদ্যায় ঊর্দ্ধলোকের সকল জ্ঞানের প্রকাশ বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়, একীভূত হয়ে। এই বিজ্ঞানালোক ঊর্দ্ধ প্রকৃতি ও নিম্ন প্রকৃতির কেন্দ্রস্থান—এই জন্যই এখানে সকল জ্ঞানই উদ্ভাসিত হয় অখণ্ডরূপে; এই অখণ্ডস্বরূপে খণ্ড জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত।

মহাশক্তির সকল বিভূতি, সকল সম্ভূতি এই সদ্বিদ্যায় প্রকাশিত, এখান হতেই তাদের প্রকৃতির জগতে অবতরণ। সদ্বিদ্যার ঊর্দ্ধ মহাশক্তির চেতনায় ও আনন্দে প্রকাশ—যে প্রকাশ প্রাকৃত বিশ্বে অবতরণ করে না, করতে পারে না পরম বিশুদ্ধতার হেতু। অনাবৃত শক্তি প্রকাশিত হলেও, ঊর্দ্ধ লোকের শক্তির সঞ্চার এখানে অটুট—এই জন্য এখানে মিথ্যা নাই—সবই বিজ্ঞানালোকে দীপ্ত, বিজ্ঞানের ভাতিতে সমুজ্জল—সকলেই অফুরন্ত আনন্দের প্লাবনে পরিপ্লুত। সদ্বিদ্যায় বিজ্ঞান, আনন্দ অমূর্ত্ত হলেও পরম উপভোগ্য, কারণ তারা এখানে ঘনীভূত (concentrated); যদিও এই ঘন-প্রকাশে তাদের ব্যাপকত্বের কোন হানি হয় না। একাধারে ব্যাপক ও ঘন, অখণ্ড ও খণ্ড ক্ষেত্র এই ভূমিকা; কিন্তু আমাদের মানস চেতনা এদের যেরূপ ধারণা করে, সেরূপ ধারণা এখানে নেই; এখানে জ্ঞান পূর্ণ যৌগপদ্যরূপে হয় বলে' এদের ভেদে মানসিক ভেদ, ভাব ও দূরত্ব থাকে না। সকল সত্তাই যুগপৎ সুসম্বন্ধিত হয়ে প্রকাশ পায়। সকল জ্ঞানের আকর হয়েও, এর সামঞ্জস্য ও ছন্দের হানি কখনও হয় না। ছন্দোবদ্ধ প্রকাশ এর ধর্ম্ম—অপরিমেয় প্রকাশে সুসঙ্গতি কখনও বিলুপ্ত হয় না। বিজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত অতিমানস ও অধিমানস জ্ঞানের সমন্বয়-ক্ষেত্র এই সদ্বিদ্যা। মহাশক্তির বিকাশ প্রকৃতিতে অবতরণ করে না, প্রকৃতি-জগতের সহিত তার কোন

সম্বন্ধ হয় না, যদি এই সদ্বিদ্যা ক্রিয়াশীল না হয়। এই সদ্বিদ্যা একদিকে যেমন মহাশক্তির ঘনীভূত প্রকাশ, অন্য দিকে তেমনি প্রকৃতির মূল ও আশ্রয়।

এই বিষয়টি তন্ত্রশাস্ত্রে অত্যন্ত গভীর। সাংখ্যাদি শাস্ত্রে পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে কোন সম্বন্ধ নেই—অর্থাৎ চিদ্বস্তুর সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ হওয়া অসম্ভব—প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধ্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই বিশ্বসম্ভারের স্ফূর্তি করে। কিন্তু এই স্ফূর্তির নিয়ামক স্বভাব (nature), তার ভিতর চেতনার কোন ক্রিয়া থাকতে পারে না। তন্ত্রে এই নিয়ামকতা পরাশক্তির নিয়ামকতা, সাক্ষাৎরূপে নয়, পরোক্ষরূপে সদ্বিদ্যার দ্বারা। সদাশিব বা ঈশ্বর শক্তির নিয়ামক নন; কেন না, তাঁদের প্রকৃতির সহিত কোন স্পর্শ নেই। কিন্তু প্রকৃতি ও চিদ্‌শক্তি তন্ত্রে বিরোধী পদার্থ নয়—চিদ্ ও প্রকৃতি, অব্যক্ত ও ব্যক্ত, আভাস ও পরিণাম, এদের সমন্বয়-কেন্দ্র সদ্বিদ্যা। সদ্বিদ্যা প্রকৃতি ও মহাপ্রকৃতির সন্ধিস্থল, প্রকৃতির ধাতু ও মহাপ্রকৃতির পাদপীঠ। মহাশক্তির এই পাদপীঠকে চুম্বিত করে' প্রকৃতি সঞ্চারিত হয়। শক্তির এই পাদপীঠের স্পর্শ ভিন্ন প্রকৃতির কোন ক্রিয়াই সম্ভব হয় না। এই স্পর্শেই প্রকৃতি পায় চেতনার সঞ্চার। তাতেই সৃজন-ক্রিয়ার আরম্ভ। যদিও প্রকৃতি চেতনার স্তব্ধীভূত বিকাশ, তবুও প্রকৃতির ক্রিয়ায় চেতনার সঞ্চার ও অনুস্যূতি আছে। জড়জগতের অন্তরালে প্রকৃতির ক্রিয়া চেতনারই, জড়ে তাই সঞ্চার হয় বলেই জড় ক্রিয়াশীল হয়। চিতি-শক্তি প্রকৃতির ঊর্দ্ধ জগতে যেমন, প্রকৃতির অন্তরেও তেমনি ক্রিয়াশীল। চেতনার সূত্র প্রকৃতির গহনতম তমিস্রাতেও ছিন্ন হয় না। চেতনার শক্তি সর্বত্র সম্প্রসারিত—ঊর্দ্ধে কি অধে। তন্ত্র এই সূত্রকে নিয়ে সাধনায় অতিমানস জ্যোতির্লোকে ও অধিমানস প্রসুপ্তিলোকে বিচরণ করে। প্রকৃতি ও চেতনার মধ্যে পার্থক্য পরস্পর বিরোধী নয়—এ

তত্ত্ব সম্বিত্তায় প্রতিভাত হয়—আপাতঃ বিরোধী তত্ত্বের সম্বন্ধ এখানে। সাংখ্যের দৃষ্টিতে ভেদ নিত্য, কারণ পুরুষ প্রকৃতি হয় না। তন্ত্র শক্তির প্রকাশ ও শুদ্ধতা স্বীকার করে, তাই জড় ও অজড়ের দ্বৈতদৃষ্টি তন্ত্রে নাই। শক্তির সঙ্কোচ ও পরিণামের স্বরূপ প্রকৃতি-জগতে স্ফুট, কিন্তু এই পরিণামের পশ্চাতে যে চেতনা বর্ত্তমান ও ক্রিয়াশীল তা সম্বিত্তায় স্তরে প্রত্যক্ষীভূত হয়। চিতিশক্তি ঘনীভূতাবস্থা প্রাপ্ত হয়েই পরিণত হয়, স্বরূপে তার পরিণাম নেই। প্রকৃতি চিতিশক্তির রূপান্তরিত অবস্থা হ'লেও, তাদের ভিতর কোন স্বরূপগত পার্থক্য নেই। তন্ত্রের এই সিদ্ধান্ত। বস্তুতঃ এক মহাশক্তি প্রকৃতি-জগতে ও তদূর্দ্ধে লীলায়ত—প্রাকৃত লীলায় সে স্ফূর্ত্তি নেই, যা অপ্রাকৃতে আছে। আভাস ও পরিণাম, অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত সম্বিত্তায় পূর্ণ প্রকাশিত। এ অবস্থায় উপনীত হ'লে বোঝা যায় যে, তাদের ভিতর একই শক্তি ক্রিয়াশীল—যদিও তার প্রকাশ ও ক্রিয়ার তারতম্য আছে।

দর্শনে প্রাকৃত (natural) ও অপ্রাকৃত (supernatural) বিশ্বের সম্বন্ধ নিয়ে অনেক তথ্যের অবতারণা হয়েছে। বিজ্ঞানের জগৎ পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত (determined), চেতনার জগৎ অনিয়ন্ত্রিত,—স্বাধীন সহজ প্রকাশ (spontaneous)। এই দুই জগতের সম্বন্ধ আবিষ্কার করতে গিয়ে প্লেটোর ন্যায় ঋষিকেও বিপদাপন্ন হ'তে হয়েছে। চেতনাতিরিক্ত জড়প্রকৃতি (matter) প্লেটো স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। পরবর্ত্তী দার্শনিকেরা প্লেটোর এই চিন্তার ধারায় দ্বৈতের সন্ধান পেয়েছেন। ম্যাটারে (matter) শুধু গ্রহণশীলতা (receptivity) থাকলেও, তার পৃথক অস্তিত্ব দ্বৈতেরই পরিচায়ক। বর্ত্তমান বিজ্ঞানে ম্যাটারের রূপ বদ্‌লে যাচ্ছে, ম্যাটার শক্তিতে পরিণত হচ্ছে (যদিও সে শক্তির ভিতর mass ও intertia স্বীকৃত হচ্ছে)। বেদান্তে প্রকৃতিকে মায়া বলা হয়েছে, ঈশ্বরের উপাধি হ'লেও, ব্রহ্ম বস্তুতে মায়া

নেই। ব্রহ্ম ও মায়া পরস্পরে আশ্রয় ও আশ্রিত হলেও, ব্রহ্ম কিন্তু স্বরূপতঃ কারও আশ্রয় নন এবং কোন সম্বন্ধীভূত হন না ; এবং অস্তিত্ব-রূপেও পৃথক—ব্রহ্মের অস্তিত্ব তাত্ত্বিক, মায়ার অস্তিত্ব কোন কালে তাত্ত্বিক বা ব্রহ্ম-সম নয়। মায়ার অস্তিত্বে উৎকর্ষ, অপকর্ষ আছে—ব্রহ্মের অস্তিত্বে তা সম্ভব নয়। ব্রহ্মের ও মায়ার কোন সঙ্গতি নাই—অদ্বৈতবাদে মায়ার তাত্ত্বিকত্ব স্বীকৃত হয় নি। মায়া অনির্ব্বচনীয়, শুদ্ধ বস্তুস্বরূপে অস্তিত্ব নাই। বস্তুতঃ, অদ্বৈত বেদান্ত সৃষ্টির বাধকেই প্রতিপন্ন করেছে—মায়া বা অবিদ্যার নিস্তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে'। জ্ঞানের জ্যোতিতে অবিদ্যার আবরণ কোথায়? অজ্ঞান, অবিদ্যা, মায়াই বা কোথায়? অদ্বৈতবাদ শুদ্ধব্রহ্ম প্রতিপাদক—কারণ, তাহাই বস্তু, আর সবই অবস্তু। অদ্বৈতবাদে বস্তু ও অবস্তুর সম্বন্ধে কোন গভীর জিজ্ঞাসাই উঠতে পারে না ; কারণ, পরম রহস্য গুহাস্থিত, জ্ঞানালোক সেই চেতনাগুহায় প্রবিষ্ট হ'লে সকল সৃষ্টি-রহস্য অরুণোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় দূরীভূত হয়ে যায়। শিবই সত্য, শক্তি পরম সত্য নয় বলেই ইহা ক্ষণিক, আছে কিন্তু নাই—একটা কুহেলিকা।

বস্তুতঃ দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ের কথা উঠতে পারে না, যেখানে শক্তির নিত্য অস্তিত্বের স্বীকৃতি হয় না। শক্তি যদি অনিত্যই হয় বা সঞ্চরমতত্ত্ব হ'তে ভিন্ন হয়—তবে বিজ্ঞানের জগৎ হয় প্রাতিভাসিক, তার চেতার্থকতাও হয় না। এমন কি ধর্ম্ম যা মানবচেতনা ও পরম সম্বিদের সহিত প্রকৃত যুক্ত প্রতিপন্ন করে, তার সার্থকতাও অকিঞ্চিৎকর হয়। ধর্ম্মও একরূপ চেতনাভিজ্ঞতা, যার অর্থ আছে, আমাদের অন্তরের জ্ঞানকে যা' রসে পূর্ণ করে, শান্তানন্দে উদ্দীপিত করে, কিন্তু অতীন্দ্রিয় তত্ত্বে তারও স্থান নেই। সাধারণ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের ন্যায় এই আন্তর বিজ্ঞানও অপসারিত হয় পূর্ণসম্বিদের রূপে। এরূপে জড়বিজ্ঞান, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ও পারমার্থিক বিজ্ঞানের ভেদ স্বাভাবিক, যেখানে শক্তি হয় নিত্যবস্তুর উপর আরোপিতা সত্তা।

তন্ত্র এইরূপ মতবাদকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করে না। তার লক্ষ্য হচ্ছে দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মকে এক মহাসমন্বয়সূত্রে গ্রথিত করা এবং তা সম্ভব হয়েছে শক্তির নিত্যত্ব স্বীকার করে'।

প্রকৃতি-জগতে শক্তির ক্রিয়া বিজ্ঞানের বিষয়। সাংখ্য এই বিজ্ঞানের পূর্ণরূপ দিয়েছে, কিন্তু সাংখ্যের দৃষ্টিতে পরাশক্তির ক্রিয়া পরিস্ফুট নয় বলে' সাংখ্য-সিদ্ধান্তে বিজ্ঞানের দৃষ্টি ও দর্শনের দৃষ্টির সমন্বয় হয় নি। তন্ত্রে বিজ্ঞানের দৃষ্টি কিন্তু প্রকৃতিতেই আবদ্ধ হয় নি, প্রকৃতি ও পরাপ্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হেতু পরাপ্রকৃতির পরিচয় প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। এই পরিচয় সদ্বিদ্যায় পরিস্ফুট। বিশ্ব-প্রকৃতির ভিতরেই পরাশক্তির জ্ঞানের ও আনন্দের সম্যক্ পরিচয়। এরূপে বিজ্ঞান-দৃষ্টির ভিতর দিয়েই অধ্যাত্ম-দৃষ্টির বিকাশ। এই জ্ঞান ও আনন্দের সূত্র নিয়ে ক্রমশঃ অন্তর্দৃষ্টিতে সদ্বিদ্যার পূর্ণ উন্মেষ, অধ্যাত্ম-জ্ঞানের উদ্বোধন। প্রকৃতির ভিতর ও অন্তরগুহায় অধ্যাত্মশক্তির স্ফূর্ত্তিতে ক্রমশঃ বিজ্ঞানদৃষ্টি অতিক্রান্ত হয়। সদ্বিদ্যায় এই অধ্যাত্মদৃষ্টির পরমস্ফূর্ত্তি। সদ্বিদ্যা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের কেন্দ্র, এখানেই চিৎশক্তির স্বরূপের প্রকাশ। এই প্রকাশে অন্তরে অধ্যাত্মালোকের দীপ্তি—প্রকৃতির মূলে অপ্রাকৃত বিজ্ঞানের স্বরূপস্ফূর্ত্তি। এই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে শক্তির চিদ্রূপ তার প্রকাশ; অন্তরে শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিদ্যা প্রভৃতি দৈবী সম্পদের আবির্ভাব। এই তো ধর্ম্মাববোধ। সদ্বিদ্যায় ইহার পূর্ণ প্রকাশ। সদ্বিদ্যা এই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের সহিত পরাবিজ্ঞানের সমন্বয়-ক্ষেত্র। ধর্ম্মাববোধের উর্দ্ধে তত্ত্ববিজ্ঞান। সদ্বিদ্যা তত্ত্ববিজ্ঞানের পাদপীঠ, পরমশিব তার স্বরূপ। দার্শনিক প্রজ্ঞা এখানেই স্ফূর্ত্তিলাভ করে, কারণ এই ভূমিকাতে তাত্ত্বিক দর্শন হয় বিজ্ঞান, অধ্যাত্মবিজ্ঞানের কেন্দ্র অতিক্রম করে' জ্ঞানস্বরূপতার ও পরতত্ত্বের জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানে বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-সম্পদের পূর্ণ দৃষ্টি থাকলেও, তার বিস্তৃতি বৃহত্তর, সত্তা বৃহত্তম, চেতনা

প্রভূততম। এত বৃহৎ এর স্বরূপ যে, এখানে শক্তির সঙ্কোচের ভাণ হয় না। এই বৃহতে শক্তি যেন নিস্পন্দ হয়েই থাকে।

সদ্বিদ্যায় কিন্তু এই পরিধিশূন্য জ্ঞান বিজ্ঞানরূপে প্রতিফলিত হয়েও, এখানে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের সহিত পরম জ্ঞানের, প্রাকৃত শক্তির সহিত অধ্যাত্মশক্তির ও পরাশক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয়। একই পরাশক্তি কিরূপে অধ্যাত্মশক্তিতে ও প্রাকৃত শক্তিতে প্রকাশিত, তার অপরোক্ষ জ্ঞান সদ্বিদ্যায় স্ফুরিত। এখানেই চিতিস্পন্দনের তারতম্যতায় অধ্যাত্ম ও প্রাকৃত শক্তির আবির্ভাব। সদ্বিদ্যায় ঈশ্বরীয় বিভূতি ও অব্যক্ত শক্তির অপূর্ব্ব মিলন। এই সদ্বিদ্যা সমষ্টিচেতনারও উর্দ্ধে—ব্যষ্টি চেতনারও উর্দ্ধে। ব্যষ্টি-সমষ্টিবোধ এখানে পৃথক্ নয়। তাদের পার্থক্য প্রাকৃত জগতে প্রকাশিত হয়—এখানে তারা অপূর্ব্বরূপে সমন্বিত। এই সদ্বিদ্যার জন্য শৈবাগমে নানা দ্বন্দ্বের সমাধান হয়েছে। সদ্বিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত হলে চেতনার সঙ্কোচন-প্রসারণ বোধগম্য হয়। চেতনা সঙ্কুচিত হয়ে প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয়, প্রকৃতি প্রসারিত হয়ে চেতনায় স্ফূর্ত্ত হয়। সদ্বিদ্যার এমনি স্থিতি—যেখানে আলো-আঁধারের সমাবেশ। আলো ও আঁধার, জ্ঞান ও অজ্ঞানের বিরোধ এখানে হয় না। আঁধার আলোরই অংশপ্রকাশ। অজ্ঞান জ্ঞানবিরোধী নয়—জ্ঞানের অস্ফুট বিকাশ। এই জন্য সদ্বিদ্যায় তাদের সমন্বয় সম্ভব।

এই জ্ঞান ও অজ্ঞানের বিরোধী সম্বন্ধ অনেকটা তিরোহিত হয় সত্ত্বের বিকাশে। সত্ত্বাতিশয়ে অন্তর তেজোময় দীপ্তিতে পূর্ণ—রজস্তম অভিভূত হয়। সত্ত্বের এই প্রকাশরূপতা বৃদ্ধির সহিত সত্ত্বের সহিত চিৎশক্তির ঘনিষ্ঠতার জ্ঞান হয়। সত্ত্বাবির্ভাবে তেজোময় বিকাশে অজ্ঞানের আচ্ছন্নতার তিরস্করণ—স্বচ্ছতাস্ফূর্ত্তি। সত্ত্বের স্বচ্ছতা, বিকাশশীলতা চৈতন্যের অনুরূপ এবং এর বৃদ্ধির সহিত জড়তা তমিস্রার বিনাশ। এই অনুভবকে অবলম্বন করে' চিৎশক্তির ও প্রকৃতির মধ্যে একটা

অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান থাকতে পারে না—এই কথা শৈবাগম বলে' থাকে। সাংখ্যে অবশ্য এই সিদ্ধান্ত আদৃত হয় না; সাংখ্য চিৎশক্তি বলে' কোন কিছু গ্রহণ করে না, কিন্তু চিৎশক্তি তন্ত্রে প্রধান বস্তু, এই শক্তির অনুরাগ শক্তি প্রকৃতি। এই প্রকৃতি ও চিৎশক্তি একই পদার্থ, প্রকাশের তারতম্যে এদের ভেদ। কিন্তু সত্ত্বাতিশয্যে প্রকৃতি চিৎশক্তির ন্যায় প্রকাশশীল হয়—এই সম্ভাবনাকে অবলম্বন করে' প্রকৃতি ও চিৎশক্তির ভেদ দূরীভূত হয়।

বস্তুতঃ পূর্ণ চেতনা ও অজ্ঞানের ভিতর বিভিন্ন স্তর আছে। এই অবস্থাগুলির সহিত পরিচয় হ'লে বোঝা যায়, জ্ঞান ও অজ্ঞান পরিপূর্ণ বিরোধাত্মক নয়। অজ্ঞান জ্ঞানের স্তিমিতভাব। সত্ত্বিস্থায় প্রকৃতি স্বচ্ছ, আবরণশূন্য; এখানে চিদ্‌শক্তির সহিত তার ঘনিষ্ঠতাবোধ। এই সত্ত্বিস্থায় প্রকৃতির চিৎশক্তির স্বরূপতা প্রতিপন্ন হয়। বস্তুতঃ শৈবাগমের সিদ্ধান্ত শক্তির অদ্বৈততা। শক্তি অখণ্ড হলেও তার প্রকাশভেদ আছে। প্রকৃতির ঊর্দ্ধ জগতে তার নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ প্রকাশ আর প্রকৃতিতে পরিণামী বিকাশ। কিন্তু এই পরিণামের মূলে আছে একই শক্তি—পরিণামে শক্তির স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, পরিণাম হয় প্রকারে, স্বরূপে নয়। পরিণাম ও প্রকাশের ভিতর দিয়ে শক্তির স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয় না—শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে লীলায়িত হ'লেও, সকল মূর্চ্ছনার ভিতর দিয়ে শক্তি থাকে শক্তিই। অন্তর-স্ফূর্তিতে ও পরিণামে তার স্বরূপে কোন ব্যত্যয় ঘটে না। সঙ্কুচিত ও অসঙ্কুচিত বৃত্তিতে শক্তি শক্তিই থাকে। শক্তির প্রকাশ ও পরিণাম বিস্ময়কর—ভেদ উপস্থিত করেও তাদের সহিত অভিন্নতা অনুভব করে—কারণ এও শক্তিরই প্রকাশ ও পরিণাম; শক্তির ভিন্নতা কিন্তু নেই। তত্ত্বতঃ প্রকাশ ও পরিণামের সঙ্গে তার কোন ভেদ নাই। ভেদবিকাশও ক্রিয়ায়, তত্ত্বে নহে।

* * *

সম্ভূতি

মহাশক্তির প্রকৃতি জগতে সাক্ষাৎভাবে ক্রিয়াশীল না হ'লেও, তার সম্ভূতি ক্রিয়াশীল। প্রকৃতি-জগতে জ্ঞানের, ঐশ্বর্য্যের, বীর্য্যের, সামঞ্জস্যের, সৌন্দর্য্যের, নিপুণতার বিশালতা মহাশক্তির সম্ভূতির কার্য্য। প্রকৃতি জড়াত্মিকা, তার ক্রিয়ায় এমন রমণীয়তা, এমন সমাবেশ, এমন ছন্দ, এমন নমনীয়তা, সৃজনবৈচিত্র্য কিছুতেই সম্ভব হয় না যদি মহাশক্তি তাঁর সম্ভূতির ভিতর দিয়ে প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল না হন। প্রকৃতির জড়তা-তমিস্রা দূরীভূত করে', স্বভাব-শক্তি নিয়ন্ত্রিত করে' গতি-ছন্দে সম্ভূতি অলৌকিকরূপে কার্য্যকরী। সম্ভূতির সম্পর্কে প্রকৃতি স্ফুরিত হয় সৃজন-বৈচিত্র্যে, স্থিতি-সংবেশে, সুষমার স্ফূর্ত্তিতে, লয়ের অন্তর্ম্মুখীনতায়।

এই সম্ভূতির রূপ অনন্ত, অনন্তরূপে ক্রিয়াশীল—প্রকৃতির উর্দ্ধে এর গতি—প্রকৃতির উপরে মহাশক্তির কর্ত্তৃত্ব এই সম্ভূতির দ্বারাই। শুধু বিশ্বমুক্তি, স্থিতি ও লয়ে এর ক্রিয়া নিবদ্ধ নহে; বিশ্বে বিরাট্ পরিবর্ত্তন, সৌন্দর্য্যময় সৃষ্টি, কোন আকস্মিক আবির্ভাব সবই সম্ভব হয় এই সম্ভূতির দ্বারা। এই সম্ভূতি বিরাট্ ভাবে (Cosmic) ক্রিয়াশীল হ'লেও, প্রত্যেক ঘটনা-সমাবেশে ইহা সক্রিয় অলক্ষ্যরূপে—এর ভিতর দিয়ে চিৎশক্তি জগতে ক্রিয়া করে। সম্ভূতির আধিভৌতিক বিকাশ হয় সূর্য্য, চন্দ্রমা, বায়ু, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতির ভিতর দিয়ে; আধিদৈবিক বিকাশ দিব্য-শক্তির ভিতর দিয়ে (যা অধিদৈব-বিশ্বে ক্রিয়াশীল), অধ্যাত্ম-বিকাশ হয় অন্তরে দিব্য-প্রেরণা ও দিব্য-বিভূতির দ্বারা।

কিন্তু বিশ্বের কোন বিশেষ ব্যাপারে সম্ভূতির অসাধারণ বিকাশ সম্ভব হয় এক অচিন্ত্য বিবর্ত্তনে। সম্ভূতির সাধারণ ক্রিয়ায় এরূপ সম্ভব হয় না, আবশ্যক হয় সম্ভূতির বিশেষ বিকাশ ও ক্রিয়া। সৃষ্টির গতিতে

এরূপ বিকাশের চমৎকারিত্ব আছে। এরূপ বিকাশ বিশ্ব-দৃষ্টি আকর্ষণ করে; ঘটনাপুঞ্জের এমনি সমাবেশে, এমনিতর বিকাশে সভ্যতার হয় নবীন উল্লাস। বিশ্বশৃঙ্খলার অভূতপূর্ব্ব নিয়মন সম্ভূতি দ্বারাই সম্ভব।

সম্ভূতি মহাশক্তি হতে কখনই ভিন্ন হয় না। অনন্ত প্রকাশেও মহাশক্তি এক ও অভিন্ন, জ্যোতির ও গতির ছটা এক কেন্দ্র হ'তে উদ্ভূত হয়ে বিশ্ব প্লাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করলেও, তারা এই মহাশক্তিরই প্রকাশ —প্রত্যেক সম্ভূতিতে মহাশক্তি পূর্ণরূপে বিরাজ করেন, যদিও তাঁর প্রকাশের আনন্ত্য আছে। এই সম্ভূতির উপাসনায় মহাশক্তির উদ্বোধন; কারণ, তার অন্তর মহাশক্তিতে ধৃত ও প্রতিষ্ঠিত। সম্ভূতিকে আশ্রয় করেই মহাশক্তির আত্মপ্রকাশ, এইভাবেই তিনি গ্রাহ্য; তাঁর অপরিমেয় নির্ব্বিশেষ স্বরূপে কেউ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না, তাকে ধারণ করবার সামর্থ্য কারও নেই। মহাশক্তিকে সম্ভূতি দিয়েই বুঝতে হয়, সম্ভূতি দিয়েই পেতে হয়।

বিশ্বাতীত বিধানে মহাশক্তি নামরূপের অতীত হয়ে ক্রিয়াশীল,— মহাব্যোমে মহাশক্তি উল্লসিত; সে উল্লাসের রূপ নেই, মূর্ত্ত প্রকাশ নেই; আছে শুধু নির্ব্বিশেষ গতি—শিবময় স্থিতিতে অখণ্ড সম্পাদে উল্লাস—নিবিড় চেতনায় সুসম্বন্ধিত অবিভাজ্য বিকাশ। কিন্তু সৃষ্টিতে তাঁর প্রকাশ ব্যক্ত হ'লেও, তাঁর সহিত কোন ভেদ হয় না। শক্তির কি ব্যক্তত্বে, কি অব্যক্তত্বে একই রূপ। শক্তি স্বরূপে অব্যক্ত, ব্যক্ত রূপে তাঁর বিকাশ। শক্তির ব্যক্ত রূপের ভিতর দিয়ে তাঁর সার্ব্বভৌমিক অব্যক্ত রূপের পরিচয়। ঘনীভূত হয়েও শক্তি ব্যাপক, ব্যাপক হয়েও ঘনীভূত। এই স্বভাবকে অবলম্বন করে' শক্তির অব্যক্ত হ'তে ব্যক্ত রূপের বিকাশ; ব্যক্তের ভিতর অব্যক্তের অনুসন্ধান। সৃষ্টির ছন্দে শক্তির ব্যক্ত রূপ উল্লসিত; অনন্ত ছন্দে বিকাশ—এর শেষ নেই, এর বিরাম নেই। এ বিকাশ বিস্ময়কর, বুদ্ধি এর স্বরূপ ধারণা করতে পারে

না ; নিমেষে বিকশিত হয়, ধারণার অতীতরূপে ক্রিয়াশীল হয়ে নিমীলিত হয় বিজ্ঞানের দীপ্তিতে। মহাজ্যোতিঃ ছন্দে সম্ভূতির বিকাশ ; অন্ধকার ও তমঃ বিনাশ করে' সম্ভূতি আনন্দের স্নিগ্ধতায়, প্রাণের সঞ্জীবতায় উদ্বোধিত হয়, মর্ত্ত্যকে অমৃতে সিঞ্চিত করে। সম্ভূতির দিব্যস্পর্শে সৃষ্টি অপরূপ সৌন্দর্য্য ও গৌরবে বিকশিত, অশেষ সম্পদে বিভূষিত। সৃষ্টির যা কিছু আকর্ষণ, সবই এই দিব্যস্পর্শের জন্য। সৃষ্টিকে মহিমায়, মঙ্গলে ও সৌন্দর্য্যে অভিষিক্ত করতে সম্ভূতির এই দিব্য-শক্তি ক্রিয়াশীল। প্রকৃতির বাধা অতিক্রম করে' জীবনকে ভূতি, শ্রী, স্বচ্ছতায় পূর্ণ করবার গঙ্গোত্রীপ্রবাহের ন্যায় এই মর্ত্ত্যে সম্ভূতির অবতরণ। আধিভৌতিক বিকাশে এর মহিমা স্ফূর্ত্ত, সম্ভূতি এখানে অশেষ দিব্যশক্তিরূপে ক্রিয়াশীল ; কখনও ধ্বংস করে' সৃষ্টিকে অভিষিক্ত করে, কখনও বা সৃষ্টির অন্তরে অপরূপ লাবণ্য ও সুসঙ্গতি জাগিয়ে তোলে, কখনও বা সৃষ্টির পর্য্যায়বিশেষ ধ্বংস করে' বিশ্বে বিরাট মহিমাকে আকৃষ্ট করে। সৃষ্টিতেই শুধু তার মহিমার শেষ হয়নি, ধ্বংসেও তার মহিমার বিকাশ—ধ্বংস তো কেন্দ্রাভিমুখী শক্তির বিকাশ বই তো নয়।

মহাশক্তির এই আধিভৌতিক জগতে আবির্ভাব যেমন বিস্ময়কর, আধ্যাত্মিক জীবনেও আবির্ভাব তেমনি দীপ্তিকর। অধ্যাত্ম-জীবনে সম্ভূতিকে আরও নিবিড় রূপে পাই চেতনার দীপ্তিতে, বিজ্ঞানে, মনে, প্রাণে। সম্ভূতি এখানে বিশ্বশক্তিরূপেই আবির্ভূত হন না, পরমাত্মীয় রূপে, আপনার আপনরূপে অন্তরে তিনি দর্শন দেন। ইনি শুধু বিশ্বশক্তি নন, ভক্তের মা—সত্তায় সর্ব্বত্র বিরাজিত হয়েও, তিনি আবির্ভূত হন মাতৃরূপে, রক্ষয়িত্রী ধাত্রীরূপে। এই সম্ভূতি রক্ষক, পালক। কিন্তু সম্ভূতির এই বিকাশ পরম বিকাশ নয় ; তার বিকাশ মনোহর হয় যখন তিনি তাঁর বিভূতি, দিব্য তেজ ও শক্তির সহিত পরিচয় করিয়ে দেন জ্ঞান, প্রশান্তি ও দীপ্তিময় সত্তার।

এই সম্ভূতি অবতরণ করে মহিমা ও প্রশান্তি রূপে, শ্রী রূপে, সংসিদ্ধি ও নৈপুণ্যরূপে, তেজ ও শক্তিরূপে। সম্ভূতি যখন অন্তর দীপ্ত করে তখন হয় মহাশক্তির প্রকৃত পরিচয় সত্তার শক্তিরূপে। জীব-চেতনায় সম্ভূতির স্পর্শে ক্ষুদ্রত্বের অপনোদন, তার মহাশক্তির উল্লাস। ভক্তি সম্ভূতির সহিত সত্তার একত্ব প্রতিষ্ঠা। চেতনা, বিজ্ঞান, মন, প্রাণের সব ক্রিয়া ক্রমশঃ সম্ভূতির শক্তিতে সঞ্জীবিত হয়। এদের সঙ্কীর্ণতা লোপ পায়; জ্ঞানের, শক্তির, সম্পদের আবির্ভাব হয়। বস্তুতঃ সম্ভূতির উপাসনায় পুরাতন স্মৃতির স্থানে নবীন স্মৃতি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—মানবের দিব্য জন্ম ও বিকাশ হয়, জীবন দিব্যরূপে লীলায়িত হয়।

সম্ভূতির অবতরণে সত্তার সঙ্কোচ দূরীভূত হয়। সম্ভূতি সত্তাকে অধিকার করে। এক ব্যাপকময় সত্তার গতির বিস্ময়কর বিকাশ হতে থাকে। আস্পৃহার তীব্রতানুযায়ী শক্তির পরিচয়। প্রত্যেক ভাব সম্ভূতির আলোকে দীপ্ত, সম্ভূতির শক্তিতে স্ফুট, অন্তর বিরাটের রূপে হয় পূর্ণ। তখনই হয় সঙ্কুচিত অহঙ্কারমুক্ত মানব বিশ্বাত্মাবোধে প্রতিষ্ঠিত। সে নিবিড় উজ্জ্বল শক্তিতে হয় ধৃত এবং চালিত। এই শক্তির পূর্ণ উদ্বোধনে মানুষের জ্ঞানের সীমা থাকে না—অপরোক্ষ বিজ্ঞান, পরাসম্বিদ্ তখন তাকে আশ্রয় করে।

শক্তির সহিত এই অভিন্নতা বিস্ময়কর। সংগৃহীত জীবত্ব ও তার ভাবধারাকে নিমেষে দূরীভূত করে' মহাশূন্যে, মহাব্যাপ্তিতে সম্ভূতি সাধককে যখন প্রতিষ্ঠা করে, তখন সাধকের ঐশ্বরীয় ঐশ্বর্য্য আবির্ভূত হয়। সকল সিদ্ধি হয় তাঁর করতলগত। মহাশক্তির অনন্ত বিকাশের ভিতর ভক্তের হৃদয়ে আকস্মিক রূপের বিকাশ—সৌন্দর্য্যের, শক্তির ও জ্ঞানের। এই মূর্ত্ত বিকাশেই তাঁর হৃদয়ের সংযোগে ও ভাবের গভীরতায় অনন্ত রসের সৃষ্টি। এই রসবোধ পুষ্ট করবার জন্য মহাশক্তি চিন্ময় মূর্ত্তি ধারণ করেন। শক্তির সম্ভূতি নিরাকার হয়েও সাকার রূপ

নিতে পারে ; শক্তির সবিশেষতা নাম, রূপ ও ক্রিয়ায় বিকশিত হয়। নিরাকার ও সাকার পরস্পর বিরোধী নয়, নিরাকারের ঘনীভূত বিকাশই সাকার। এ সৃষ্টি স্বরূপতঃ এই। চিন্ময়জগতে এই চিন্ময়ের বিশেষ প্রকাশ, এখানে শক্তির ও প্রসারের সংখ্যা নাই—কোন নির্দ্ধারিত ধারা নাই। শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে অনন্ত উর্ম্মির ন্যায় নানারূপে প্রকাশিত হয়। তন্ত্রমতে সকল বিকাশের মূলে শক্তি—প্রাকৃত জগতের পরিণাম আছে ; কিন্তু অপ্রাকৃত মূর্ত্ত বিকাশ তো প্রকৃতির উর্দ্ধে। সম্বিত্তায় এর প্রতিষ্ঠা ; ছন্দে, রূপে, নামে এ প্রকাশ নিত্য। নিত্য হ'লেও এর মূলে অব্যক্ত আছে বলে' কখনও অব্যক্তে লীন হয়, কখনও প্রকাশ হয়। মহাশক্তি কোন মানসিক নিয়মে বদ্ধ নন—অতিমানসিক স্বরূপ হয়েও তিনি অব্যক্ত, অব্যক্ত হয়েও ব্যক্ত, আবার ব্যক্তাব্যক্তের অতীত। এইরূপেই তিনি নিত্য।

মহাশক্তির অন্তরে এই প্রকাশ অতিমানসিক রূপে ও শব্দে সত্তাকে উদ্বোধিত করে, দীপ্ত করে, জ্ঞানের আচ্ছন্নতা বিনাশ করে, শিবময় স্থিতিতে প্রতিষ্ঠা করে। ছন্দ অন্তর আলোড়িত করে' বিরাটের বোধন করে ; ব্যক্তিত্বের নির্য্যাস উদ্ধৃত করে' অব্যক্তের সহিত করায় পরিচয়। সম্ভূতির এই-ই স্বরূপ। ছন্দ শব্দময় হলে হয় মন্ত্র, তেজোময় হলে হয় দীপ্তবিগ্রহ। সম্ভূতি প্রকাশিত হয় শব্দছন্দে ও তেজোময় বিগ্রহে।

সম্ভূতির প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞান ও ক্রিয়ার ছন্দ ; প্রকৃতি অবতরণে এই ছন্দ রূপ নেয় শাব্দ ও তেজোময় বিগ্রহে। এই জন্য শব্দ-ছন্দের সহিত তেজঃ-ছন্দের নিত্য সম্বন্ধ। গতি, শব্দ ও জ্যোতিপ্রবাহে সম্ভূতি সাধকের চিত্ত পূর্ণ করে ; বিজ্ঞানকে উদ্বোধিত করে বিশ্ববিজ্ঞানে ও মহিমায়, প্রাণকে সঞ্চারিত করে অপ্রতিহত শক্তিতে ; ইচ্ছাশক্তিকে সমৃদ্ধ করে' সৃজন-বৈভব জাগিয়ে তোলে।

বস্তুতঃ সম্ভূতির দিব্য-বিগ্রহ মন্ত্র। এই মন্ত্র ছন্দের বাহন, এতে সঙ্কুচিত হয়ে থাকে সম্ভূতির স্বরূপ ও শক্তি। এই মন্ত্র-ছন্দে চিদাকাশে

সম্ভূতির তেজোময় বিকাশ। ছন্দের স্বরূপ নির্ণয় করে বিকাশের রূপ। অশেষ ছন্দে অসংখ্য বিকাশ। এই সম্ভূতির অবতরণে চিত্ত হয় উর্দ্ধমুখী, ছন্দ চিত্তের আবরণ ও আবিলতা দূরীভূত করে' দিব্যশক্তির আহ্বান করে। চিত্ত-স্পন্দন জ্যোতিচ্ছন্দে আপ্লুত হয়ে' সম্ভূতির তেজোময় বিগ্রহের কাছে অর্ঘ্যরূপে আত্মনিবেদন করে। সত্যান্বেষী চিত্তের প্রবণতায় আকর্ষণ করে অন্তরে সম্ভূতির অবতরণ, এই প্রবণতা হচ্ছে আন্তর স্বাচ্ছন্দ্য, আন্তর স্বাচ্ছন্দ্য দেয় সত্তার গভীরানুপ্রবেশ, যাকে আশ্রয় করে' দিব্যলোকের শক্তি ও ছন্দের জাগরণ।

সম্ভূতির মূর্ত্ত প্রকাশ সম্ভব। বিস্তৃত তেজ পুঞ্জীভূত হয় অন্তর-লোকে, জ্যোতিধারা অন্তরে প্রতিফলিত হয়ে রূপ নেয়। এ রূপ স্বচ্ছ, দিব্য ; এ রূপ অরূপের রূপ, হৃদয়ে শতধারায় মূর্চ্ছনা জাগিয়ে তোলে। সমস্ত সত্তা এর গতিপ্রবাহে অপরূপ বিকাশে বিভূষিত হয়। সম্ভূতি ক্রমে জাগায় দিব্য বিভূতি, তার অনুসরণে সত্তা হয় দিব্য।

সম্ভূতি শুধু সত্তায় অনুপ্রতিষ্ঠ হয়ে একে আরোপিত শক্তিতে পূর্ণ করে না, নিজের সত্তার মধ্যে আকর্ষণ করে' তার অনন্ত বিভূতির পরিচয় দেয় এবং তাও অতিক্রম করে' তার সত্তার সহিত সাধক সত্তা হয় এক। অস্তগামী সূর্য্য যেমন সকল রশ্মিকে আকর্ষণ করে' স্বরূপে প্রতিষ্ঠা করে, সম্ভূতি তেমনি সত্তাকে দীপ্ত করে' নিজের অন্তরে আকৃষ্ট করে জীবত্বকে সঙ্কীর্ণতা হতে মুক্ত করে'। কিন্তু সম্ভূতির এই একমাত্র কাজ নয়। আধারকে অধিকৃত করে' সম্ভূতি হয় ক্রিয়াশীল, আধার হয় সম্ভূতির পাদপীঠ। এ সম্ভব হয় যখন সম্ভূতির সহিত আধারের ভেদ থাকে না। কিঞ্চিন্মাত্র ভেদ থাকলে সম্ভূতির শক্তিতে অনুপ্রাণিত হওয়া সম্ভব, কিন্তু সম্ভূতির সহিত একত্বের ঐশ্বর্য্য ও প্রকাশের মহিমা সম্ভব নয়। অভিন্ন বিকাশেই মাত্র শক্তির মহিমা সম্যক্ উপলব্ধি হয়, উপাসনার ভেদ অপসারিত হয়ে অভিন্নতা প্রতিষ্ঠা হয়। শক্তির

সহিত সম্বন্ধ হ'লে শক্তির বিকাশ অবশ্যম্ভাবী ; শক্তির অবতরণে ভেদের অপসারণ, অভিন্নতার আস্বাদ। অবিচ্ছিন্ন শক্তির অবতরণে জীবত্বের ক্রমশঃ অপসারণ এবং অভিন্নতার প্রতিষ্ঠা। নিরবচ্ছিন্ন শক্তির আবেশে সত্তা শক্তির ক্রীড়নক হয়ে কাজ করে। তার বোধ ও শক্তি অতিমানস জ্ঞানে ও শক্তিতে হয় আপ্লুত—পূর্ব্বসংস্কার ও স্মৃতির হয় অপলোপ—দিব্যস্মৃতির ও প্রেরণার হয় উদ্বোধন। শক্তিসাধনার গতিই এরূপ ; ভিন্ন হয়েও অভিন্নবোধ অনুভব করে, ক্রমশঃ পূর্ণরূপে আসে অভিন্নতার অধিকার। তখনই সাধকের অভয় প্রতিষ্ঠা। প্রকৃতির সকল জড়তা ও বশ্যতা হতে মুক্ত হয়ে তিনি ঈশ্বরবৎ বিচরণ করেন। সম্ভূতির অন্তরপ্রবেশে হৃদয় হয় জ্যোতিষ্মান্ ও দিব্য। সত্তার উর্দ্ধস্তরগুলি হয় আলোকে উদ্ভাসিত, নিম্নস্তরগুলি হয় জ্যোতিতে দীপ্ত। কিন্তু সত্তার সকল স্তরের রমণীয় প্রকাশকে অতিক্রম করে' সাধকের হয় শক্তি ও শিবের সহিত অভিন্নতা বোধ। সাধক ব্রহ্মজ্ঞানে ও স্বরূপে প্রতিষ্ঠা পান—বিশ্বকে নিজের সত্তারূপে দেখতে পান। জ্ঞানের এ ভূমিকা বিশ্ব ও বিশ্বাতীত ভূমিকা। এখানে সাধক কিঞ্চিন্মাত্র ভেদ অনুভব করেন না, বিশ্বের সকল স্থিতি ও সত্তার ভিতরে তিনি অনুভব করেন এক বিরাট্ স্থিতি ও শক্তি। স্থিতি ও গতির এই-ই স্বরূপ।

সম্ভূতির রূপ :

সম্ভূতির জ্যোতিঃ ছন্দ অপরূপ রূপে হৃদাকাশকে উদ্ভাসিত করে সত্তার উন্মুখতায় ও পরমাস্পৃহায়। উর্দ্ধ জ্যোতিঃ সত্তাকে অভিষিক্ত করে' অন্তরে নানা রমণীয় গতি ও ছন্দ জাগিয়ে তোলে। এই জ্যোতিঃ অভিভূত করে, সমগ্র সত্তাটিকে উজ্জ্বল করে, ভাস্বর করে, হ্লাদিনীর বিকাশ করে। এই জ্যোতিঃ ছন্দ এক রূপই নেয় না—এর অনন্ত রূপ, অনন্ত ঝঙ্কার, অনন্ত প্রকাশ, অনন্ত মহিমা। ছন্দের তারতম্যে এর

প্রকাশ-বৈচিত্র্য। সম্ভূতির ছন্দের একই রূপ নয়, প্রকাশ ও ক্রিয়া যে অসীম! তাই নানারূপে এর অবতরণ। প্রত্যেক অবতরণে বিজ্ঞান, মন, প্রাণই হয় ক্রিয়াশীল,—ছন্দ মাত্রেই জ্ঞানে উদ্ভাসিত ও শক্তিতে অনুপ্রাণিত। কোথায় বিজ্ঞানশক্তি অধিকতর ক্রিয়াশীল, কোথায়ও ইচ্ছা ও প্রাণশক্তি অধিকতর ক্রিয়াশীল, কোথায়ও আনন্দ ও সুষমা অধিকতর ক্রিয়াশীল। এরা একই মহাছন্দের অভিব্যক্তি, একই মহাশক্তির স্ফূরণ হলেও, ছন্দের বিভিন্ন প্রকারের প্রকাশ। সম্ভূতির ছন্দ নানা রূপ ও রসযুক্ত।

বিজ্ঞান স্তরে ছন্দ গভীর, জ্ঞান-দীপ্ত—প্রসারিত, প্রশান্ত। অনন্ত অবকাশে শান্ত জ্যোতিঃস্পন্দনে এর প্রকাশ। গতির চেয়ে স্থিতি, উচ্চতা অপেক্ষা প্রসার, সম্পৎ ও বিভূতি অপেক্ষা সত্তার দিকে ইহার স্বাভাবিক আকর্ষণ। প্রকৃতির মধ্যে অবতরণ করলেও, এর স্বভাব-গতি প্রকৃতির ঊর্দ্ধ সত্তার এবং মহিমময় প্রকাশের সহিত পরিচয় স্থাপন করে। অন্ধকার, তমসা, আবিলতা এঁকে স্পর্শ করতে পারে না, এঁর বিকাশ এদের অতীত। শুদ্ধ জ্ঞান-জগৎ ইহার অধিকৃত—বিজ্ঞানের নিম্ন ভূমিকায় এঁর অবতরণ হয় না। ইনি বিজ্ঞানের সুদীপ্তিতে শুদ্ধ আঁধার পূর্ণ করেন। শেষ পর্য্যন্ত ইনি অন্তরকে সংযোগ করে' দেন পরম জ্ঞানের সহিত। এঁর স্পর্শে প্রাণাধার হয় শান্ত, প্রাণের ক্ষুদ্র স্পৃহা দূরীভূত হয়—এক মহাপ্রশান্তি শুদ্ধতায় চিত্ত হয় সমাহিত। এ সম্ভূতির প্রতিষ্ঠা মহিমায়। এ মহিমা শুধু চেতনার, সৃষ্টির ও লয়ের মহিমা নয়; এ লয়ের ঊর্দ্ধে ধৃতির মহিমা। লয় ও সমাধি এর ক্রিয়া হলেও, এর পূর্ণ বিকাশ—ধৃতিতে। ধৃতি পরম সম্পদ্। এর অবতরণে প্রকৃতির সকল আবরণের উন্মোচন ও স্বরূপভূত জ্ঞানের বিকাশ। এঁর শক্তিই প্রাকৃত লয় হতে মুক্ত করে' অভয়ে প্রতিষ্ঠা করে। ছন্দ এঁর এমনি যে, প্রকৃতির কোন বৈভবে আকৃষ্ট হয় না। বিশাল বিকাশের ছন্দে প্রকৃতি অতিক্রম করে' মহাশক্তি [illegible]

আর সত্তার দেয় পরিচয়। এমন কি তার সাথে করে অভিন্নতা প্রতিষ্ঠা। মুক্তি, অভিন্নতা, স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা এর স্বাভাবিক অবদান—সকল ঐশ্বর্য্য-দাতৃত্ব থাকলেও, ঐশ্বর্য্যকে ইনি করেন অতিক্রম, প্রকৃতির সঙ্কীর্ণতা ও সঙ্কোচ হতে ইনি দেন জ্ঞানের শেষ ফল, পরমা মুক্তি। স্বরূপত প্রজ্ঞা এঁর বিশিষ্ট অবদান। ইনি বৃহৎ হতে বৃহত্তর সত্তাতে আকৃষ্ট করেন, ঋত ও সত্যে প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি মহাশক্তির মহেশ্বরী রূপ।

মহাশক্তির মহাসরস্বতী রূপ নিখুঁত করে সৃজন করেন। সৃজন-শক্তির সংসিদ্ধিরূপে ইনি আবির্ভূতা হন, প্রকৃতির সকল বাধা বিদূরিত করে নিপুণতা সহকারে সৃষ্টির উদ্ভব করা ইঁহার কাজ। সৃজনের নিগূঢ় কৌশল ইঁহার নিকট প্রতিভাত; বস্তুতঃ, এই কৌশল ইঁহার স্বরূপ ও প্রকাশ। প্রকৃতিকে বশীভূত করে ঊর্দ্ধে সামঞ্জস্য ও ছন্দে ইনি প্রকৃতি জগতে উদ্বোধিত হয়েন—ইনি সৃজন-ছন্দ-বৈভবে পূর্ণ। ইনি বাক্‌রূপা—বাক্‌ই তো সৃষ্টির প্রাথমিক বিকাশ। অনন্ত শব্দ-সম্পদ্, অনন্ত জ্ঞানের ও কলার প্রকাশ করেন; এই শাব্দজ্ঞানে হয় সৃষ্টির উৎপত্তি। অরব রবের প্রতিধ্বনি ইনি করেন; ইনি শব্দময়ী, বেদরূপা। প্রাকৃত প্রকাশের সকল স্তর দিব্য শব্দ-ছন্দে ইনি অনুপ্রাণিত করেন। এঁর ছন্দ যেখানেই প্রতিফলিত, সেখানেই ফুটে উঠে সৃষ্টির অপূর্ব্ব কৌশল। অনমনীয় প্রকৃতিকে নমনীয় করে' ও তাকে ছন্দোবদ্ধ করে' সুন্দর সৃষ্টি করা এঁর স্বভাব। সৃষ্টির প্রত্যেক লহরীতে জেগে ওঠে ইঁহার অপূর্ব্ব সংসিদ্ধি, এঁর অভাবনীয় বিন্যাস।

সারস্বত ছন্দে অধিকৃত চিত্ত সৃষ্টিতে মগ্ন থাকে, এবং নবীন ঋকে নবীন সৃষ্টির উদ্বোধন করে। ইনি প্রাণের এমন শক্তি উদ্বোধিত করেন যে, প্রাণের প্রবণতা হয় সহজ সৃজনে। এঁর সৃষ্টিতে কোন ক্লেশ থাকে না, কোন মন্থর গতি থাকে না, কোন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ থাকে না, সমগ্র সৃষ্টিই যেন স্বতঃই স্ফূর্ত্ত হয় তার পূর্ণরূপ নিয়ে এক আন্তরপ্রেরণায়। ইনি

সুন্দর সৃষ্টির যা কিছু অন্তরায়, তা নিমেষে দূরীভূত করেন; প্রকৃতিকে উদ্বোধিত করে সৃজন-মহিমা প্রকাশ করেন। এঁর নিপুণতায় সৃষ্টির প্রত্যেক স্তর ও অঙ্গ অপূর্ব্বতায় স্ফূর্ত্তি হয়। কি বৃহৎ সৃজনে, কি ক্ষুদ্র সৃজনে সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয় এঁর শৃঙ্খলা-কৌশল। কোথাও এতটুকু চ্যুতি হয় না, এতটুকু ত্রুটি থাকে না। সৃষ্টির ছন্দে এর অবতরণ প্রাকৃত লোকে। সম্ভূতির বিগলিত তেজে প্রকৃতির রুক্ষতার বিনাশ এবং প্রকৃতির দিব্য সৃজনস্পন্দনে বিকাশ। এঁর স্পর্শে সৃজনস্পন্দন নেয়—নিশ্চিত গতি, অশেষ রূপ ও স্ফূর্ত্তি। প্রকৃতির ভিতর দিব্য-রূপ জাগিয়ে তোলা এঁর কাজ, কারণ দিব্য-সৃষ্টির শক্তিও ইনি। এই শক্তি প্রকৃতির অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল হলে পূর্ব্বের বীজ বিনাশ হয়—চেতনার সংস্পর্শে সৃষ্টির বীজ অপূর্ব্ব ছন্দে বিকশিত হয়—সমগ্র সৃষ্টিটি এঁর স্পর্শে হয় একটি বিরাট্ শিল্প, যা গরীয়ান্ হয়ে উঠে এক অপূর্ব্ব চারুকলায়। ইহার কিরণসম্পাতে সহস্র দল পদ্মের ন্যায় প্রকৃতি তার সৃজন-সম্ভার নিয়ে বিকশিত হয়। সম্ভূতির শক্তি এমনি যে, এঁর ছন্দে প্রকৃতি ছন্দোবদ্ধ হয়।

সম্ভূতির আর এক রূপ মহাকালী। প্রসারতা অপেক্ষা উচ্চতা, ধীরতা অপেক্ষা তীব্রতা, জ্ঞান অপেক্ষা শক্তি, স্থিতি অপেক্ষা গতি এঁর স্বাভাবিক বৃত্তি। বিরাট্ শক্তির প্রস্রবণ, এর সামনে কোন বাধা বিঘ্ন পুঞ্জীভূত হতে পারে না। পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা এর করুণাকটাক্ষে নিমেষে দূরীভূত হয়ে যায়। এর নৃত্যে বিশ্ব কেঁপে ওঠে, মহাব্যোমে ধ্বংসের কম্পন জাগে, অণু-পরমাণু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে সৃষ্টির সংহতি বদলিয়ে দেয়। সৃষ্টির ভিতর কোন বিরাট্ পরিবর্ত্তন ইনি সাধিত করেন—বহু যুগের সৃষ্টিকে ধ্বংস করে' এক নিমেষে নবীন সৃষ্টির উন্মেষ করেন। এঁর স্বভাব হচ্ছে অন্ধকার-তমসা ছিন্ন ভিন্ন করে প্রাণের শক্তি ও গতি সঞ্চার করা। কোন অভাবনীয় সংঘটন, কোন বিশ্ব-

চাঞ্চল্যকর ঘটনা, কোন আমূল পরিবর্ত্তন, এঁর শক্তিতে সম্ভব। এঁর পাদক্ষেপে চতুর্দ্দশ ভুবন কেঁপে ওঠে, এঁর বিরাট্ স্বরূপের সামনে বিশ্ব ত্রস্ত ভীত হয়ে ওঠে। এঁর বিচ্ছুরিত তেজ সকল কালিমা ধ্বংস করে, চিত্তগ্রন্থি বিদীর্ণ করে—সংসারাসক্তি এঁর সামনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। জীবের পশুত্ব বিলীন হয়। এঁর শক্তিতে জেগে ওঠে অন্তরে বিশ্ব-শক্তি, যা জীবনের উত্তাল তরঙ্গ অতিক্রম করে' ধাবিত হয় অনন্তের দিকে। এঁর আশ্রয়ে সকল সিদ্ধি করতলগত, কিন্তু এর গতি পরম সিদ্ধির দিকে। ইনি ভক্তের সকল মনোরথ পূর্ণ করেন। যাঁরা বীর-সাধক, বিরাট সিদ্ধির জন্য ধাবিত, তাঁরাই তাঁর প্রিয় ভক্ত। যেখানে পূর্ণ মূর্চ্ছনা জাগ্রত, সেখানে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠতম দাক্ষিণ্য প্রদান করেন। নির্ম্মম আঘাতে বিচ্ছিন্ন করেন মোহ ও স্নেহ-গ্রন্থি, সাধককে প্রতিষ্ঠা করেন শিবস্বরূপে। এঁর শক্তি অত্যুগ্র বলেই, কি সিদ্ধির সম্পদে, কি মুক্তির বৈভবে, ইনি হন নিশ্চিতরূপে ক্রিয়াশীল। এঁর তেজপুঞ্জ তৃতীয় আঁখি হতে নির্গত হয়—জ্ঞান ও করুণা-রশ্মি, যা ভক্তকে স্নিগ্ধতায় ও ঔজ্জ্বল্যে পরমকাম্য মুক্তির মহিমময় অববোধে প্রতিষ্ঠিত করে। হৃদয়ের ঘন অন্ধকারে এঁর উজ্জ্বল বিকাশ নিয়ে যায় মহাশান্তিতে। এঁর কঠোরতা পরম কৃপা, এঁর আঘাত পরম আনন্দ—অন্তরের গ্লানি, চিত্তের লাঘবতা ইনি এক নিমেষে দূরীভূত করেন, বিরাট্ অনুভূতির দ্বার উদ্ঘাটিত করেন। অমৃত ও অভয় এঁর পরম আশীর্ব্বাদ। মৃত্যুরূপা কালী মরণ-যজ্ঞের ভিতর দিয়ে দেন অনন্তজীবন! মৃত্যুর ভিতর আছে যে অমৃতের বীজ, তাই উদ্ঘাটিত হয় মৃত্যু-রূপা কালী-সাধকের কাছে। মরণ-যজ্ঞে এঁর অশেষ আনন্দ—মরণের ভিতর দিয়েই তো আসে মোক্ষের পরম গতি। মৃত্যুরূপা কালীই পরমাগতি, মৃত্যুরূপা হয়েও তিনি অমৃতের খনি। কি সিদ্ধিতে, কি সংহারে, কি মুক্তিতে ইনি অব্যর্থফলদায়িনী। এঁর এমনি সামর্থ্য যে, সকল সিদ্ধি, ভুক্তি, মুক্তি নিঃশেষে সম্পন্ন করতে পারেন।

মহাশক্তি মহালক্ষ্মী সঙ্গতি, সৌন্দর্য্য ও সুষমার আধার। ইনি শ্রীরূপা। সৃষ্টিতে যেখানেই সঙ্গতি ও সৌন্দর্য্য আছে, সেখানেই এঁর প্রতিষ্ঠা। কুৎসিতকে, অপবিত্রকে ইনি স্পর্শ করেন না। এঁরই শক্তিতে অসুন্দরের স্থানে শ্রী, অমঙ্গলের স্থানে মঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হয়—এঁর স্বভাবই সৃষ্টিকে রমণীয় ও বরণীয় করে তোলা, সৃষ্টির ছন্দে মনোহারিত্ব, সৌষ্ঠবত্ব আনয়ন করা। প্রকৃতি নমনীয় ও কমনীয় হয়ে সৃজন, স্পন্দন, শ্রী ও শোভাসম্পন্ন হয়। সৃষ্টির প্রাথমিক ছন্দের প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা এঁর নেই ; নিয়ন্ত্রিত প্রকৃতি এঁর ছন্দে সঙ্গতি ও সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হয়। প্রকৃতির লালিত্য, সৃজনের সুসামঞ্জস্য এঁরই ক্রিয়া। সংসিদ্ধির সহিত শ্রীর মিলন করেন ইনি। এঁর অভাবে সৃষ্টি দিব্য শোভা হতে হয় বঞ্চিত। সৃজন-শিল্পের অশেষ চমৎকারিত্ব থাকলেও, এঁর অভাবে সে চমৎকারিত্ব কখনও পেতে পারে না মনোহারিত্ব। ইনি ভরণীয় ভর্গকে করেন চিত্তাকর্ষক, জ্যোতিকে করেন স্নিগ্ধ। ঐশ্বর্য্যের ভিতর ইনি মাধুর্য্য বর্ষণ করেন,—মহিমা অপেক্ষা মধুরিমার ছন্দে ইনি পূর্ণ। মহিমা এঁর পূর্ণ হলেও, মধুরিমাতেই এঁর প্রকাশ। এঁর ছন্দে অন্তর-সত্তা আনন্দাবেগে স্ফূর্ত্ত হয়, তেজোছন্দে শ্রী বিকশিত হয়। হৃদয়-শতদল এঁর স্পর্শে অপরূপ রূপ-স্পন্দনে সঞ্চারিত হয়। ইনি মধু বর্ষণ করেন। প্রাণ, মন, অন্তর,—ভূলোক, দ্যুলোক এঁর জন্য হয় মধুময়। এঁর শক্তিসিঞ্চনে অন্তর বাহির হয় মধুময়—ইনি সমস্ত বিশ্বকে মধু ছন্দে উজ্জীবিত করেন।

ইনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রাণকে করেন উল্লাসপূর্ণ, অন্তরকে করেন আহ্লাদে অভিষিক্ত, সত্তাকে করেন প্রকাশে সুসঙ্গতিসম্পন্ন। এঁর স্পর্শে সত্তা স্ফূর্ত্ত হয় স্বভাবের ছন্দে, আনন্দের বৈচিত্র্যে, আহ্লাদের শান্ত উচ্ছ্বাসে। এঁতে কোথায়ও এতটুকু তীব্র শক্তি নেই—সর্ব্বত্রই যেন নিবিড় স্ফূর্ত্তি এক পরম শান্তির ভিতরে।

মহাশক্তির আর এক সম্ভূতি—ললিতা বা সুন্দরী। আকর্ষণ বিভবে ইনি মহিমান্বিতা। মহেশ্বরীর ন্যায় উদার, প্রশান্ত হয়েও ইনি সৌন্দর্য্যাকর্ষণে পূর্ণ। এঁর ছন্দ এমনি যে, যুগপৎ জ্ঞানের অসীমতায় এর নমনীয়তা, স্বচ্ছতা, মাধুর্য্য আকর্ষণ করে। প্রশান্ত মহিমময় স্থিতি এঁর স্বরূপ হলেও, শুদ্ধতার স্থানে এক বিশেষ প্রাণ-মুগ্ধকর আকর্ষণে ইনি পূর্ণ করেন। এঁর ছন্দ জ্ঞানে উদ্ভাসিত হলেও, হৃদয়ের শুদ্ধতা, প্রাণের সরসতা আনয়ন করে। প্রাণে ও হৃদয়ে আনন্দ সঞ্জীবিত করে' ইনি বিজ্ঞানালোকের মহিমময় প্রকাশ উদ্বোধিত করেন। প্রশান্তি এঁর শুধু স্বরূপ নয়, প্রশান্তির উদার স্থিতির সহিত হ্লাদিনী ছটার এক অপরূপ সমন্বয় এঁর আকর্ষণের কারণ। জ্ঞানের উদার বৃত্তি, তেজোময় উজ্জ্বল বিকাশ, আনন্দময় বর্ণসমাবেশ এবং বিজ্ঞান, প্রেম ও সৌন্দর্য্যের ইনি উদ্ভাসক। এই বিস্তায় অনন্ত রমণীয়তার ভিতর দিয়ে নিরাবরণতার বিকাশ। আবার নিরাবরণ প্রশান্তির ভিতর সুখময় ছন্দে, কল্যাণ ও সৌন্দর্য্য বিকাশ। একাধারেই ইনি শ্রী, কল্যাণ, মধুরিমা, বৈরাগ্য ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব সমন্বয়। অনন্ত উদার আকাশে সপ্তবর্ণ বিকাশের ন্যায় ইনি নির্ব্বিশেষ হলেও, সবিশেষ শক্তির পূর্ণ আধার। এ জন্যই এঁর সাধনায় বিজ্ঞান, শ্রী ও শক্তির সহিত নির্ব্বিশেষতারও বিকাশ।

* *
*

জীব ও ঈশ্বর

বেদান্তের ন্যায় তন্ত্র জীবের স্বরূপ, ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাদের সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা করেছে। বিষয়টা গভীর—শুধু বিজ্ঞানের দিকে নয়, সাধনার দিক দিয়েও। জীবতত্ত্বের স্বরূপ নিষ্পন্ন হলে তার সাধনা নিষ্পন্ন হয়। সাধনা তো স্বরূপেরই সন্ধান স্ফূর্তি। তত্ত্বাববোধের আরম্ভ স্বরূপের বাচনিক জ্ঞানে, তার স্ফূর্তি সাধনার পূর্ণতায়। যে জ্ঞান বুদ্ধিকে নিয়োজিত করে অনুশীলনে ও ধ্যানে, তারই পূর্ণতা সাধনার সিদ্ধিতে। বস্তুতঃ সাধনাপূত জ্ঞানের দিব্যালোকেই স্বরূপের আনন্দময় স্ফূর্তি।

জীবের স্বরূপ কি, এ প্রশ্নের উত্তর বেদান্ত ও তন্ত্র দিয়েছে; কিন্তু সেই স্বরূপ প্রজ্ঞালোকেই প্রতিষ্ঠিত। দু'টি প্রশ্ন এ সম্বন্ধে স্বাভাবিক, জীবত্বটি কি এবং তার পরম বিকাশ কি? সাধারণতঃ দেখলে দেখা যায়, জীবত্ব বলে যা বলি, তা কতকগুলি ভাব, ক্রিয়া, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং এর ভিতর দিয়ে যা প্রকাশিত হয় বা এগুলি যাতে ধৃত বা অবলম্বিত হয়ে থাকে, তারই সাধারণ সংজ্ঞা জীবত্ব। এ কেন্দ্রীভূত চেতনা, কেন্দ্রের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কেন্দ্রের ভিতর দিয়ে এ চেতনা প্রকাশিত—নানা ভাব, ক্রিয়া ও বিজ্ঞান-সম্পদে। এরূপ অনন্ত কেন্দ্রকে অবলম্বন করে' যে বিরাট্ চেতনা প্রকাশিত—তাকে বলা হয় ঈশ্বর। স্বতন্ত্র কিরণজালে সূর্য্য যেমন দীপ্তিময়, ঈশ্বরচেতনা তেমনি অনন্ত কেন্দ্রের ভিতর দিয়ে প্রকাশময়। তাই তিনি জ্ঞান-সবিতা। জীব তার জ্ঞান-রশ্মি। এই জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও সম্বন্ধ নিয়ে বেদান্তে ও তন্ত্রে অনেক কথার অবতারণা হয়েছে। সাধারণতঃ বেদান্তের ন্যায় তন্ত্রেও বিম্বপ্রতিবিম্ববাদ গৃহীত হয়েছে। একই পরম তত্ত্ব, যাকে শিব বা ব্রহ্ম বলি, তাই সৃজনোন্মুখ অবস্থায় বিম্বত্ব প্রাপ্ত হয়। এই বিম্বই ঈশ্বর। বিম্ব শব্দে কেন্দ্রগত ভাব বোঝায়। এই

অবস্থায় চেতনার কেবল সঙ্কোচ আরম্ভ। সঙ্কুচিত হয়নি, অথচ সঙ্কুচিতের ন্যায় দেখায়। এই বিশ্ব-চেতনা প্রাথমিক প্রকাশ। এই বিশ্ব-চেতনাকে অবলম্বন করেই বিচিত্র প্রকাশ। আমরা পূর্ব্বেই দেখেছি, সদাশিবতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, সদাবিদ্যাতত্ত্ব কিরূপে এই প্রাথমিক বিশ্ব-চেতনা হতে প্রকাশিত হন। যতই প্রকাশ কেন্দ্রীভূত হয়, ততই চেতনা হয় ঘনীভূত। চেতনা ঘনীভূত হলেও, তার প্রসারতার লোপ হয় না, ঘনীভূত হয়েও থাকে তার অনন্ত প্রসারতা। এই প্রসারতা যখন অবাধিত তখনই চেতনার ঈশ্বরত্ব। ঈশ্বরে চেতনার প্রসার কখনও সঙ্কুচিত হয় না। সূর্য্য কেন্দ্রীভূত হলেও, সমগ্র বিশ্বে যেমনি তার আলোর প্রসার অক্ষুণ্ণ, চেতনাও তেমনি ঈশ্বর বা সদাশিবতত্ত্বে সঙ্কুচিত হলেও, তার চিতিশক্তির প্রসার থাকে অটুট। চিতিশক্তির প্রসার ও সঙ্কোচ সহজ—সঙ্কুচিত হয়েও প্রসারিত হতে পারে, প্রসারিত হয়েও সঙ্কুচিত হতে পারে। সঙ্কোচ বা প্রসার তার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। একে অবলম্বন করে সৃজনে এর ক্রিয়া। এ সম্বন্ধে তন্ত্রের মত সুস্পষ্ট। কেন্দ্রীভূত হয়েও চেতনা বিস্তৃত, প্রসারিত হয়েও কেন্দ্রীভূত। ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব এই—তাঁর স্বরূপ মানসিক নিয়মে (mental limitation) বদ্ধ নয়; মন সঙ্কোচ ও বিকাশের সমন্বয় করতে পারে না, কারণ বিকাশ ও সঙ্কোচ পরস্পরবিরোধী।

এই পরস্পরবিরোধী ভাবের স্থান তন্ত্রে নাই। তন্ত্র শক্তিবাদী এবং শক্তিস্বরূপে সঙ্কোচ ও বিকাশ স্বাভাবিক। এরা স্বরূপভূত ধর্ম্ম। এই-জন্যই তন্ত্রে সঙ্কোচ-বিকাশ নিয়ে কোন বিরুদ্ধ ন্যায়ের সৃষ্টি হয় নি। চিতিশক্তির প্রসারের তারতম্যতা নির্ণয় করে প্রত্যেক কেন্দ্রীভূত চেতনার স্বরূপ। যেখানে সঙ্কোচ অপেক্ষা প্রসার অধিকতর এবং যেখানে সে প্রসার ব্যাপকতম, সেখানেই ঈশ্বরত্ব। সদাশিবতত্ত্বে সঙ্কোচ অত্যন্ত অল্প, প্রাথমিক চেতনায় কেন্দ্র-স্ফূর্ত্তি, কিন্তু এর প্রসার অচিন্ত্যনীয়।

এই জন্য এ তত্ত্ব অতি ঊর্দ্ধে। ক্রমশঃ এই প্রসার অল্পতর হতে থাকে, এবং সঙ্কোচ হয় অধিকতর; প্রসারিত চেতনায় সঙ্কোচ অত্যল্প। সঙ্কুচিত চেতনার প্রসার থাকলেও, তা প্রায় থাকে অস্ফুট।* যেখানে চেতনায় সঙ্কোচ প্রসার অপেক্ষা অধিক, সেখানে ঈশ্বরত্বের স্থানে জীবত্ব স্থাপিত হয়। জীব-চেতনা স্বভাবতঃ সঙ্কুচিত—তার প্রসারশক্তি ক্ষীণ। ক্ষীণ হলেও তার অনন্ত প্রসারের সম্ভাবনা আছে।

চিতিশক্তির প্রসার ও সঙ্কোচ নিয়ে সৃষ্টির পর্য্যায়ে সকল বস্তুর স্বরূপ নির্ণীত হয়েছে—যেখানে প্রসার অধিকতর, সেখানেই উচ্চতর জীবত্ব। জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব তন্ত্রে কিন্তু বিরোধী পদার্থ নয়—ঈশ্বর চিতিশক্তির সঙ্কোচে হয়েছে জীব, চিতিশক্তির সম্প্রসারণে জীব ঈশ্বরবৎ মহিমাযুক্ত হন। জীবত্বের এই সম্প্রসারণ তন্ত্রমতকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এ বিষয়ে বৈষ্ণব-বেদান্ত তন্ত্র হতে ভিন্ন মতাবলম্বী।

বৈষ্ণব-বেদান্তে জীবের স্বরূপ অণু, ঈশ্বর-কৃপার স্পর্শ পেলে ঈশ্বর শক্তিতে জীবের একটা সাময়িক বিভুত্বের বিকাশ হতে পারে; কিন্তু এই বিভুত্ব নিত্য নয়, ঐশী শক্তির সংস্পর্শে এরূপ সম্প্রসারতা মাত্র ক্ষণকালের জন্য। যেখানে জীবের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ কিঞ্চিন্মাত্রও ভেদ থাকে, সেখানে স্বরূপস্ফূর্ত্তিতে অভিন্নতা নিত্য হতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরীয় শক্তির অভাবে জীব ঈশ্বরবৎ আচরণ করতে পারে—ইহাই বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত। জীবত্ব অণু বলেই তার সম্প্রসারতা স্বাভাবিক বা নিত্য নয়। ঈশ্বরশক্তির আবেশে সম্প্রসারতা হয়, আবেশ তিরোহিত হলে সম্প্রসারতা বিদূরিত হয়। আবেশ নিত্য হলে বিভুত্বের সঞ্চারও হয় নিত্য।

---

* জীব এব খলু প্রবৃত্তি কর্ত্তা নিবৃত্তিঙ্গীকুর্ব্বন শিব ইত্যুচ্যতে। শিব বা প্রবৃত্তপদে জীবশব্দেন ব্যবহৃতঃ। পুনর্নিবৃত্তিপদে শিবশব্দ ব্যবহারং প্রাপ্নোতি। ন তু জীবশিবয়োঃ পারমার্থিক ভেদঃ, অপিতু দশাভেদেনৈস ভেদ ইত্যেকার্থতা। মাতৃকাচক্র-বিবেক পৃঃ ২৮।

তন্ত্রমতে জীবত্বের ভিতরে আছে ঈশ্বরত্বের বীজ। জীবত্বই সঙ্কুচিত ঈশ্বরত্ব। এই জন্য জীবত্বের স্বাভাবিক সম্প্রসারণ ঈশ্বরে। জীব ও ঈশ্বরে ঐকান্তিক ভিন্নতা নাই। তন্ত্র সত্তার অভিন্নতা স্বীকার করে, এজন্য সত্তায় শক্তির সঙ্কোচ ও সম্প্রসারণ হেতু জীবত্বে ও ঈশ্বরত্বের ভেদ। সত্তার সহিত যখন শক্তি হয় প্রসারিত, তখন জীবত্বের সঙ্কোচ বিনষ্ট হয়—জীব ও ঈশ্বরে কোন ভেদ থাকে না—অন্যভাবে বললে বলা যেতে পারে, জীবত্বের সংস্কার হতে এই অভিন্নতা দেয় মুক্তি এবং প্রতিষ্ঠা করে ঈশ্বরত্ব বা ব্রহ্মত্ব। শক্তি-অভিমুখী হলে হয় ঈশ্বরত্ব, শিব-অভিমুখী হ'লে হয় ব্রহ্মত্ব। তন্ত্র এরূপে জীব ও ঈশ্বরের অভিন্নতা প্রতিপাদন করেছে।

তন্ত্রে জীবের সহিত ঈশ্বরের অভিন্নতা দুইরূপে প্রতিপন্ন হয়; এক শক্তির দিক দিয়ে, আর এক সত্তার দিক দিয়ে।

শক্তির ভিন্নতা সত্তার সম্প্রসারণের উপর নির্ভর করে। সত্তার সম্প্রসারণে শক্তির অনুপ্রবেশ এবং ঈশ্বরের শক্তির সহিত তাদাত্ম্যতা। সত্তার সঙ্কোচ অতিক্রমে জীবের শক্তিও হয় ব্যাপক ও নিরঙ্কুশ; কোথাও সঙ্কল্প প্রতিহত হয় না। ঈশ্বরত্ব—অব্যর্থ-সঙ্কল্পত্ব। এ ভূমিকায় ক্রমশঃ ঈশ্বরত্ব স্ফুরিত হয়। আধারের জন্য উপাধিগত সসীমতা থাকলেও, সত্তার স্ফুরণ হয় নানারূপ ঐশ্বর্য্যের বিভবে।

কিন্তু এ অবস্থারও অতিক্রম হয় যখন শক্তির অভিন্নতা অতিক্রান্ত হয় সত্তার অভিন্নতায়। শক্তি এখানে বিলীন হয় শিবস্বরূপে। শৈবদর্শনের ভাষায় বলতে হয় সিদ্ধের প্রত্যভিজ্ঞান হয়। পূর্ব্ব স্মৃতির সঙ্কোচের জন্য শিবত্বের যে জীবরূপে অবভাস হয়েছিল, তার বিলীন হয়ে পূর্ণ প্রত্যভিজ্ঞা জাগ্রত হয়; জীব নিজের স্বরূপ অনুভব করে। প্রত্যভিজ্ঞায় পূর্ব্বের বিস্মৃতির বিলয়। চেতনা এখানে সঙ্কোচ ও

প্রসারের অতীত—শান্ত শিবরূপ, অদ্বৈত রূপ। এ মতকে পরাদ্বৈত-বাদরূপে অভিহিত করা হয়। বস্তুতঃ, পূর্ণ শিবরূপ অনুভূতিতে সমগ্র সত্তার অনুভূতি, যাতে কোন ভেদ থাকে না—ভেদ অভেদে অঙ্গীকৃত হয়। চেতনার পরিসরতার সহিত শক্তি, শিব ও জীব তিনই একীভূত হয়ে হয় অনুভূতি। কারণতত্ত্বে এর কোন ভেদ নাই; প্রসারিত চেতনায় ভেদ থাকে না। ভিন্ন হয়েও অভিন্নতা থাকে অটুটরূপে। শক্তিতত্ত্বে অভিন্নতা ভেদকে অঙ্গীকৃত করে নেয়—শুধু শক্তির উন্মেষে ও নিমেষে অনুভূতি নেয় ভিন্নরূপতা। প্রকাশের ভিন্নতা হলেও, তত্ত্বে কোন ভেদ হয় না, কারণ তত্ত্ব তো শিব-শক্তি এবং শিব ও শক্তি একই তত্ত্ব।

এ বিষয়ে অদ্বৈত বেদান্তসিদ্ধান্ত হতে শৈব সিদ্ধান্তের ভেদ আছে। "আমি ব্রহ্ম" এরূপ অনুভূতিতে বেদান্তমতে প্রত্যভিজ্ঞারূপ ক্রিয়া প্রাথমিক অবস্থায় থাকলেও, পূর্ণ অববোধে থাকে না; কারণ, প্রত্যভিজ্ঞা ব্রহ্ম ও জীবের অভিন্নতাজ্ঞাপক হলেও, জীবের মুক্তির স্বরূপাবস্থার পূর্ব্বেই নিষ্পন্ন হয়। মুক্তিতে কোন প্রত্যভিজ্ঞা থাকতে পারে না—তখন কোন স্মৃতিই থাকে না। শৈব সিদ্ধান্তে জ্ঞান-শক্তি নিত্য বলেই এরূপ ক্রিয়া সম্ভব। এরূপ ক্রিয়াই অভিন্নতা সম্পাদন করে। অদ্বৈত মতে এরূপ (অখণ্ডবৃত্তি—আমি ব্রহ্ম) প্রত্যভিজ্ঞা উৎপন্ন হয়ে অবিদ্যা ধ্বংস করে, নিজেও নাশ প্রাপ্ত হয়—অতএব স্বরূপ ভাণের স্থলে এরূপ ক্রিয়ার কোন সার্থকতা নেই।

অনুভূতির স্বরূপ নিয়ে মতভেদ আছেঃ অদ্বৈত বেদান্তে অনুভূতি অনুভূত হয় না; অনুভূতি স্মৃতি-বাঞ্ছিত হয় না। অনুভূতি স্বরূপে নিত্য নিষ্পন্ন, এতে কোন ক্রিয়া থাকতে পারে না। চরম জ্ঞানে স্মৃতি বা অনুভব ক্রিয়া থাকতে পারে না; জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, স্বয়ম্প্রভ। সকল ক্রিয়ার অতীত হয়ে এ স্ফূর্ত্তি স্বরূপ। জ্ঞানের এই অতীন্দ্রিয়তা শৈব-

সিদ্ধান্তে স্বীকৃত হলেও, জ্ঞান স্বয়ম্প্রভ হলেও, তার অনন্ত স্বরূপে স্ফূর্তির ভাণ নিয়তই হয়—এই স্ফূর্তি নিত্য। এই নিত্য স্ফূর্তি জ্ঞানের আছে বলেই জ্ঞান নিরুপাধিক হয়েও সোপাধিক—এই উপাধি আগন্তুক নয়, নিত্য। এই সোপাধিকতার বিশ্রান্তি জ্ঞানের পূর্ণ অন্তর্মুখীনতায় হলেও, জ্ঞানের স্বরূপভূত ক্রিয়ার বিশ্রান্তি কোথায়? এই জন্যই অনুভূতির পূর্ণতায়, প্রত্যভিজ্ঞায় স্মৃতিযুক্ত জ্ঞানের উন্মেষ হতে থাকে। এ স্মৃতি জ্ঞানের উজ্জ্বল প্রবাহ, এ স্মৃতি জ্ঞানস্বরূপ—অনুভূতির পূর্ণতায় জ্ঞানই স্বরূপে প্রতিভাত হয়, তার ভিতর সম্বন্ধজ্ঞান কিছু থাকে না। কেননা, তত্ত্ব এক অদ্বৈত, জীবের বৃত্তি বা 'আমি বৃত্তি' অনুভূতির প্রথম ভূমিকায় (আমি ব্রহ্ম এরূপ জ্ঞানে) অভিন্নভাবে থাকলেও, উর্দ্ধভূমিতে এই বৃত্তি লয় হয়। শক্ত্যদ্বৈততা ক্রমশঃ সত্তাদ্বৈততা প্রতিষ্ঠা করে। এদের মধ্যে শক্তির অভিন্নতার তারতম্য হয়, জ্ঞানের অভিন্নতা তো নিত্য সিদ্ধ।

সদ্বিদ্যার স্তরে 'আমি বৃত্তি' ব্যাপক জ্ঞানের বৃত্তি হয়ে থাকে; কারণ, এ অবস্থায় সকল জ্ঞানের হয় সমন্বয়। প্রকৃতির উর্দ্ধে স্থিতিলাভ করবার জন্য এখানে শুদ্ধ অহংএর স্ফুরণ, যে অহং সত্যিকার চেতনা, যা প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত নয়। 'জীব আমি' এই 'শুদ্ধ-আমি'র সূত্র লাভ করলেই অনুভূতির পথ খুলে যায়। প্রকৃতির অতীত অনুভূতির স্তরগুলির কথা ইতোপূর্ব্বেই বলা হয়েছে। সদ্বিদ্যার স্তর প্রকৃতি লয়ের অতীত স্তর। জীবত্ব লীন হলে এখানে উপনীত হওয়া যায়। জীবত্ব লীন অর্থে সঙ্কুচিত চেতনার স্থানে ব্যাপক চেতনার প্রকাশ। বস্তুতঃ, শৈব-সিদ্ধান্তে জীবত্ব চেতনার সঙ্কোচ প্রকৃতির অবলম্বনে। এই সঙ্কোচ নিরাকৃত হলেই চেতনার নিজ স্বরূপ স্বতঃই প্রকাশিত হয়। এখানে আর জীবত্ব থাকতে পারে না; উপাধি অপসরণে চেতনার সম্প্রসারিত স্বরূপের উন্মেষ।

শৈব-সিদ্ধান্তে চেতনার অণুত্ব ও ব্যাপকত্ব স্বীকৃত হয়; অদ্বৈতবেদান্তে অণু ও ব্যাপকত্ব উপহিত, নিত্য নয়। স্বরূপ চেতনা অণুও নয়, ব্যাপকও নয়।

শৈবমতে চেতনার অণুত্ব ও ব্যাপকত্ব সম্ভব চিতিশক্তির দ্বারা। চিৎ-শক্তির সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন হতে পারে। প্রথমটি দেয় বিভুত্ব, দ্বিতীয়টি দেয় অণুত্ব। চিতিশক্তি সঙ্কুচিত হয় বলেই চেতনার অণুত্ব। কিন্তু এ অণুত্বে সম্প্রসারণের সম্ভাবনা বর্ত্তমান বলেই চেতনা বিভুও। চেতনার ব্যক্তিত্ব প্রকৃতির সংসর্গে হয়। প্রকৃতির অতীত স্তরে একই চেতনা প্রকাশ পায়—ব্যক্তি ও সমষ্টির কথা থাকে না। প্রকৃতি-উন্মুক্ত চেতনা—শিবচেতনা। প্রকৃতির উর্দ্ধে চেতনার প্রকাশের ক্রম হচ্ছে সদ্বিদ্যা, ঈশ্বর, সদাশিব, শিবশক্তি। সদ্বিদ্যার অনুভূতি সুসম্পন্ন আধার মন্ত্ররূপে অভিহিত। ঈশ্বরানুভূতিতে যিনি সুসম্পন্ন তিনি মহেশ; সদাশিবতত্ত্বে যিনি প্রতিষ্ঠিত তিনি মন্ত্র-মহেশ; শিব-শক্তিতত্ত্বে যিনি কুশল তিনি শিব। মালিনীবিজয়োত্তরে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। সাধনায় যিনি আরূঢ় অথচ সম্পূর্ণ নির্ম্মল হন নি, তিনি বিজ্ঞান-কলা। বিজ্ঞান-কলা সদ্বিদ্যা-সম্পন্ন হতে পারেন নি। বিজ্ঞান-কলার নিম্নে স্থান প্রলয়-কলার। প্রলয়-কলা কর্ম্ম ও মলবিশিষ্ট। জীব মাত্রই সকল। বিজ্ঞান-কলা, প্রলয়-কলা এবং সকল—এরা জীবের শ্রেণীবিশেষ। বিজ্ঞান-কলা উর্দ্ধজ্যোতিঃসম্পন্ন হলেও, পূর্ণরূপে মলশূন্য নন। বিজ্ঞান-কলায় বুদ্ধিগত অজ্ঞানের বিলয় হলেও, আণবমল বিলয় হয় নি। বিবেক (discrimination) প্রকৃতি হতে চেতনার পৃথকত্ব নিষ্পন্ন করে, কিন্তু প্রাথমিক আণবমল (যা' জীবত্বের ও ব্যক্তিত্বের মূলীভূত কারণ) অপগত না হলে, পূর্ণরূপে প্রকৃতির অতীত হওয়া যায় না। বিবেক বিশুদ্ধ বিজ্ঞানসম্পন্ন করলেও, মূল অবিদ্যা অপহৃত না হলে সত্তার পূর্ণ বিশুদ্ধি হয় না এবং যে অবিদ্যাজনিত সত্তা

সঙ্কুচিত হয়ে প্রকৃতির সংস্পৃষ্ট হয়েছে, তা হতে নিষ্কৃতি হয় না। অর্থাৎ বুদ্ধিগত মল নষ্ট হলেও, সঙ্কুচিত সত্তা প্রসারের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। যে অবিদ্যা বা আণবমল তার জীবত্বের কারণ, তাহা তখনও দূরীভূত হয় নি। এই অবিদ্যা দূরীভূত হলেই জীবত্বের অবসান হয় এবং চেতনা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান-কলা মায়ীয় মল ও কর্ম্মীয় মলশূন্য।

* *
*

মানস ও অতিমানস জ্ঞান

তন্ত্রের দুরূহ তত্ত্বে প্রবেশ করতে হলে জ্ঞানের স্বরূপ ও স্তরগুলিকে সুন্দররূপে বুঝতে হবে। ভারতীয় দর্শনের একটি বৈশিষ্ট্য আছে—যা অনেক সময় স্পষ্ট নয়। সেই বৈশিষ্ট্য এই যে, ভারতীয় দর্শনের চিন্তাধারা শুধু বিষয়ের বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করে নি। এ শুধু মানস-প্রসূত নয়। পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞান বিশেষ সমীক্ষা বিশ্লেষণের প্রধান অবলম্বন। মানুষের অভিজ্ঞতা, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বরাজি এবং মানস চিন্তাস্ব পতাকে পাশ্চাত্য দর্শন প্রধানতঃ রূপ দিয়েছে। যেখানেই দর্শনে অতিমানস স্থান পেয়েছে, সেখানে অতিমানসপ্রসূত প্রজ্ঞার ওপর সেরূপ নির্ভর করে নি; কারণ দর্শন বলতে এক প্রণালীবদ্ধ জ্ঞানকেই বোঝা হয়েছে। প্রণালীবদ্ধ বোধের অতীত বোধির কথার উল্লেখ থাকলেও, তার ওপর ভিত্তি করে দর্শন রচনা অল্পই হয়েছে। ভারতীয় চিন্তাধারা প্রণালীবদ্ধ হলেও, তার প্রকৃত ভিত্তি হচ্ছে অতীন্দ্রিয় অনুভব। দর্শন শুধু তত্ত্ব-ভাবনা নয় বা তথ্যের সুদৃঢ় ভিত্তির রচনা নয়। দর্শন তত্ত্ববোধ—তত্ত্ব-দর্শন। এ কথার গভীরতা বুদ্ধির সাহায্যে বুঝতে পারি না, কারণ বুদ্ধি (intellect) সাধারণতঃ অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিষয়ের পর্য্যালোচনা করে; এর ঊর্দ্ধে তার গতি নাই। এইজন্যই মানস ঊর্দ্ধ স্তরের কথা বেশ পরিষ্কার হয় নি; অতিমানসে অধিরূঢ় না হয়ে মানস কল্পনায় তার স্বরূপ অধিগম করা হয়েছে। এ বিষয়ে ভারতীয় দর্শনের কথা অতি সুস্পষ্ট যদিও অতিমানস অনুভূতি সম্বন্ধে একই রকম সিদ্ধান্ত করা হয় নি। মানস অতীত অনুভূতির প্রকার বিভিন্ন।

মানস জ্ঞান সম্বন্ধবিশিষ্ট পরোক্ষ জ্ঞান। অতিমানস জ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞান। ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানও অপরোক্ষ। কিন্তু এ অপরোক্ষ জ্ঞান বেদনা-গ্রাহ্য, বিষয়ের অববোধক। এ জ্ঞান তত্ত্বের নির্ণায়ক নয়। শুধু বেদনা

সঞ্চার করে ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে। এরূপ জ্ঞানের স্বরূপ নিয়ে মত-পার্থক্য থাকলেও, এ কথা নিঃসন্দেহ যে, এরূপ জ্ঞান কখনও তত্ত্বের সংবেদনা জাগায় না, তার সে অধিকার নাই। মানস জ্ঞান এরূপ জ্ঞানের উপরে; বাহিরের সংবেদনারাজিকে সংপুট করা এর কাজ। মন বা বুদ্ধি সংবেদনাকে গ্রহণ করে, তদনুযায়ী সঙ্কল্প-বিকল্প করে। আরও সূক্ষ্ম ভাবে দেখলে মনে হবে, মনের নিজের এমনি সূক্ষ্ম ধর্ম্ম আছে, তাতে সে সংবেদনার একটা পরিকল্পনা সৃষ্টি করে' এক মনোরম বিশ্বের রচনা করে। এটা ঠিক সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন নয়, এ মনে প্রবৃত্তির সঞ্চার বা ভাব-স্পন্দন হয় না। এ মনে জ্ঞানের ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। এ মন ঊর্দ্ধ মন—(intellect)। এ মনের বিশ্লেষণ পাশ্চাত্য দার্শনিক ক্যাণ্ট অতি সুন্দর ও বিশদ্রূপে করেছেন। এর স্বভাবগত কতকগুলি ধর্ম্ম আছে, যারা পরস্পর একত্রিত হয়ে একই জ্ঞানসূত্রে গাঁথা আছে। এ জ্ঞানসূত্রটি 'আমি বোধ', কিন্তু 'আমি বস্তু' নয়। আমার ভিতর একটা 'আমি-বোধ' স্বভাবসিদ্ধ, এই বোধকে অবলম্বন করে বেদনা যারা একটি পুষ্পস্তবকের ন্যায় সজ্জিত হয়ে ওঠে। মনের বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম আছে, যারা ক্রিয়াশীল হয় বেদনার সঞ্চারে কিন্তু সকল স্তরের ক্রিয়া ও প্রণালীর পশ্চাতে আছে 'আমি-বোধ'। এই হচ্ছে জ্ঞান-সৌধের মূল ভিত্তি।

কিন্তু এই 'আমি' প্রতিভাসিক আমি, তাত্ত্বিক বা পারমার্থিক 'আমি' নয়। এর জ্ঞান অপরোক্ষ, এ মানস প্রত্যক্ষবেদ্য। এ অপরোক্ষতা মানস অপরোক্ষতা (epistemological intuition)। এই 'আমি' সত্যিকার বুদ্ধি উপহিত চেতনা, স্বরূপ চেতনা নয়। স্বরূপ চেতনা এর ঊর্দ্ধে স্থিত। এ স্বরূপ চেতনা সাক্ষী চেতনা—উপহিত হয়েও উদাসীন নিষ্ক্রিয়—কিন্তু ক্যাণ্টের "আমি" (synthetic unity of apperception) বুদ্ধি উপহিত হয়েও কার্য্যকারী। বুদ্ধি উপহিত হলেও চেতনার

স্বয়ংপ্রভা অটুট থাকে, যদিও উপহিত চেতনা স্বরূপ-চেতনা হতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন হয়। একটি পারমার্থিক আর একটি প্রাতিভাসিক (empirical); কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এই প্রাতিভাসিক চেতনার একটি সত্তা আছে, যা বেদনাপুঞ্জ বা জ্ঞানের প্রকার (thought form) হতে পৃথক এবং যা জ্ঞানে স্বতঃই উদ্ভাসিত। শাঙ্কর বেদান্ত এই বুদ্ধি-উপহিত চেতনাকে সাক্ষী বলেছেন। এই বুদ্ধি-উপহিত চেতনা উদাসীন চেতনা, উপহিত বলেই এর আশ্রয়ে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হলেও, একে ক্রিয়াশীল বলা যায় না। এই ক্রিয়াশীলতার অভাবের জন্যই এ চেতনা আমাদের প্রাতিভাসিক চেতনা, ব্যবহারিক কার্য্যকরী চেতনা হতে পৃথক হয়েছে। সাক্ষী-চেতনা বুদ্ধি হ'তে পৃথক—উপহিত হলেও বুদ্ধির সহিত এর কোন সংমিশ্রণ বা সম্বন্ধ হয়নি। এ সাক্ষী-চেতনা বস্তুতঃ ব্রহ্ম-চেতনা, বুদ্ধিতে উপহিত হলেও এ নির্ব্বিকার। ব্রহ্মধিগমের সূত্র এখানেই পাওয়া যায়,—এ চেতনার কেবল স্বরূপের পরিচয় দেয়। চেতনার কৈবল্য ব্রহ্মরূপতা। তা'হলে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হচ্ছে যে, আমাদের মানস জ্ঞানের অতীত জ্ঞান আছে—যে জ্ঞান মন ও বুদ্ধির (intellect) বিষয়ের বাহিরে, কিন্তু যাকে অবলম্বন করে মানসবুদ্ধির বিকাশ। এই জ্ঞান অপরোক্ষ সম্বিদ্, এ জ্ঞান নিত্য, এর অন্ত নাই, উদয় নাই, স্বয়ংপ্রভ। সাংখ্যদর্শনেও দেখতে পাই, বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চিৎ বুদ্ধি হতে ভিন্ন—ইনি অসম্বদ্ধ পুরুষ, বুদ্ধি হতে অতিরিক্ত, প্রকৃতি হতে ভিন্ন—নিষ্ক্রিয় নিত্য। অন্তকরণে প্রতিফলিত আলোকরশ্মিতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মে অনুপ্রবেশ করলে এরূপ জ্ঞানের পরিচিয় মিলে।

অতিমানস জ্ঞানের মন উর্দ্ধ ভূমিকায় বিকাশ। শৈবদর্শনে জ্ঞান নিষ্ক্রিয় হয়েও সক্রিয়, স্থির হয়েও গতিশীল—এজন্য জ্ঞানের সকল স্তরে ক্রিয়া সুস্পষ্ট। মানস জ্ঞানে এই ক্রিয়া মনকে অবলম্বন করে' প্রকাশিত হয়—এই জন্য একে মানস-সম্বিদ্ বলা যেতে পারে; কিন্তু মনকে

অতিক্রম করেও এই সম্বিদের প্রকাশ আছে। মন ও প্রকৃতির উর্দ্ধে এর প্রকাশ মনোধর্ম্ম দ্বারা নিয়মিত বা সংস্পৃষ্ট হয় না। মনের ক্রিয়ার বা বুদ্ধির ক্রিয়ার অতীত এই জ্ঞান। কিন্তু অপরোক্ষ সম্বিদ এমনি উজ্জ্বল যে, মনের ও বুদ্ধির ওপর এর সুস্পষ্ট প্রকাশ সম্ভব। এরই সাহচার্য্যে মন ও বুদ্ধির সূক্ষ্মতা ও দীপ্তি এবং বিস্তৃত জগতের বিকাশ—দূরদর্শনের, দূরশ্রবণের সহজেই সংসাধন হয়। শুধু তাই নয়, এর সংস্পর্শে বুদ্ধির সূক্ষ্ম ক্রিয়ার বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের (conceptual intuition) অনুভব। বস্তুতঃ, ইন্দ্রিয় ও মনের সূক্ষ্ম ক্রিয়া আছে—চিতি সত্ত্বের দীপ্তিতে যার প্রকাশ। চিতি-শক্তির সাহচর্য্যে ও সত্ত্বের দীপ্তিতে সূক্ষ্ম জগৎ (ঐন্দ্রিয়িক ও মানসিক) প্রকাশিত—এমন কি প্রাণের ও বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম জগৎও প্রকাশিত হয়। এ সব জ্ঞানমাত্রই অপরোক্ষ; এরূপ অনুভবকে মানস অনুভব বলতে হবে; কারণ, মানস বা বুদ্ধি স্তরকে এ অতিক্রম করে না—শুধু এদের সূক্ষ্ম ক্রিয়া ও সূক্ষ্ম স্পন্দনপুঞ্জের প্রকাশ করে।

পতঞ্জলিতে বিবেকজ জ্ঞানের কথা আছে। এ জ্ঞান শুদ্ধবুদ্ধিপ্রসূত। এ যোগজ জ্ঞান। বিবেকজ জ্ঞান স্বপ্রতিভোৎপন্ন—কিছুর অপেক্ষা করে না; সর্ব্ববিষয়ের অবভাসক, এর অবিষয়ীভূত কিছু নেই। বিবেকজ জ্ঞানের স্ফুরণে জ্ঞান, কালের বা দেশের ব্যবধান থাকে না। সাধারণতঃ জ্ঞান দেশ ও কালের দ্বারা সঙ্কীর্ণ। দেশ ও কালের ব্যবধানজনিত জ্ঞানের সীমাবদ্ধ ভাবের লোপ হয় বিবেকজ জ্ঞানের সিদ্ধিতে। চিত্তসত্ত্ব এমনি শুদ্ধ হয় যে, সে যেন বিশ্বের অন্তর ও বাহিরের প্রতিভাসক (reflector) হয়। তার অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান কাল-বিষয়ের জ্ঞান হয়—শুধু সামান্যরূপে নয়, বিশেষরূপেও। পরস্পর সূক্ষ্মভেদ বা ধর্ম্মসকল তার নিকট প্রতীত হয়। দেশ-ব্যবধান ও কাল-ব্যবধান না থাকাতে, এ জ্ঞানের স্বরূপ মানস জ্ঞান হতে ভিন্ন। এরূপ জ্ঞান সর্ব্ব অবভাসক—শুধু মনের ক্রিয়া নয়, প্রকৃতির সকল পরিণামের।

এরূপ অবস্থায় সর্ব্বজ্ঞত্বরূপ ধর্ম্ম যোগী লাভ করেন। প্রকৃতির অভ্যন্তরে এমন কিছু থাকে না, যা' এই জ্ঞানে প্রতিভাত হয় না। ব্যাসভাষ্যে বলা হয়েছে, এরূপ জ্ঞান পরিপূর্ণ—এর অংশ প্রজ্ঞালোক—মধুমতী বা ঋতম্ভর অবস্থা হতে সপ্ত প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা পর্য্যন্ত অবস্থিত।

তা'হলে বেশ প্রতীত হচ্ছে যে; সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের, সূক্ষ্ম মানস জ্ঞানের অপরোক্ষত্ব থাকলেও, তাদের অক্রমত্ব ও কালহীনত্ব নাই—কালের পারম্পর্য্যাতীত তারা নয়। এই জন্য এরূপ জ্ঞানের অতীত এই বিবেকজ জ্ঞান কাল-ধর্ম্মের দ্বারা আচ্ছাদিত বা আক্রান্ত নয়। কালের অতীত বলেই বিবেকজ জ্ঞানে সব কিছুরই প্রতিভাস হয় একই মুহূর্ত্তে; এই জন্যই একে সর্ব্বাবভাসক বলা হয়। এরূপ জ্ঞান সাধারণ নয়। অসাধারণ বলেই কিন্তু এর অলীকত্ব প্রতিপন্ন হয় না। জ্ঞান যেমন স্বতঃস্ফূর্ত্ত, তেমনি এর দেশ ও কালের ব্যবধান বিনাশ করবার একটা স্বাভাবিক বৃত্তি আছে। জ্ঞানের সঙ্কীর্ণ পরিধি ইন্দ্রিয় ও মনের সঙ্কীর্ণতার জন্য। এইজন্য চিত্ত-সত্ত্ব যখন শুদ্ধ হয়, আবরণ বিদূরিত হয়, জ্ঞান তখন এমনি অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, দৈশিক বা কালিক আচ্ছন্নতা আর থাকে না। এটা স্বাভাবিক। জ্ঞানের এরূপ বিকাশের জন্যই যোগপ্রচেষ্টা। বস্তুতঃ, মানুষের অন্তরে আছে অন্ধকার ও আলোর সমাবেশ; কিন্তু অন্তরের স্বাভাবিক আস্পৃহা আলোকের দিকে। এই আস্পৃহাই মানুষকে ক্রমবর্দ্ধমান স্বচ্ছতার দিকে নিয়ে যায় এবং ক্রমশঃ তাকে প্রতিষ্ঠিত করে বিরাট্ বিকাশে।

আসলে এই পরিণাম বুদ্ধির বা চিত্তের—চৈতন্যের নয়। বিবেকজ জ্ঞান প্রকৃতিরই অবভাসক হয়, প্রকৃতির ঊর্দ্ধে আরোহণে তার কোন কার্য্যকারিতা নেই, হতেও পারে না; কারণ, সে অধিকার তার নাই। সে অধিকার লাভ হয় প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক দ্বারা—তার স্থান বিবেকজ জ্ঞানের ওপরে।

এ জ্ঞান একরূপ অতিমানস জ্ঞান, এ মানস সীমার ও নির্দ্দেশের অতীত। যৌগপদ্য অনুভূতি এর বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু এই বিবেকজ জ্ঞান অভিমানস হলেও, প্রকৃতির অতীত চিতি-শক্তির আভাস বা প্রকাশ এই জ্ঞান-পরিধির বাইরে। বিবেকজ জ্ঞান প্রকৃতির উর্দ্ধে ক্রিয়াশীল নয়। প্রকৃতির উর্দ্ধে যে জ্ঞান বা চিৎশক্তি ক্রিয়াশীল, তা-ও অতি-মানস ; কিন্তু এর বিবেকজ জ্ঞান হতে পার্থক্য এই যে, বিবেকজ জ্ঞান সত্ত্বশুদ্ধি হলে সম্ভব হয়, কিন্তু তার সহিত চিৎ-শক্তির কোন সম্বন্ধ নাই। চিৎ-শক্তির ক্রিয়া প্রকৃতির উর্দ্ধে—কিন্তু তা পূর্ণরূপে প্রকৃতির অতীত চেতনার সম্প্রসারিত প্রকাশ। এ বিদ্যা—অবিদ্যার লেশ-স্পর্শ এতে নেই। অবিদ্যার ভিতর যে প্রকাশ, তাও চিতি-শক্তিরই প্রকাশ, কিন্তু চিতি-শক্তি সেখানে সঙ্কুচিত। এ প্রকাশ প্রকৃতির বিশুদ্ধিতায় উজ্জ্বল হলেও, তার সম্প্রসারণে প্রকৃতির উর্দ্ধে গতি নেই। সেজন্য আরোহক্রমে এই দুই প্রজ্ঞায় অতিমানসের জ্ঞান। বুদ্ধির দীপ্তিতে বিশ্ব পরিস্ফুট, কিন্তু বুদ্ধির উর্দ্ধ স্তর যা' সদ্বিদ্যায় প্রকাশিত, চিতি শক্তির শুদ্ধ স্বরূপভূত প্রমাণ তাতে প্রতিভাত হয় না। এ স্তর সদ্বিদ্যা হ'তে পরমপীঠ পর্য্যন্ত। এ বিজ্ঞান অলৌকিক বিজ্ঞান। বুদ্ধি উদ্ভাসিত অতিমানস স্তর এবং সদ্বিদ্যা উদ্ভাসিত অতিমানস বিজ্ঞান হ'তে এ ভিন্ন ; কিন্তু বিদ্যার প্রকাশে কোন সঙ্কোচ নেই—প্রকৃতিস্পর্শ নেই—এ জ্ঞান শুধু অতিমানসিক নয়, এ অপ্রাকৃত। এর অনুভব প্রকৃতির কোন শুদ্ধ স্তরের নয়। এ বিদ্যা পরম বিদ্যা, বিদ্যার স্বরূপ। এ বিদ্যা প্রথম উদ্ভাসিত হয় বিজ্ঞানালোকে, যা চিদ্‌লোক ও অচিৎ লোকের কেন্দ্রস্থল। এই বিজ্ঞানালোকেই সদ্বিদ্যার পরম উজ্জ্বল স্ফূর্ত্তি। এর দীপ্তিতে সম্ভূতির প্রকাশ এবং দিব্যজ্ঞানের পরিচয়। মায়ার লেশ থাকলে এ বিদ্যার অনুভব সম্ভব নয়। এখানেই জ্যোতিস্নাত উর্দ্ধ লোকের সংবেগের পরিচয়। এই বিজ্ঞানালোকের চমৎকারিত্ব এই যে,

এখানে কার্য্য এবং কারণ, বিশ্বের ও কারণতীত বিশ্বের যুগপৎ জ্ঞান হয়। এ অপর ও পরলোকের সেতু। এই সেতুর একদিকে আলো-আঁধার মিশ্রিত জগৎ, অপর দিকে শুদ্ধ স্ফটিকসদৃশ আলোর জগৎ—এ আলোক কখনই অস্তমিত হয় না। এর আলোক এমন নয় যেখানে জ্ঞানস্বরূপে অঙ্গীকৃত ভেদ স্ফুরিত হয় না। এর আলোকে সামান্য ও বিশেষ জ্ঞান ওতঃপ্রোতভাবে সঞ্চারিত হয়; কিন্তু বিজ্ঞানের উর্দ্ধ জগতে আলোক এত ঘন যে, তাতে কোন বিশেষের সঞ্চার হয় না—শুদ্ধ জ্ঞানালোক নির্ম্মল, ভাস্বর। জ্ঞান ও অজ্ঞানের সমাবেশে সম্বিত্তায় একটা চমৎকারিত্ব আছে। প্রকৃতির পরিশুদ্ধ সত্তা ও জ্ঞানের অরুণালোকের মিশ্রণই এই চমৎকারিত্ব রচনা করেছে। কিরূপে বিজ্ঞানালোকের সঙ্কুচনে প্রকৃতি সম্ভাবিত হয়, তা এখানে স্ফুট। জ্ঞানের প্রসারণ ও সঙ্কুচনের পূর্ণ পরিচয় এখানে। প্রসারণ হয়ে সঙ্কুচন, সঙ্কুচন হয়েও কিরূপে সম্প্রসারণ হয়, তার অপরোক্ষ নিশ্চয়তা এখানেই হয়। এই সঙ্কুচন-প্রসারণ 'আমি'কে কেন্দ্র করে নিষ্পন্ন হয়—এর উর্দ্ধে অতিমানস লোকে শুদ্ধ 'আমির'ই স্ফুরণ—কোথায়ও সে 'আমি' শুদ্ধ কেন্দ্ররূপে প্রতিভাত, কোথায়ও বা সে 'আমি' 'ইদং' রূপে বিবর্ত্তিত। দ্বিতীয়টিতে 'আমি' পরিস্পন্দিত বলেই তার বিকীরণ হয়। এই দুই-ই কিন্তু এক—একটাতে 'আমি'র স্ফুরণ মাত্র, আর একটিতে 'আমি'র পরিস্পন্দন। কোন মানস ক্রিয়া নেই বলে' এ স্তরে জ্ঞাতা-জ্ঞেয় সম্বন্ধ নেই—শুধু জ্ঞানমাত্র অববোধে অহং ইদং-এর স্ফুরণ। এ অনুভব জ্ঞানেরই অনুভব। এখানে জ্ঞানের কোন ক্রম নেই বলেই অহং-ইদং একই অনুভবে প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ, একই জ্ঞানের এরা প্রকাশবিশেষ। এর উপর স্তরে জ্ঞান কেন্দ্রীভূত হয় না। একে পরা সম্বিদ বলা যেতে পারে। এই জ্ঞান অতিমানসেরও উর্দ্ধে। অতিমানস জ্ঞানের দুটি স্তরের পরিচয় মিলে—একটি প্রকৃতির অন্তর্গত অতিমানস যা' বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে উৎপন্ন; আর একটি প্রকৃতির উর্দ্ধ

অতিমানস যা' চিতিশক্তিতে উৎপন্ন। প্রথমোক্ত জ্ঞানের চিতিশক্তি অনুস্যূত হলেও, শুদ্ধ চিতিশক্তির ক্রিয়া সেখানে নেই। এখানে চিতিশক্তি বুদ্ধির সহিত সংমিশ্রিত। আর অতিমানসকে অতিক্রম করে যে জ্ঞান, তাকে পরা সম্বিৎ বা পরাজ্যোতিঃ বলা যেতে পারে।

এ এক শান্ত জ্যোতিঃ, এক পরাসম্বিদ্। এ জ্ঞানের সমুজ্জ্বলিত সত্তায় কোথায়ও কেন্দ্রবোধ স্ফুট নয়। এ শুধু জ্ঞানোজ্জ্বল ভাতি, নিমেষহীন অশেষ দীপ্তি, সকল অবকাশের অতীত নিরবচ্ছিন্ন চিদাকাশ। এ জ্যোতিঃ মার্গজ্যোতিঃ নয়—এক দুরূহ জ্ঞান-শিখরে আরোহণের সহায়। এ হৃদয়-জ্যোতিঃ নয়, প্রোজ্জ্বলিত বিজ্ঞানের বিমল দীপ্তি নয়, এ সম্ভূতির জ্যোতিঃ-ছন্দ নয়, এ সবিতার ভর্গ জ্যোতিঃ নয়, —এ সত্য-জ্যোতিঃ, প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ, জ্যোতিঃ-স্পন্দনের মূল আশ্রয় পরম জ্যোতিঃ—এ জ্যোতিরও অন্তর জ্যোতিঃ—জ্যোতিষামপি জ্যোতিঃ। কোন উল্লাস নাই, কোন কম্পন নাই—নিবিড় শিব-জ্যোতিঃ।

এই শিব-জ্যোতিঃ জ্যোতির কম্পনে সম্বিৎধারায় স্ফুরিত হয়—শক্তির উন্মেষ ও উল্লাস আরম্ভ হয়। এই উল্লাসে জ্যোতিঃ-ছন্দ ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে—কিন্তু এ ছন্দ জ্যোতিরই ছন্দ, সম্বিদের প্রাথমিক স্পন্দন। এ কোন রূপে (mode) লীলায়িত হয় না। এ ছন্দের বিরাম নাই—অখণ্ড, অব্যয়। এ সম্বিদ্ বিন্দুরূপে প্রকাশ পায়। বিন্দু জ্ঞানশক্তির প্রাথমিক প্রকাশ হলেও, এ ক্রিয়াশীল—এ অবস্থায় পরাসম্বিদ্ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে (depolarised) শ্বেতবিন্দু ও রক্তবিন্দু হয়।

কিন্তু এই বৈষম্য থাকতে এদের শক্তি কেন্দ্রীভূত ভাবে সঞ্চারিত হয় না—কোন বিশেষ কেন্দ্র রচনা করে না—কারণ, সম্বিদ্ এ অবস্থায়ও অহং-ভাবে স্ফুরিত হয় না। এখানে সম্বিদের যে প্রকাশ, তা নির্বিশেষে সবিশেষ (indeterminate determinate), গতিছন্দে একই সম্বিদ্ দ্বিধাস্বরূপ হয়ে প্রকাশিত হয়। এই দ্বিধাস্বরূপতাই

প্রাথমিক সবিশেষত্ব—কিন্তু সবিশেষ হলেও, নির্ব্বিশেষ আধারচ্যুত হয় না। নির্ব্বিশেষে অবলম্বিত হয়েই তার প্রকাশ। এ অবস্থায় শক্তি এমন ঘনীভূত হয়নি, যেখানে জ্ঞান এক কেন্দ্রস্থ হয়ে 'আমি'-বোধে স্ফুরিত হয়। এইজন্য এরূপ সম্বিৎ প্রকাশবৃত্তিবিশিষ্ট হলেও, কেন্দ্রবিশিষ্ট হয়নি। এরূপ সম্বিদের অনুভব পরাজ্যোতির স্ফূর্ত্তির বা উন্মেষেরই অনুভব। এ অনুভবও পরা অনুভব।

তন্ত্রশাস্ত্রে সম্বিদের বৈন্দবী প্রকাশ জ্ঞান ও শক্তির প্রকাশ—সম্বিদের জ্ঞানাধিক্যে শ্বেতবিন্দুর প্রকাশ, ক্রিয়াধিক্যে রক্তবিন্দুর প্রকাশ। বস্তুতঃ, একই সম্বিদের স্পন্দনানুযায়ী দুই রূপের প্রকাশ। শ্বেত-প্রকাশের স্বাভাবিক গতি প্রসারের দিকে, রক্তবিন্দুর স্বাভাবিক গতি সঙ্কোচের দিকে। অরুণোদয়ে শ্বেতকিরণরশ্মি যেমন লালিমা দ্বারা আবিষ্ট হয়, এও অনেকটা তেমনি। সম্বিদের এরূপ প্রকাশের রূপবৈচিত্র্য অনুভূতিগম্য। অনুভবের উচ্চস্তরে সম্বিদ্-ধারার স্পন্দনের তীব্রতা ও গভীরতানুযায়ী নানা বৈচিত্র্যের প্রকাশ—এ প্রকাশ আলোক-স্তবকের ন্যায়ই স্ফুরিত—কোন স্তবকে জ্ঞানের স্ফুরণ, কোথায়ও আনন্দের স্ফুরণ, কোথায়ও শক্তি ও ক্রিয়ার স্ফুরণ। এ স্ফুরণ শুদ্ধ। এ অনুভবও পরা অনুভব। এই সম্বিদ্ বিশ্বগ হলেও, এর স্বরূপানুভূতি এই উচ্চস্তরেই সম্ভব, অন্যত্র নহে; এখানেই ইহা সম্প্রসারিত। বস্তুতঃ, শক্তির স্পন্দন-প্রবাহ (stream of vibrations) ভিন্ন সেখানে বস্তু কিছু নেই—বস্তু বলতে যা বুঝি, তা শক্তি-বিন্দুর স্রোত। একে শক্তিরূপে না দেখে নিত্য বাস্তব (real) রূপে দেখা মিথ্যা দেখা। বস্তুতঃ, বস্তু—এমন কি প্রাথমিক অহং-ইদংও—শক্তি-স্পন্দনেরই পুঞ্জীভূত বিকাশ। আসলে, এও শক্তি-স্পন্দন ভিন্ন কিছু নয়। এই শক্তির স্পন্দনের শুদ্ধ পরিচয় পাই পরাসম্বিদের বিকাশে। প্রবাহশীল শক্তি-স্পন্দনই নিত্য। বস্তু শক্তিরই সঙ্কুচন। সঙ্কুচন হলেও, এ কিন্তু শক্তির

স্পন্দন ভিন্ন কিছু নয়। তন্ত্র বাস্তব বিশ্বের স্থানে স্পন্দনাত্মক বিশ্ব স্থাপিত করেছে। এরই অপরোক্ষ জ্ঞান পরাসম্বিদের স্বরূপে। যখন শক্তির সর্ব্ব সঙ্কুচন হয়, অন্তর্নিহিত শক্তির নিরবচ্ছিন্ন নির্বিশেষ প্রবাহ যখন হয় আমাদের জ্ঞানগোচর, তখনই শক্তির সবিশেষ ক্রিয়া সৃষ্টির সঙ্কুচনে প্রকাশ পায়। এর ভিতর একটা প্রকাশ-বৈচিত্র্য ও প্রণালী থাকলেও, আসলে এ স্বরূপ-শক্তির স্পন্দন ভিন্ন কিছু নয়। স্পন্দন যে পরিমাণে সত্য, এর রূপ (form) সে পরিমাণ সত্য নয়।

জ্ঞান-বিচারে তন্ত্র মানস-জ্ঞানের পরিধি অতিক্রম করেছে। জ্ঞানের বিস্তৃতি ও পরিধি অসীম ; কারণ, জ্ঞানই তত্ত্ব। সেই জ্ঞান সঙ্কুচিত হয়ে সৃষ্টির পর্য্যায়ে অবতরণ করে—এইজন্য জ্ঞানের স্বাভাবিক গতি প্রসারের দিকে। এই স্বাভাবিক গতিকে অনুসরণ করলেই অতিমানস জ্ঞানের কেন্দ্র পাওয়া যায়। এই কেন্দ্রবোধ স্ফুট হলে মানুষের সঙ্কীর্ণ জ্ঞানের সীমা বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং বিশ্ব-বিজ্ঞান (cosmic), বিশ্বাতীত বিজ্ঞান (supra-cosmic) এবং স্বরূপ বিজ্ঞান (transcendental) প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ, জ্ঞানের পরিধি যতই বিস্তৃত হয়, ততই সূক্ষ্ম ও কারণ (ব্যষ্টি ও সমষ্টি), কারণাতীত প্রজ্ঞাময় জগতের সহিত পরিচয় হয়। মানুষ তার স্বাভাবিকী জ্ঞানের আস্পৃহায় এরূপে বিরাট (প্রকৃতি অভ্যন্তরে), বিরাটাতীত অতিবিরাটকে (প্রকৃতির উর্দ্ধে) অতিক্রম ক'রে শুদ্ধ জ্ঞান বা শিব-সত্তার দিকে অগ্রসর হয়। অতি মানসের বৃহৎ পরিধির এক এক স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে' অতিক্রম করতে হয়। এই অতিক্রমণ হয় স্বাভাবিক—আরোহণের সূক্ষ্মসূত্র ক্রমূর্দ্ধগ গতিকে নিয়ে যায়—এক গতি নিষ্পন্ন হলে আর এক গতি উন্মুক্ত হয়। গতি যত সূক্ষ্ম, জ্ঞান তত উদার ও বিস্তৃত এবং ক্রমশঃ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থিতির উর্দ্ধতম অবস্থায় শিবজ্যোতিঃ—জ্ঞান যেখানে স্বরূপ-প্রতিষ্ঠিত।

* *

কাল ও দেশ

কাল সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন। বিশ্লেষণ করলে কালের তিনটি স্বরূপ দেখতে পাই। একটি স্বরূপ সত্যি কালের রূপ নয়—তাকে অকাল বলা হয়। কাল-ব্যপদেশে শূন্যতাই তার রূপ। অকালে কালের স্পর্শ নেই। অর্থাৎ যে অকাল, সে নিত্য—তা না হলে অকালের কোন অর্থই হয় না। যে অকাল তাকে কাল স্পর্শ করে না বলেই সে নিত্য। 'অকাল' বা 'নিত্য' শব্দের দু'টি অর্থ হয়—(১) কালশূন্যতা (২) কালনিরবধিতা। যে কালশূন্য, কালের কোন ক্রিয়া হতে পারেনি বলেই সে নিত্য। এ নিত্যত্বের সহিত কালের কোন সম্বন্ধ নেই, সত্যিকার এ কালহীনতা (timelessness)—এরূপ নিত্যত্ব পরম শিবের। এমন কি কালের কোন স্ফুরণ সেখানে নেই—কারণ, শক্তি সেখানে ক্রিয়াশীল নয়। এরূপ নিত্যত্ব (eternity) গতির নিত্যত্ব নয়—এ স্থিতিস্বরূপতা। গতির নিত্যত্ব ক্রিয়াতেই নিষ্পন্ন হয়। স্থিতিস্বরূপতার নিত্যত্ব কালহীনতায় আর গতির নিত্যত্ব কালনিরবধিকত্বে। অবিরাম গতি—যার আরম্ভ নেই ও শেষ নেই, তাও নিত্য; কিন্তু এ নিত্যত্ব গতিশীল (dynamic)—এও কালদ্বারা অবচ্ছিন্ন নয়; কারণ, কালের উৎপত্তি নেই, কালের শেষ নেই—এ অনাবদ্ধ ও অশেষ প্রবাহ—একই। কালই ইহার স্বরূপ—এ কালস্বরূপ অকাল। প্রথমটি কালহীন অকাল। কালস্বরূপ অকাল; কেননা, কালের ওপর কালের কোন কর্তৃত্ব নেই। কাল অখণ্ড, অনাদি, অনন্ত—বস্তুতঃ অনাদি ও অনন্ত কথাগুলি কালকে অবলম্বন করেই ব্যবহৃত। যা' কালে উৎপন্ন হয় না তাই অনাদি; যার কালে শেষ নাই, তাই অনন্ত; যা' কালে বিচ্ছিন্ন হয় না, তাই অখণ্ড। কালই এরূপ পদার্থ। কালের উৎপত্তি কালে হয় না, কালের শেষও কালে হয়

না। কালেও একরূপ অকালতা বিদ্যমান। দু'টাই অকাল—একটি কালের সহিত সম্বন্ধশূন্য, আর একটি কালের স্বরূপ।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, এই দু'টি পরস্পর ভিন্ন অথবা এদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে ? এ প্রশ্নটি অত্যন্ত গভীর এবং দর্শনশাস্ত্রে এ নিয়ে অনেক কথার অবতারণা হয়েছে। এই দুই প্রকার অকাল পরস্পর ভিন্ন হলে' আমরা দু'টি জগৎ পাই—যাদের পরস্পর কোন সম্বন্ধ থাকে না। এ ধারণায় কল্পনা ক্লিষ্ট হয়। এ জন্য দার্শনিকদের মধ্যে কেহ প্রবাহরূপী কালকেই নিত্য বলেছেন—এইটি সত্যই অকাল। এ ভিন্ন 'স্থিতি' বলে কোন পদার্থ নাই—স্থিতি বলতে আমরা যা' বুঝি, ওটা আমাদের মানস-বোধ (intellectual concept) ; কারণ, মন স্থিতিশীলতা ভিন্ন ভাবতেই পারে না। বস্তুতঃ, স্থিতি বলে' কিছু নেই, সবই গতি ; স্থিতিটা শুধু প্রবাহের একাংশ দৃষ্টি বা প্রবাহের বিচ্ছিন্ন দৃষ্টি। স্থিতি সত্য নয়, গতিই সত্য—স্থিতিরূপে ভাবা বা দেখা মানসিক ধর্ম্ম হলেও, এ কিন্তু সত্যদৃষ্টি নয়। সত্য দৃষ্টি অখণ্ড কালিকপ্রবাহে নিবদ্ধ—এ জ্ঞান মানসজ্ঞান নহে —এ অতিমানস জ্ঞান (intuition)। পক্ষান্তরে এমনও মত আছে, যাতে কালকে বা প্রবাহকে বলা হয়েছে মিথ্যা, স্থিতিকে বলা হয়েছে সত্য। কাল সত্যের বোধক নয়, হতে পারে না—কারণ, কালের ধারণা পূর্ণরূপে করতে গেলে কালকে অতিক্রম করতে হয়। বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ও অতীত—ত্রিপাদযুক্ত কাল। কালকে ঠিক ঠিক ধারণা করতে গেলে এই ত্রিপাদকে এককালেই বুঝতে হয়, নতুবা কালের স্বরূপচ্যুতি হয়। এককালে এদের ধারণা কিন্তু কালকে অতিক্রম করেই করতে হয়। যুগপৎ বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ-এর অবভাস কালে সম্ভব নয়, কালে একত্বই বর্ত্তমান। এ প্রবাহে অতীত অতীত, বর্ত্তমান বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ—এদের ভিতর প্রবাহের অনবচ্ছিন্নতা বা এদের যৌগপাদ্যানুভূতি কালে সম্ভব হয় না। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে এক করে দেখতে

হলে কালকে অতিক্রম করতে হয়—আর এ এমনি অনুভূতি যেখানে কাল থাকে না। সত্যিকার কালবোধই অকালের পরিচয় দেয়। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এক করে না দেখতে পারলে কালজ্ঞান হয় না। কারণ, কাল অর্থ ই অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—(এটাই time unit)—এর জ্ঞান কালে হয় না—কালকে অতিক্রম করলেই এদের বোধ হয় সুস্পষ্ট। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মিলন—যার সঠিক অর্থ কাল—কালে নিষ্পন্ন হয় না—যেখানে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে সমান ভাবে দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে কাল নাই—তা অকাল।

বস্তুতঃ, কালের চিন্তাই অকালের পরিচয় করিয়ে দেয়। কাল বলে নিত্য কিছু নেই—অকালই নিত্য—কালের স্বরূপ চিন্তা ঠিক কালকে অতিক্রম করেই হয়—কালই অকালের দেয় পরিচয়। এই অকালে কাল লয় হয়। কাল মানসিক দৃষ্টি, অকাল অতি-মানসিক বা সত্য দৃষ্টি। মনে কালের এমনি ধারণা হয় বটে, কিন্তু কালের সত্য ধারণা—অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যতের প্রকৃত ধারণা—কাল অতিক্রম করেই হয়। মানস কালিক ধারণার ভিতর যে লাঘবতা আছে, তা অতিমানস সত্য দৃষ্টিতে নেই। কারণ, অতিমানস দৃষ্টিতে কাল নেই। তত্ত্ব—স্থিতি, গতি নয়।

কাল সম্বন্ধে এরূপ বহু বিরুদ্ধ মত বিদ্যমান (এতদ্ভিন্ন অন্য মতও আছে)। এখানে শৈব দর্শনের তত্ত্বচিন্তানুযায়ী কালের স্বরূপ নির্ণীত হয়েছে। আমরা এই দু'টি মাত্র মত দিলাম; কারণ, ইহা শৈবসিদ্ধান্ত বুঝতে সাহায্য করবে। শৈবসিদ্ধান্তে কাল অকাল হয়েও নিত্য কাল। যখন কালকে অকাল বলা হয়, তখন শিবস্বরূপ তত্ত্ব বুঝি—স্থিতিস্বরূপতা। কিন্তু স্থিতিস্বরূপতা হলেও, এর সহিত শক্তির কোন সংযোগ আছে কিনা, এই প্রশ্ন। কেউ বলেন, তাত্ত্বিক কোন সম্বন্ধ নেই, অধ্যাসিক সম্বন্ধ কল্পনা করা হয়; কারণ, কাল মিথ্যা। কেহ কেহ বলে থাকেন, অকাল ও নিত্যকালের (timelessness and eternity) মধ্যে সম্বন্ধ আছে—যা'

কালহীন, তাই অখণ্ড কাল। শিব অকাল হয়েও নিত্য অখণ্ডকাল। শক্তিনিত্যত্ববাদী কালের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ স্বীকার করেন; কিন্তু এই প্রবাহ অকালের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। যা কালহীন, তাই আবার কালে নিরবধি এবং এই প্রবাহ অনাদি, অনন্ত, অখণ্ড। বস্তুতঃ, একই নিত্য পদার্থের এক অনবচ্ছিন্ন প্রবাহ বা ঐক্য আছে; যা অকাল তাই কাল—অকাল ও কালে ভেদ নেই। ভেদরূপে দেখার জন্য অকাল হয় প্রবাহ-শূন্য; কাল হয় ভিত্তিশূন্য—স্বয়ং ও সর্ব্বস্ব। এ বিষয়ে প্লটিনাসের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য: "যখন একজন অনন্ত শক্তিকে এক সঙ্গে সংগৃহীতরূপে দেখতে পায়, তখন সে স্বরূপ-অস্তিত্ব (essence) দেখে; পরে যখন সে এর ভিতর জীবনের সাড়া দেখতে পায়, তখন সে গতিকেই দেখে—পরমুহূর্ত্তে যখন সে দেখে ইহারা একই অখণ্ড সত্তারূপে বিদ্যমান, তখনই তাকে বলে নিত্য। এগুলি মিলিয়ে একই জীবনের পরিচয়—যা সঙ্কুচিত হয়ে ভেদ সৃষ্টি করেছে—শক্তির এক অফুরন্ত ঐক্যের পরিচয় দেয়, যা কখনই এক চেতনা হতে অন্য চেতনায় সংক্রমিত হয় না, যা খণ্ডিত হয় না—এরূপ যখন দেখা হয়, তখনই অকালকে (eternity) দেখি" (Taylor—Select works of Plotinus—১১৮ পৃঃ)। প্লটিনাসের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি একই সত্তার ভেতরে অখণ্ড স্থিতি ও গতির সন্ধান পেয়েছেন; অকালের ভিতর অখণ্ডকাল, স্থিতি ও অবিভাজ্য গতিকে ভেদ করে দেখেননি। একই পদার্থ স্বরূপে স্থিত হয়ে এরূপ অক্রমিক প্রবাহে প্রকাশ হতে পারে। এই প্রবাহরূপ গতি কালস্বরূপ গতি ভিন্ন কাল কিছু নয়। শৈব দর্শনে কাল সত্য, শিব ও শক্তিরূপা। অকাল শিব, আদি অন্তহীন কালই শক্তি। শক্তি ও কাল ভিন্ন পদার্থ নয়। শক্তি ও কালকে ভিন্ন করে দেখা মনের স্বভাব। মনে হয় কালেই শক্তির সঞ্চরণ হয়। বস্তুতঃ, সঞ্চরণের বোধই কাল-বোধ—কাল-বোধ এ ভিন্ন স্বতন্ত্র কিছু নয়। কালকে যখন ক্রমিকরূপে

দেখি তখন শক্তি ও কালকে ভেদ বলে দেখি; কিন্তু ক্রমিকরূপে দেখাই কালের সত্য সৃষ্টি নয়—এ সৃষ্টি খণ্ড সৃষ্টি।

এই অখণ্ড ক্রমিক কালপ্রবাহে অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ কিছু নেই—কারণ, ক্রমিক কালে পার্থক্যের স্থান ও অর্থ আছে; কিন্তু অক্রমিক কালে পারম্পর্য্য নেই—অথচ গতি আছে। এই গতিকে মনের দ্বারা দেখবার কোন উপায় নেই, যেহেতু মন ক্রমিক রূপ দেখতেই অভ্যস্ত। অক্রম গতিকে ধারণা মন করতে পারে না।

এই অক্রমিক অনবচ্ছিন্ন প্রবাহই কাল। অক্রমিক হলেও, গতি বলেই এর ধারাস্বরূপতার বিচ্যুতি হয় না। পারম্পর্য্য বোধ না থাকলেও, বিরামহীন ধারার বোধ এতে আছে। পারম্পর্য্য বোধে এই ধারা হয় খণ্ডিত, কিন্তু ধারা খণ্ডিত না হয়েও নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ হতে পারে। এরূপ কালের প্রত্যক্ষ হয় অতিমানস জ্ঞানে। এই অনবছিন্ন কালে খণ্ডবৃত্তি নেই। মন পারম্পর্য্য দেখতেই অভ্যস্ত—অনবছিন্ন কাল, ত্রিকাল দৃষ্টির অতীত বা ত্রিকালের অখণ্ড দৃষ্টি। কালভেদ এই ত্রিকাল দৃষ্টির কোন আবরণ করতে পারে না। এই অনবছিন্ন দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষেরা সর্ব্বধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। পদার্থের স্বরূপ তাঁদের কাছে প্রকাশিত হয়। এই অতিমানসিক কাল-দৃষ্টি লাভ করলে অখণ্ড প্রবাহের স্বরূপ জ্ঞান হয়। বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ও অতীত জ্ঞান এক সময়েই হয়—ত্রিপাদ-কালের অস্তিত্ব এরূপ অনুভবসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে থাকে না—ক্রমিক জ্ঞান ও ভেদজ্ঞান অপসারিত হয়।

প্লটিনাসের আর একটি উক্তির স্মরণ হচ্ছে: অখণ্ডকালের স্বরূপ বিশ্রান্তি (repose) নয়—নিরবচ্ছিন্ন। এতে গতি আছে এবং এ গতির সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন; কিন্তু তাই বলে এর উৎপত্তি বা বিনাশ-কল্পনা করা যায় না। (The Wisdom of Plotinus, Page 61, C. J. Whitby)

মানস জ্ঞানে শক্তিকে ও কালকে ভিন্ন করে দেখি—কালে শক্তি ক্রিয়মান হয়, এইরূপ বুঝি। মন ক্রিয়াকে ও কালকে পরস্পর ভেদরূপেই বোঝে। ক্রিয়া কালকে অবলম্বন করেই হয়। ক্রিয়ার আশ্রয় যেন কাল। যেখানে কাল নেই, সেখানে ক্রিয়ার কল্পনা মন করতে পারে না। মানস ভূমিকায় দেখবার স্বরূপই এই—কারণ, মনের ধর্ম্ম বিশিষ্টরূপে দেখা, ভিন্ন করে দেখা। কিন্তু অতিমানস জ্ঞানে দেখার স্বরূপ বদ্‌লে যায়। এ জ্ঞানে যেমন কালকে অখণ্ডরূপে দেখবার শক্তি হয়, তেমনি শক্তির ও কালের অভেদ রূপ প্রতিভাত হয়। কালই শক্তি, শক্তিই কাল। শক্তি বীজ, কাল অঙ্কুর। শক্তি, ক্রিয়া, কাল—এই হল শক্তির প্রকাশের গতি। শক্তি বলতে যদি বোঝা যায়, তার আরম্ভ ও শেষ আছে, তবে কাল সেরূপ শক্তি নয়—কাল নিরবচ্ছিন্ন গতি—আদি নেই, অন্তও নেই। কালের এই নিরন্তর প্রবাহ আভাস স্তরে আছে—পরিণামে নাই। পরিণামকে বুঝি কালের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয়ের দ্বারা। এজন্যই প্রকৃতির ক্রিয়ায় কাল-বোধ যেরূপে হয়, প্রকৃতির উর্দ্ধে সেরূপে হয় না। একটি পরিণামের জগৎ; আর একটি চিৎপ্রবাহের জগৎ। চিতির প্রকাশে ক্রিয়ায়ও প্রবাহশীলতা আছে, কিন্তু পরিণাম নেই বলেই এর ক্রিয়ার কাল-অবচ্ছিন্নতা নেই। কালাবচ্ছিন্ন হলে এককালে উৎপত্তি, আর এককালে স্থিতি ও আর এককালে বিলয় হয়। এখানে স্মৃতিকে নিয়ে পরিণামকে বুঝতে হয়; কারণ, যে কালে উৎপত্তি হয়, সে কালেই ধ্বংস হয় না বা স্থিতি হয় না। বস্তুতঃ, পরিণামে রূপান্তর আছে, আর রূপান্তর ক্রমিক কালে সম্ভব হয়, অক্রমিক কালে সম্ভব হয় না।

প্রাকৃত দৃষ্টিতে কালকে পারম্পর্য্য ও অবস্থার পরিণাম দ্বারাই বোঝা যায়—পারম্পর্য্যের সহিত রূপান্তর বোধ কালকে সুস্পষ্ট অনুভব দেয়। শক্তিবাদে, বিশেষতঃ, শুধু পারম্পর্য্যের কোন অর্থ নেই—শক্তির ক্রিয়াকে নিয়েই পারম্পর্য্য বোধ—কাল ও শক্তি এ ভূমিকাতে বিশিষ্ট হলেও,

তাদের মধ্যে সম্বন্ধ থেকে যায়। শক্তির রূপান্তর ক্রিয়ার পারম্পর্য্য বোধ করিয়ে দেয়। এ পারম্পর্য্য দেয় কালবোধ। কাল শুধু ঘটনার পারম্পর্য্য-দৃষ্টি নয়—শক্তি-ক্রিয়ার পারম্পর্য্য-দৃষ্টি। কাল শক্তির বাহন। কালকে অবলম্বন করে (in actual world) বিচ্ছিন্ন ক্রিয়ায় জগতে শক্তির প্রকাশ ও রূপান্তর। পারম্পর্য্যের ভিতর শক্তির সূত্র বর্ত্তমান। বস্তুতঃ, ক্রমিক কাল শক্তি-ক্রিয়ার পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি। পরিচ্ছিন্নতার জন্য পারম্পর্য্য বোধ। অক্রমিককালে কোথায়ও পরিচ্ছিন্নতা নেই। এ জন্যই যোগী প্রত্যক্ষ কালকে অতিক্রম করে' প্রাকৃত জগতেও অনবচ্ছিন্ন গতির স্পন্দন ও ক্রিয়া অনুভব করেন। যোগী প্রত্যক্ষ রূপান্তরকে অতিক্রম করে' এবং কালকেও অতিক্রম করে' এক শক্তির স্ফূর্ত্তি সর্ব্বত্র দেখতে পান। প্রকৃতি-জগতে একই চিতি শক্তির প্রকাশ বা আভাস দেখা যায়—প্রকৃতিতে শক্তির সঙ্কোচ দৃষ্ট হয়। শক্তির সঙ্কোচ হতে হয় কাল ও প্রকৃতির ভেদ। সঙ্কোচ দূরীভূত হলে এই প্রভেদ থাকে না। কাল তখন হয় অক্রমিক। বস্তুতঃ, সৃষ্টিতে হয় অক্রমিক কাল, আর ক্রমিক মুক্তিতে হয় ক্রমিক কাল। এই অক্রমিক কালবোধে চিতির আবির্ভাব—প্রকৃতির তিরোভাব। শৈবদর্শনে কালের মানসিক ও অতিমানসিক রূপ দেখতে পাওয়া যায়। মানসিক রূপে কাল ভেদদ্বারা অনুবর্ত্তিত। এই ভেদ ভিন্ন কালকে মন বুঝতে পারে না। অতিমানসিক অনুভূতিতে কালের স্বরূপ ভিন্ন, কোন ভেদই কালে থাকে না। বস্তুতঃ, কালের অতিমানসিক স্বরূপ কখনই পরিবর্ত্তিত হয় না—কাল অবিভাজ্য, কিন্তু মানস জ্ঞানে এই প্রবাহরূপতা প্রতিফলিত হয় না বলেই কালকে ঘটনার ও ক্ষণের পারম্পর্য্য হিসাবেই বুঝি। শৈবদর্শনে কাল-দৃষ্টিতে বাস্তব পদার্থ (actual) মনঃপ্রসূত (ideal) নয়। মানস জ্ঞানে যা ক্রমিক কাল (time), অতিমানসে তা অক্রমিক কাল (eternity)। কালের এই যে প্রকারভেদ, তাকেই অবলম্বন করে

বিজ্ঞান ও দর্শনের ভেদ হয়েছে। বিজ্ঞান অংশ দেখতে অভ্যস্ত, তাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি (scientific viewpoint) ঘটনার বৈশিষ্ট্য ও পারম্পর্য্য দেখে; কিন্তু দর্শন এরূপ কালবোধকে অতিক্রম করে' অক্রম কালকে (বা eternity) বুঝতে চেষ্টা করে, এবং এরূপ কালকে তত্ত্বের স্বরূপ বলেই বোঝে। সত্যি কাল বলতে ব্যবহারিক বিজ্ঞানে যা বুঝি, দার্শনিক বিজ্ঞানে তা অতিক্রম করি। প্লটিনাশের ভাষায় বলা যায়, "বোধিসত্তার (intelligible existence) কাল (time) অকালের (eternity) দ্বারা অতিক্রান্ত (superseded) হয়।" দর্শন মানস বিজ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করে' তথ্যের ও তত্ত্বের দৃষ্টি দেয়।

সদ্‌বিদ্যায় কাল (time) ও অকালের (eternity) হয় সমন্বয়। অকালের ভেতর কালের স্ফূর্ত্তি। কাল প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল হলেও, অকালে গতি-ছন্দে এর অভিব্যঞ্জনা হয় এবং ইহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষীভূত হয় সদ্‌বিদ্যায় অবতরণ মুখে। অকাল কিরূপে সঙ্কীর্ণ হয়ে কালে বিবর্ত্তিত হয়, সদ্‌বিদ্যায় তার স্পষ্ট ধারণা হয়। অকালে সৃষ্টির উদ্‌গমে কালের সঞ্চার। বস্তুতঃ, কাল ও অকাল নিয়ে একটা সমন্বয় শৈব দর্শনে দেখ্‌তে পাওয়া যায় এবং তা সম্ভব হয়েছে সদ্‌বিদ্যার ধারণায়। ঠিক এই সংযোগ স্থানের উর্দ্ধ-ভূমিকা অকালের বিশ্ব, এর নিম্নভূমিকা কালের জগৎ। এখানে এ দু'য়ের সন্ধিস্থান—অক্রমিকের ক্রমিক সন্ধান।

তন্ত্রে কালের ন্যায় দেশের ধারণা স্বতন্ত্র। শক্তি দেশ ও কালের মূলে। শক্তিরই প্রসার বিশেষ দেশ। দেশ ও কাল নিত্য। সাংখ্যের ন্যায় কাল ও দেশ বিকল্পমাত্র, একথা তন্ত্রে স্বীকৃত হয় না। বস্তু শূন্য হয়ে শাব্দিক রূপে থাকার নামই বিকল্প। বৃত্তির পারম্পর্য্যে ক্রিয়া ভিন্ন শুদ্ধকাল বলে কোন পদার্থ সাংখ্যে স্বীকৃত হয় না। এমন অবসরই হয় না, যাতে কোন মনোভাব হয় না। অতএব শুদ্ধ অবসর বা শুদ্ধ কাল অসম্ভব কল্পনা। শুদ্ধ অবসরকে জানতে গেলেও, জানার

মনোভাব হবে, সুতরাং শুদ্ধ অবসর (মনের অতীত হয়ে) হয় না। "শুদ্ধ বিস্তার" তেমনি অসম্ভব। শুদ্ধ বিস্তার কোথাও নেই। সব স্থানই রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ, শব্দবিশিষ্ট দ্রব্যের দ্বারা পূর্ণ। দ্রব্যশূন্য বিস্তার থাকলে তবে "শুদ্ধ বিস্তার" (pure space) আছে, বলা যেতে পারে। কিন্তু দ্রব্যশূন্য বিস্তার নাই। এই "শুদ্ধ অবসর" (pure space) ও "শুদ্ধ কালের" (pure time) মানস ধারণাও অসম্ভব। পূর্ব্বানুভূত না হলে স্মৃতি হয় না, স্মৃতি না হলে বাহ্য কল্পনাও হয় না। কল্পনা ত সজ্জিত স্মৃতি মাত্র! এরূপে সাংখ্য দেশ ও কালের শুদ্ধত্ব (purity) ও অনপেক্ষকত্ব (unrelatedness) অস্বীকার করেছে।

তন্ত্র এরূপ মতকে গ্রাহ্য করেনি। কাল স্বরূপতঃ নিত্য, অবিভাজ্য; দেশও স্বরূপতঃ নিত্য, অবিভাজ্য; যদিও কালের ও দেশের উপাধি ভেদে তাদের খণ্ডত্ব ও সসীমত্ব কল্পিত হয়। বস্তুতঃ, দেশ অখণ্ড ব্যাপকতা, কাল অখণ্ড প্রবাহ।

কিন্তু কী কাল বা কী দেশ, শক্তি ভিন্ন এদের কোন স্বাধীন, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। এরা শক্তিরই প্রকারবিশেষ। তন্ত্র শক্তি-স্বতন্ত্র কোন পদার্থ স্বীকার করে না। শক্তির ক্রিয়া দুই প্রকার—ব্যাপক-রূপী ও প্রবাহরূপী। শক্তির বিকাশ দুই পথে—সঙ্কোচে ও বিকাশে, গতিতে ও গতিহীনতায়। শক্তির বিকাশ শক্তির ক্রিয়াকে অবলম্বন করেই হয়। ব্যাপকতায় থাকে সঙ্কোচ ও বিকাশ (বিস্তারভাবে); প্রবাহে থাকে গতি—যখন শক্তি স্পন্দিত হয়। স্পন্দিত গতি অগতির অকাল।

শক্তির বিকাশাভিমুখ ব্যাপকতায় (extensity) হয় দেশ বা অবসরের উৎপত্তি। এই ব্যাপকতা যখন অবকাশ, তখনই অখণ্ড-দেশবোধ। দেশ বল্লেই যে তাতে বিষয়ের বা বস্তুর সমাবেশ থাকবে, এমন কোন নিয়ম নেই। দেশ দেশ, তার নিজের স্বরূপ বিস্তারতা বা

ব্যাপকতা; কিন্তু বিষয়ের অধিকরণত্ব নয়; বিষয় থাকতেও পারে, নাও পারে—বিষয়ধারণসামর্থ্য অবশ্যই থাকবে। কিন্তু বিষয়ধারণ-সামর্থ্য থাকলেই যে বিষয় পূর্ণ হবে এমন কোন নিয়ম নেই। শক্তির অনবচ্ছিন্ন বিস্তৃতি দেশ। ক্রমহীন প্রবাহ অখণ্ড কাল। এই অখণ্ড দেশ ও কালই শক্তির প্রাথমিক বিকাশ। এই দেশ ও কালকে অবলম্বন করে আভাস স্ফূর্ত হয়। শক্তির ব্যাপক ক্রিয়া আছে; এই ব্যাপকতায় শুদ্ধ দেশের বোধ হয়। ক্রিয়ার অতিমানসিকতা বা শুদ্ধ দেশ শক্তির তেজোময় অনবচ্ছিন্ন প্রসারতা। বিন্দুর সীমাহীন ব্যাপ্তি দেয় শুদ্ধ দেশবোধ। শক্তিবিন্দু প্রসারীভূত হয়ে হয় দেশ। ইহাই বিন্দুর অবশিষ্ট (indeterminate) বিকাশ। তেজোময় প্রসারতা বিন্দুর কেন্দ্রহীন বিকাশ। কাল কেন্দ্রযুক্ত হয়ে হয় বিন্দু, কেন্দ্রহীন হয়ে প্রসারতা হলে হয় দেশ। বস্তুর দেশ ও বিন্দুর পার্থক্য—শক্তির অকেন্দ্রীয় ও কেন্দ্রীয় বিকাশ।

প্রাথমিক প্রবাহ জ্ঞান হয় নাদে, এইজন্য কাল অখণ্ড নাদস্বরূপ। নাদের অবিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন রূপ থাকতে পারে। নাদ অবিচ্ছিন্ন হলে হয় কাল। বিন্দুতে আছে প্রসারতার বীজ, নাদেও আছে শব্দ-প্রবাহের বীজ। নাদ প্রবাহরূপী। প্রাথমিক কালের উৎপত্তি এখানে। বিন্দুও নাদের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হতে পারে—এই বিচ্ছিন্ন বিন্দু তেজোময়, কিন্তু কেন্দ্রীভূত। অকেন্দ্রীভূত বিন্দুই নিত্য-অবসর। এই অখণ্ড অবসরে ও অখণ্ডপ্রবাহে বিচ্ছিন্ন বিন্দু ও নাদের উৎপত্তি।

কাল ও দেশকে সাধারণতঃ যেরূপ দেখা হয়, তন্ত্রে তার স্থান নেই। এরা মানস ধারণার অতীত শক্তির প্রকাশ। এরূপ কাল ও দেশ যোগীর ধ্যানগম্য। মনন ক্রিয়া অতীত হয়ে যখন প্রকৃতির ঊর্দ্ধস্তর খুলতে থাকে, তখন এক অখণ্ড ব্যাপক জ্যোতিঃ ও নাদপ্রবাহের সহিত পরিচয় হয়। কোন বিষয় নাই অথচ অন্তহীন বিকাশ ও অবিচ্ছিন্ন

নাদ—জগতে চেতনার প্রকাশ। এই জগতেই চেতনা দেশ ও কালের আশ্রয়রূপে প্রকাশ পায়। এই শক্তিই বিকাশের প্রাথমিক প্রকাশ। এরূপ দেশ ও কালকে অধ্যাত্ম দেশ (spiritual space) ও অধ্যাত্ম-কাল (spiritual time) বলা যেতে পারে। বস্তুতঃ, শক্তি, দেশ ও কালের পার্থক্য মানসভূমিকায় রচিত হয়—যেখানে পৃথক্ রূপে কাল দেখতে মন অভ্যস্ত। তত্ত্বে অখণ্ড দেশ ও কাল শক্তিরই ক্রিয়া ও প্রকাশ বিশেষ। শক্তিমান সর্ব্বদাই থাকে পূর্ণরূপে কেন্দ্রসাক্ষী—এখানে অখণ্ড অবকাশ ও কালের অনবচ্ছিন্ন প্রবাহ, দুইই লয় হয়। এই পূর্ণ লয়-ভূমিকা শিবের ভূমিকা।

কেন্দ্রশক্তি যখন সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতম অবস্থা প্রাপ্ত হতে থাকে, সকল সঞ্চারের গতি অবরুদ্ধ হতে থাকে, তখন নাম-রূপের জগৎ ধীরে ধীরে অস্তমিত হয়। মাত্র ব্যাপিনী বৃত্তি অবশিষ্ট থাকে। অখণ্ড দেশ ও কালের পরিচ্ছেদে মহাকালের প্রকাশ সিদ্ধির শীর্ষ অবস্থায়। সাক্ষীস্বরূপ চেতনার দেশ ও কালরূপে বিকাশ, তার ভিতর জ্যোতিশ্ছন্দের ও শব্দছন্দের আবির্ভাব—অধ্যাত্ম-সাধকের পরম উপভোগ্য। প্রাণ, মন, এমন কি বিজ্ঞানগ্রন্থির ভেদ হলে এই সম্ভাবনার সত্য উপলব্ধি হয়।

সন্বিদ্যা-ভূমিকা অনবচ্ছিন্ন দেশের সমন্বয় ভূমিকা—অনবচ্ছিন্ন হয়ে কিরূপে দেশ অবচ্ছিন্ন হয়, তার সন্ধান এখানে পাওয়া যায়। নাম, রূপ, সৃষ্টি, বস্তুতঃ অনবচ্ছিন্নের অবচ্ছিন্ন প্রকাশ। এই সন্বিদ্যা বিস্তৃতি ও সীমার সন্ধিস্থান। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, অসীম ও সসীমের সন্ধি এখানে। যোগে সন্ধিস্থানে উপনীত হতে পারলে অসীমের সসীমত্বে বিকাশ, সসীমের অসীমত্বে স্থিতি ও স্ফুরণ হয়। বিন্দু ও জ্যোতিঃধারা প্রাকৃত শব্দ ও তেজতত্ত্ব হতে পৃথক। এখানে সাংখ্য হতে তন্ত্রের মতভেদ। এ শব্দও বিন্দুশক্তির স্ফুরণ—প্রকৃতির কোন তত্ত্বের সহিত

এদের আদৌ সম্বন্ধ নেই। কথা হতে পারে, আকাশই শব্দের জনক—এ ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সত্য, কিন্তু তন্ত্রের শব্দ বা জ্যোতিঃ ইন্দ্রিয় বা মানসগোচর নয়। ধ্যানের গভীরতায় যখনই মনের ও মানস জগতের লয়, তখনই এই অতিমানসবেদ্য নাদ বা ক্রিয়াস্বরূপ কাল অথবা তেজোময় অবস্থিতিস্বরূপ দেশের প্রকাশ।

* *
*

দর্শন ও রহস্যবাদ

তত্ত্বালোচনায় একটি বিষয় স্বতঃই উপস্থিত হয়: দর্শন ও রহস্যবাদের কোন সম্বন্ধ আছে কি না? দর্শনে রহস্যবাদের স্থান আছে কি না? দর্শন বলতে সাধারণতঃ বিচার দ্বারা বিশ্লেষণ বোঝায়, যে বিশ্লেষণে তথ্য পরিষ্কৃত হয়। দর্শন সমস্ত অভিজ্ঞতার উপর একটি সিদ্ধান্ত দিতে চেষ্টা করে; কারণ, তার কাজ হচ্ছে অভিজ্ঞতাকে সুচিন্তিত ভাবে প্রণালীবদ্ধ করা। এটা সাধারণ কথা। অভিজ্ঞতার অশেষ প্রসার হতে পারে, অতএব সকল অভিজ্ঞতাকে লাভ করে একটি প্রণালীবদ্ধ চিন্তার ধারা সৃষ্টি করা সব সময় সম্ভব নয়। এইজন্যই দর্শনের গতি শেষ হয় না, নবীন অভিজ্ঞতার সহিত নবীন চিন্তা প্রণালীর উদ্ভব হতে পারে। সাধারণতঃ দর্শন যে সব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তার মূল-ভিত্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও মানস জ্ঞান। এর উপরের জ্ঞান সকল দর্শনে স্বীকৃত হয় না; স্বীকৃত হলেও, তার স্বরূপ নিষ্পন্ন হয় না, শুধু ইঙ্গিতপূর্ব্বক দিগ্‌দর্শন করা হয়।

ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার উপরে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা স্বীকৃত হয় ধর্ম্মানুভূতিতে; ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় অনুভবের সমন্বয় করে কিন্তু দর্শন। কারণ, দর্শন বোঝাতে চায়, কোথায় সমস্ত অভিজ্ঞতার প্রতিষ্ঠা এবং এদের ভিতর সমন্বয় কোথায়। অতীন্দ্রিয় অনুভূতির বিশেষ জ্ঞান দর্শনের বিষয় নাও হতে পারে, কিন্তু সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার ভিতর সম্বন্ধ আবিষ্কার করা তার প্রধান কাজ—অভিজ্ঞতার ভিতর সমন্বয়সূত্র অনুসন্ধান করে' একই তত্ত্বে কি রূপে তারা নিবেশিত, তাই দেখান দর্শনের কাজ। এইজন্য অনুভবমাত্রেরই দর্শনে একটি স্থান আছে; যেহেতু, এই হল তার সৃজনের বা রচনার ভিত্তি। ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি

ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি, সৌন্দর্য্যানুভূতি, ধর্ম্মানুভূতি, মরমীদের অনুভূতি প্রত্যেকটির সহিত দার্শনিকের পরিচয় আবশ্যক ; এদের ভিতর সম্বন্ধ নির্ণয় করে' মানুষের সমষ্টিগত অনুভূতিকে একীভূত ও প্রণালীবদ্ধ করা এর কর্ত্তব্য। এতেই বোঝা যাবে যে, দর্শনে বিশেষ করে' বুদ্ধির কাজই প্রধান—বিশ্লেষণ, সম্বন্ধ, সমন্বয় এসব বুদ্ধির ক্রিয়া। কিন্তু এমন সব বিষয় স্বতঃই অন্তরে স্ফুরিত হয়, যার জ্ঞান অসাধারণ বিজ্ঞান লব্ধ হতে পারে না। এইজন্য এরূপ জ্ঞানের সহিত সাধারণ জ্ঞানের সমন্বয় করতে হয় না ; কারণ, বুদ্ধির (intellect) এরূপ অসামান্য জ্ঞান সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। অতএব এরূপ বিজ্ঞানের উপর বুদ্ধির বিশ্লেষণ বিচার সম্ভব নয়—এখানে অনুভূতিই একমাত্র স্বরূপনির্ণায়ক।

সত্যানুসন্ধানে এই জন্যই রহস্যবাদের (Mysticism and occultism) অবতারণা। রহস্যবাদে সত্তার প্রত্যেক স্তরটির সহিত পরিচয় ঘটে, এতে প্রত্যেক শক্তিটির স্বরূপ এবং ক্রিয়ার বিজ্ঞান উদ্ভাসিত হয়। রহস্যবাদে জ্ঞানের সম্যক্ স্বরূপ উদ্ধার করে, কিন্তু এর উপায় নিজস্ব ; কারণ, সত্তার সকল স্তরে অনুপ্রবেশ করা ভিন্ন এরূপ জ্ঞানের উদ্ধার অসম্ভব। মানুষের অনুভবের তারতম্য আছে। এইজন্যই অতি গভীর সত্যগুলি সত্তার কোন নিগূঢ় প্রদেশ হতে উদ্ভূত, অনাদৃত ও পরিত্যক্ত হয়। বিশেষতঃ, সে সত্যগুলিকে বোঝবার অন্য উপায় থাকে না। রহস্যবাদ এজন্যই রহস্যাবৃত। মানুষ যখন অধিমানস ও অতিমানস স্তরে স্বাধীনভাবে বিচরণ করবে এবং সত্তার সকল স্তরের সহিত পরিচিত হবে সরল ও স্বাভাবিক ভাবে, তখন তার কোন সংশয় থাকবে না। রহস্যবাদ গভীর রহস্যগুলিকে অনাবৃত করে' মানুষের বিরাট্ প্রজ্ঞার ও শক্তির পরিচয় দেয়।

তন্ত্রশাস্ত্রের এদিকে একটা কৃতকার্য্যতা আছে। এর প্রণালী দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণ নয়—এর প্রণালী অন্তরে অনুপ্রবেশ এবং গভীর সত্যের

অপরোক্ষ জ্ঞান। দার্শনিক অপরোক্ষ জ্ঞানের কথা বললেও, স্বরূপের উদ্বোধন করে না, এ কাজও তার নয়। তন্ত্রকে আর্যবি… বলা হয় এইজন্য যে, তন্ত্র অপরোক্ষ জ্ঞানের শুভ্র আলোক সত্তার সকল স্তর প্রকাশ করে। শিব-জ্যোতিঃতে প্রতিষ্ঠাই ইহার কাম্য। অন্তরের গহন প্রদেশে এই শিব-জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হয়ে অধিমানস উজ্জ্বলিত করে এবং সত্তার স্বচ্ছতা ও ঔজ্জ্বল্য আনয়ন করে। মানুষের বিরাট্ অন্তঃসত্তার একাংশের সহিত মাত্র তা… সাধারণ জ্ঞানে পরিচয়, উচ্চমানস ও অধিমানস জ্ঞানদৃষ্টি তার নেই বা… ঊর্দ্ধ-জ্যোতিঃ ও অধঃজ্যোতি তার নিকট প্রকাশিত হয় না।

একই জ্যোতিঃধারায় অন্তর প্লাবিত হলেও, সঙ্কোচবৃত্তির জ… অধিমানস ও ঊর্দ্ধমানস জ্ঞান আমাদের নিকট অপরিজ্ঞাত। য… সিদ্ধি ভূমিকায় সাধক অধিরূঢ় হয়, তখন তার সমস্ত সত্তাটি শি… জ্যোতিঃতে পূর্ণ হয়—একই শিব-জ্যোতিঃ স্তরবিশেষে প্রতিফ… হয়ে নানাবিধ উন্মেষ সঞ্চার করে, নানাবিধ জ্ঞান ও ভাবধারার … করে। সাধকের অধঃপ্রকৃতি জ্যোতিঃসম্পন্ন হলে এবং ঊর্দ্ধপ্রকৃতির তেজোময় সত্তার উদ্বোধন হলে দিব্য-জীবন লাভ ও ব্রাহ্মী প্রতি… হয়। এ তার স্বভাবে নিহিত। স্বভাব পূর্ণরূপে মথিত হয়ে উজ্জ… আলোকে অভিষিক্ত হলে সাধকের যে অন্তর্নিহিত জ্যোতির্মার্গ লাভ হয়, তার স্থিতি-কেন্দ্র পরমজ্যোতিঃ—ঊর্দ্ধে ও অধে। এই জ্যোতির্মার্গে বিচরণ করলে সে অনুভব করে যে, এক মহান দীপ্তি সর্বত্র বিরাজিত। প্রথমে মনে হয় ঊর্দ্ধে দীপ্তি, অধে দীপ্তি, অন্তরে দীপ্তি, বাহিরে দীপ্তি, অবশেষে এই দীপ্তি এক অশেষ ও অখণ্ড দীপ্তিরূপে অনুভূত হয়। ঊর্দ্ধ, অধঃ, অন্তঃশূন্য ও বহিঃশূন্য দীপ্তি। ঊর্দ্ধ অধঃ, অন্ত ও বহিঃ, "এই বিভাগ আমাদের মানস সত্তাকে অবলম্বন করে বলা হয়।

বস্তুতঃ, তন্ত্রের এক বিশেষ যোগ্যতা হচ্ছে সত্তার সব স্তরে অলৌকিক জ্ঞান-সঞ্চার করা—যা' সাধারণ মনোবিজ্ঞানে পাওয়া যায় না। এজন্যই তন্ত্র-সাধনার উৎকর্ষ। এ শুধু তন্ত্রেরই বৈশিষ্ট্য নয়। সত্যের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারের জন্য যোগের অবতারণা হয়েছে এবং পতঞ্জলি এই যোগেরই বিশেষ বিজ্ঞান প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তা হলেও, তন্ত্রের যোগদর্শন হতে পতঞ্জলির বৈশিষ্ট্য আছে। সমাধিলব্ধ প্রজ্ঞা সকলেরই অভীপ্সিত। পতঞ্জলি এর উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। আত্মজ্ঞান, বিবেকখ্যাতি, ধর্ম্মমেঘ সমাধিতে পতঞ্জলির বিশেষ নিষ্ঠা স্থাপন করেছেন—লক্ষ্য পুরুষাববোধ। তন্ত্র কিন্তু পুরুষাববোধকে গ্রহণ করলেও, তার প্রধান লক্ষ্য অন্তর সত্তার পূর্ণ সন্ধান—শুধু সমাধিজ প্রজ্ঞা দ্বারা আত্মা বা পুরুষকে জানা নয়, অন্তরের সকল স্তরের শক্তি ও স্বরূপের জ্ঞান, অধিমানস ও অতিমানস শক্তির বিজ্ঞান এবং এই শক্তির এমন সমাবেশ করা যাতে বিশ্ববিজ্ঞান ও শিব-শক্তি ক্রিয়াশীল হয়। শক্তির লয় নয়, শক্তির পূর্ণবিকাশ তন্ত্রের লক্ষ্য। বিকাশ দিব্য শক্তির, লয় মানুষী শক্তির—শিব-ভূমিকায় অবশেষে পরম স্থিতি। পরম স্থিতিকে অবলম্বন করে দৈবীশক্তির বিকাশ সম্ভব—সাধনার লক্ষ্য অনুযায়ী সিদ্ধি। সত্তার সকল সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে তাকে ক্রিয়াশীল করা তন্ত্রের অভিপ্রেত। পরোক্ষ জ্ঞানে বিশ্বাস স্থাপন না করে' সত্তার এবং তারও উপর স্তরের অপরোক্ষ জ্ঞানের আলোকসম্পাত করে' কেন্দ্রে কেন্দ্রে শক্তির উদ্বোধন তন্ত্র-সাধনার বিশেষত্ব।

সত্যিকার দিব্য প্রজ্ঞা বা দিব্যদর্শন শুধু বুদ্ধিরই বিশ্লেষণ করে না অথবা একটি বিজ্ঞান রচনা করে না, পরন্তু সত্তাকে দিব্যজ্ঞানে উদ্ভাসিত করে। এ শুধু অজানিত এবং অদৃশ্যের বুদ্ধিসম্পাতক জ্ঞান নহে, এ চেতনা বিশ্বগ ও বিশ্বাতীত মহত্ত্বের ও গভীরতার দীপ্ত অনুভব। এ শুধু ভাবাবেশ নহে—এ জ্ঞান, এ প্রজ্ঞান।

যে সব সূক্ষ্মশক্তি আমাদের অন্তরে এবং বিশ্বের অন্তরে ক্রিয়াশীল, তার সকল জ্ঞান এই দিবা বিজ্ঞানে স্ফূর্ত্ত হয়। এইজন্যই তন্ত্রশাস্ত্র একাধারে দর্শন ও রহস্যবিজ্ঞান—অধ্যাত্মজ্ঞানের পরম পরিপূর্ত্তি। অধ্যাত্মজীবনে এই গুপ্ত জ্ঞানভাণ্ডারের সহিত পরিচিতি ঘটে, যা আর কোন প্রকারে আমাদের মানসলোকে প্রবেশ করতে পারে না। প্রকৃতির সূক্ষ্মশক্তিও তার ক্রিয়াবিজ্ঞানের কৌশল প্রকাশ করতে সমর্থ হয় না। এইজন্যই রহস্য-বিজ্ঞানকে কাল্পনিক বলে মনে হয়। কিন্তু এ সহজলভ্য নয় বলেই এ সত্য নয়, এ হ'তে পারে না। ইহার অস্তিত্বও যেমন সত্য, ইহার ক্রিয়াও তেমনই নিশ্চিত। অধ্যাত্মজীবনে অধিরোহণে এই বিজ্ঞানের সহিত পরিচিতি, দিব্যজ্ঞানের এবং দিব্য-শক্তির সঞ্চার। দিব্যজ্ঞানই দিব্যশক্তির উৎস। এখানে এই মর্ত্ত্যে জীবন তার অপরূপ সৌন্দর্য্যে, অপরিমেয় শক্তিতে, অপূর্ব্ব সৃজনকৌশলে, দিব্যদ্যুতিতে, আনন্দের অরুণালোকে স্ফূর্ত্ত হয়। এ কল্পনা নয়, এ অনুভূত, সত্য।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সহিত রহস্যবাদের নিগূঢ় সম্বন্ধ; কিন্তু শক্তির অপপ্রয়োগ জন্য রহস্যবাদের অনাদর হয়েছে। যে শক্তি রহস্য-বিজ্ঞান উদ্বোধিত করে, যোগীরা তাকে দিব্যতর করতে পারেন। এ ইন্দ্রজাল নয়; এ দিব্যজ্ঞানে শক্তিকে উদ্বোধিত করে ক্রিয়াশীল করবার পরম কৌশল। এ বিজ্ঞান প্রচলিত হলে মানব-সমাজ প্রভূত অধ্যাত্মসম্পদে সম্পদশালী হবে।

শক্তির উন্মেষ ও ক্রিয়াকে পূর্ণরূপে অনুসরণ না করলে, এর আধ্যাত্ম অবদান সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। মানুষ অভ্যাসের দ্বারা পরিচালিত; পূর্ব্বসংস্কার ও অভ্যাস সহসা দূরীভূত হয় না। এজন্যই সাধারণতঃ সকলের মধ্যে রহস্য-বিজ্ঞান ও শক্তি ক্রিয়াশীল হয় না। অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও আত্মনিবেদন যেখানে সহজ ও স্বাভাবিক, অধ্যাত্মশক্তির স্বতঃ

উৎসরিত, প্রবাহ সেখানে রুদ্ধ হয় না। এ অন্তরতম কেন্দ্র-সত্তাকে অভিভূত করে' দিব্য শোভায় ও ঔজ্জ্বল্যে প্রকাশিত হয় এবং ধীরে ধীরে অন্তর সত্তায় ভাগবতানুভূতি জাগিয়ে তোলে এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করে। সমস্ত সত্তাটি ভাগবত ছন্দে ও স্পন্দনে পরিচালিত হয়। ভাগবতী জ্যোতিঃতে হৃদয়কেন্দ্র উদ্ভাসিত না হলে দিব্যজ্ঞান ও শক্তি স্পর্শ করে না এবং সত্তাকে অবিকৃত করে না। সাধারণতঃ, অধ্যাত্মবিজ্ঞানে হয় গভীর ভাবানুভূতি, না হয় সৌন্দর্য্য বা মঙ্গলের অনুভূতি—এসব অনুভূতি উচ্চতর মানস সংবেদ; ইহা অতীন্দ্রিয় জগতের সুষমায় ও মঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত করে। এই অলৌকিক বিজ্ঞান অন্তরে উজ্জ্বল সত্য ও সত্তার গৈরিক প্রকাশের সহিত পরিচয় করায়। সাধারণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান আমাদের কাছে সত্য ও সুন্দরের ধারণা উপস্থিত করলেও, জীবনের সকল স্তরে দিব্য সুষমা জাগিয়ে তোলে না।

অলৌকিক বিজ্ঞান সত্তার গভীরতম শক্তিগুলিকে জাগ্রত করে এবং সমস্ত সত্তাকে আনন্দে সিঞ্চিত করে ও অধ্যাত্মছন্দে অনুপ্রাণিত করে। বিশ্বের প্রতি ঘটনার ভিতরে গভীর অর্থ অনুভূত হয়। সমস্তই যেন দিব্যালোকে সুস্পষ্ট হয়। যা প্রথমে দূরে অনুভূত হত, তা হয় নিকটতম। সমস্ত সত্তার সহিত একটা আত্মীয়তা বোধের স্ফুরণ হয় এবং সমস্তই যেন জীবন্ত, বিজ্ঞানালোকে সুস্পষ্ট এবং আনন্দস্নাত বলে মনে হয়। রহস্য-বিজ্ঞান (occultism) তিনটি কাজ করে: (১) আমাদের গুপ্ত সত্তাকে জাগ্রত করে; (২) অন্তর ও বহিঃসত্তার ভিতর নিগূঢ় সম্বন্ধ প্রকাশ করে; (৩) আমাদের হৃদ্‌গত কেন্দ্র-সত্তাকে স্ফূর্ত্ত করে—এই কেন্দ্রসত্তায় দিব্য ইচ্ছা ও ক্রিয়ার সুস্পষ্ট জ্ঞান হয়।

অধ্যাত্মবিজ্ঞান ঈশ্বরের দিকে অন্তর্ম্মুখী আকর্ষণ। রহস্য-বিজ্ঞান ইহার স্বাভাবিক পরিণতি (fruition)। অধ্যাত্মস্পৃহায় এর স্বাভাবিক

জাগরণ। এ স্ফূর্ত্ত হয় যখন আমাদের সত্তার তমিস্রা-চাঞ্চল্য দূরীভূত হয় এবং সত্তা উজ্জ্বল ও রমণীয় হয়ে ওঠে।

দার্শনিক প্রজ্ঞা বা মানসিক জ্ঞান সার সত্যগুলিকে বুঝতে চেষ্টা করে—এই অলৌকিক শক্তি এবং রহস্যকে অনুভব করতে নাও পারে। সত্যানুভূতি এখানে শক্তিসঞ্চার নাও করতে পারে। যখন সত্যের শক্তি উদ্বোধিত হয়, তখন সমস্ত সত্তা এ শক্তি অধিকার করে। শুধু বিজ্ঞান বা মনই এর দ্বারা প্রভাবিত হয় না, সত্তার অন্যান্য অংশও অধিকৃত হয়। সত্তার সকল স্তরের মধ্যে এমন অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে যে, কোন শক্তি কোনও এক অংশে অবতরণ ক'রলে, ইহা সমস্ত সত্তাকেই অধিকার করে' থাকে—বিশ্বমূর্চ্ছনায় তখন সমস্ত সত্তাটি স্ফূর্ত্ত হয়।

সত্যানুভূতি সত্তার অন্তর্নিহিত শক্তিগুলিকে জাগ্রত করে' নিখিল বিশ্বের অন্তরের দৈবী ছন্দে অনুপ্রাণিত হয়। এখানে মানুষ তার অতি-মানসিক শক্তির সহিত পরিচিত হয় এবং ভাগবত প্রেরণায় চালিত হয়। দর্শন প্রজ্ঞা দেয় এবং কখনও কখনও দিব্য আলোকের লহরীমালা উদ্ভাসিত করে। দিব্যশক্তি, দিব্যপ্রজ্ঞা এবং দিব্যসত্তা একত্রে অবস্থিতি করে। আমাদের নব অধ্যাত্মজন্ম সম্ভব হয় না, যতক্ষণ না আমরা এই দিব্যজীবনের সকল রূপকে আহ্বান করি এবং অন্তরে গ্রহণ ক'রে সমস্ত সত্তাকে সিঞ্চিত না করি। অধ্যাত্মজীবন শুধু সত্যের অনুভূতি নয়—এ জীবনের পূর্ণ গঠন, নবীন উদ্বোধন।

রহস্য-বিজ্ঞান চেতনার শুদ্ধ বিকাশকেই অধ্যাত্ম-জীবনের পরম প্রকাশ বলে গ্রহণ করে না। এ বিজ্ঞান আহ্বান করে সেই নিগূঢ় শক্তি, যাতে আমাদের জীবন দিব্যছন্দে লীলায়িত হয় এবং দিব্যগতিতে উদ্বোধিত হয়। হয়তো এই আদর্শ এখনও মানুষের জীবনে সম্পূর্ণরূপে অনুবাদিত হয়নি; কেননা, মানুষের ধী ও কল্পনা এদিকে তত কার্য্যকরী হয়নি এবং সম্পূর্ণরূপে দিব্যশক্তির আবাহন করেনি। মানুষের অভিব্যক্তি

এখনও মানসস্তরেই আবদ্ধ। অতিমানস বোধসত্তায় ও দিব্যশক্তিতে মানুষ আজও জাগ্রত হয়নি। মানুষ এখনও অধ্যাত্মসত্তা সম্বন্ধে পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হয় নি, এখনও তার অভিব্যক্তি দিব্যালোকে উজ্জ্বল হয়নি। রহস্যবাদ মানুষের ভিতরে এই দিব্য পরিণতি সংগঠন করতে চায়।

রহস্যবাদ অন্তঃসত্তাকে নমনীয় ও রমণীয় করতে এবং প্রতি মুহূর্তে নব নব আনন্দে নবীন উদ্বোধনে তৎপর। মানুষ পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হয়নি; কারণ, তার কল্পনা এদিকে জাগ্রত হয় নি এবং অধ্যাত্মশক্তি সত্তার সব স্তরে প্রবিষ্ট হয়নি। মানব অধ্যাত্মশক্তির কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সংশয়াচ্ছন্ন; মানবের অভিব্যক্তি এখনও প্রাণ ও মানস স্তরে বদ্ধ, অধ্যাত্ম-সত্তায় মানুষ এখনও পূর্ণ জাগ্রত হয়নি। অধ্যাত্ম-চেতনা সুস্পষ্টরূপে আমাদের এখনও স্ফুট হয়নি।

রহস্যবাদ এই চেতনার অস্ফুট প্রকাশকে স্ফুট করতে চায়, এর অপ্রতিহত শক্তিকে সৃষ্টির পর্য্যায়ে অনুভব করতে চায় সকল বিরুদ্ধ শক্তিকে দূরীভূত করে'। রহস্যবিজ্ঞান অভিব্যক্তির এক উর্দ্ধ ছন্দ ও পর্য্যায় প্রকাশ করে।

রহস্যবিজ্ঞানের প্রধান আকর্ষণ এই যে, ইহা আমাদের সামনে অধিকতর জীবনীশক্তি, প্রসারিত সত্তা, দিব্য শক্তি ও দিব্য জ্ঞান উপস্থিত করে। সাধক অধ্যাত্মগতির উৎস অনুভব করে এবং তার প্রোজ্জ্বলিত সত্তার সহিত পরিচিত হয়। অধ্যাত্মশক্তি অন্তরের লুপ্তশক্তিকে জাগ্রত করে' নবীনতার সঞ্চার করে। আত্মনিবেদন সাধককে সঠিক চালিত করে। এই সাধনায় শক্তি সমস্ত সত্তাকে আলোড়িত করে, জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার এবং ইচ্ছার অফুরন্ত কেন্দ্র উদ্ঘাটিত করে। রহস্য-বিজ্ঞান আমাদের সত্তা, মনের ও অতিমানস জ্ঞানের বিকাশ করে। সাধারণ মনোবিজ্ঞানের এখানে প্রবেশ নেই; অথচ উজ্জ্বল সত্য এই অন্তরগুহায়ই নিহিত। রহস্য-বিজ্ঞান এই গভীর গহনে প্রবেশ করে' সত্যের উদ্ধার করে।

দার্শনিক জেম্‌স বলেছেন, "অধ্যাত্মবিজ্ঞানের কার্য্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত সুপ্ত মনের শব্দহীন গভীরতা হতে উত্থিত হয়।" মানসজ্ঞানের সীমা উত্তীর্ণ হলেই রহস্য-বিজ্ঞানের অনুপ্রেরণা কার্য্যকরী হয়।

রহস্য-বিদ্যা সত্তার সকল স্তরের উজ্জ্বল বিজ্ঞান বিকাশ করে—প্রাণে, মনে, বিজ্ঞানে, এমন কি শরীরের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত আছে যে তেজোময় সত্তা তার পরিচয় দেয়। শুধু তাই নয়, যে সব সূক্ষ্ম তেজোময় সত্তা আমাদের ঘিরে আছে এবং আমাদের জ্ঞানের অতীত হয়ে আমাদের জ্ঞান ও শক্তিকে উদ্বোধিত করে' থাকে, তাদেরও পরিচয় করিয়ে দেয়। এই রহস্যময় জগতে নানাবিধ সত্তা কার্য্যকরী। শক্তির সম্ভূতির ক্রিয়া ও স্পর্শ এখানেই অনুভূত হয়। রহস্যবিজ্ঞান সাধককে অতিমানসের উচ্চতায় ও অধিমানসের গভীরতায় প্রবিষ্ট করিয়ে অধ্যাত্মসম্পদে পূর্ণ করে। জ্ঞান এখানে পূর্ণ অনুভূতি, জীবনীশক্তি লীলায়িত, সত্তা ছন্দোবদ্ধ। অধ্যাত্ম-জীবন শুধু উজ্জ্বলতার স্ফূর্ত্তি নয়—অমৃতের বিকাশ, সত্তার পূর্ণতা। অধ্যাত্মবিজ্ঞান জড় ও চিন্ময়ের, প্রাণ ও মনের, আত্মার ও অনাত্মার কোনরূপ দ্বন্দ্বই স্বীকার করে না; এর সার্থকতা হচ্ছে সকল দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে' সর্ব্বত্র চৈতন্য ও অধ্যাত্মশক্তি অধিকার ও সাক্ষাৎকার করা। অতএব রহস্যবাদ যেমনি তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বকে (dualism) প্রত্যাখান করে, তেমনি কেবল অদ্বৈত বিজ্ঞানকেও আমল দেয় না। এর কাজ হচ্ছে, তাত্ত্বিক অদ্বৈতস্বরূপকে রক্ষা করেও, সৃষ্টির ও প্রকাশের সব স্তরে শক্তির নৃত্যকে অনুভব ও বরণ করা এবং কার্য্যকরী (actual) জ্ঞানের সকল দ্বন্দ্বকে দূর করা। জড়ের ভিতর চেতনার রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করাতেই এর অত্যন্ত প্রীতি। ইহা ঘোষণা করে বিরোধী (alien) জগতে চেতনার নিশ্চিত বিজয় ও নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা। চেতনার সমুজ্জ্বলিত সত্তায় প্রতিষ্ঠ হয়ে চেতনা-স্বরূপ হওয়া অধ্যাত্মজীবনের চরম পরিণতি;

কিন্তু জড়ত্বের ভিতর চেতনাকে প্রতিষ্ঠা করা, জড়তার তমিস্রা ও চাঞ্চল্যের ভিতর জ্ঞানারুণের কিরণসম্পাত করা ও আনন্দের সাবলীল ছন্দ অধ্যাত্মজীবনে জাগিয়ে তোলা রহস্যবিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর পরিণতি; এ আপাতঃ অসম্ভব সম্ভব হয় জড়ের নমনীয়তা হতে, প্রকৃতির স্তরের দীপ্তি হতে। এ শুধু একটা সম্ভাবনা নয়, জড়ের সকল রুক্ষতাকে দূরীভূত করে রহস্যবাদ এ সম্ভাবনাকে সত্যে পরিণত করে। জড় মূলতঃ জড় নয়—এ চেতনার অগ্রহণশীলতা, অক্রিয়তা ও স্তব্ধতা (passivity)। এ অক্রিয়তা অতীন্দ্রিয় সাক্ষিরূপতা বা একরূপতা নয়, এ অক্রিয়তা স্তব্ধ প্রকাশকতা।

ধর্ম্ম, শিল্পকলার সহিতও রহস্যবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। শিল্পীকে রহস্যবিজ্ঞান এক অভিনব দৃষ্টিসম্পন্ন করে, যাতে আন্তর সৌন্দর্য্য ও মহিমা অনুভব করা যায়। এ মানুষের সৃজনপ্রেরণাকে স্ফূর্ত্ত করে' নবীন ছন্দে ও গতিতে চালিত করে। রহস্যবাদ সৃজন-সংবেগে সাধক-শিল্পীকে আনন্দাভিষিক্ত করে। এক্ষেত্রে সৃজনশক্তি ও প্রেরণা সরল সহজভাবে চালিত হয়, এতটুকু সজ্ঞান ইচ্ছা তাতে থাকে না। ইচ্ছাপূর্ব্বক সৃষ্টি ও সহজ স্বভাব বশে সৃষ্টির মধ্যে ভেদ আছে। প্রথমটিতে ইচ্ছা কোন কিছুকে অবলম্বন ও লক্ষ্য করে' চালিত হয়, দ্বিতীয়টিতে সৃজনবেগ অগোচরেই যেন সৃজন-বিকাশের দিকে স্বাভাবিকরূপে ধাবিত হয়। হৃদয়-কন্দর হতে সৃজন-সংবেগ তখনই মূর্চ্ছিত হয়, যখন সাধক সঠিক বিশ্বছন্দে অনুপ্রাণিত হয়। এই বিশ্বছন্দে অনুপ্রাণিত শিল্পী সহজেই প্রবেশ করে বিশ্বপ্রকৃতির গভীরতম গহনে, যেখানে সৌন্দর্য্য স্বপ্রতিষ্ঠ। এ অলৌকিক দৃষ্টি দিব্যভাবোন্মত্ততায় সৌন্দর্য্যশ্রীকে অনুভব করে' অপূর্ব্ব সৃজনবেগ জাগিয়ে তোলে। প্রাণস্তরের সৌন্দর্য্য, মানসস্তরের সৌন্দর্য্য, অধ্যাত্ম সৌন্দর্য্যের পরিচয় প্রকৃতির ঊর্দ্ধজগতে স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে। অলৌকিক বিজ্ঞানসম্পন্ন

পুরুষের কাছে যে সৃষ্টি বীজ ও বস্তুর সারস্বরূপরূপ তা উদ্ঘাটিত হয়। এই অলৌকিক বিজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ প্রত্যেক বস্তুর সার স্বরূপটি (individuality) অনুভব করেন। এই স্বরূপটি দিব্যাস্তিত্বের প্রতিচ্ছায়া। উজ্জ্বল শ্রী, কমনীয় অবস্থিতি (delicate pose), কম্পিত সংবেগ (vibrative radiations) অন্তরলোকে অনুভূত হয় এবং এইজন্যই সাধকের সৃজন-প্রতিভার বিকাশ হয় উচ্চগ্রামে। এই সৃজন-দৃষ্টি বিশ্বাস্তিত্বের মূলে হয় প্রসারিত। অলৌকিক জ্ঞান শিল্পীকে সৃষ্টির অন্তরের গভীর সংবেদনা ও মূলীভূত প্রেরণার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়—যা' সে শিল্পে রূপ দেয়। এইভাবেই শিল্পী সূক্ষ্ম জগতের রূপ ও সঙ্গতি ফুটিয়ে তোলে। অতীন্দ্রিয় সৃষ্টি দেয় সৃজনের অসীম শক্তি।

আলৌকিক বিজ্ঞানবিদের নিকট ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয়; কোন মতবাদ নিয়ে তার তৃপ্তি নয়; কারণ, বুদ্ধির বিশ্লেষণ তার বিষয় নয়। বুদ্ধির (intellect) অপেক্ষা অনেক উর্দ্ধ স্তর হতে সে পায় তার দীপ্তি ও প্রেরণা। সত্যের জ্যোতিঃ ও মহিমা তার প্রত্যক্ষীভূত। সত্যের শান্তি-বিধৃত শক্তির গৌরবময় অবস্থিতি তার নিত্য পরিচিত। সত্তার স্তরে স্তরে সে শক্তিরই মহিমা অনুভব করে এবং প্রকৃতি ও মনুষ্য জগৎ এমন কি তদূর্দ্ধ স্তরেরও উদ্বোধন ও ক্রিয়া সে দেখতে পায়। শক্তি সত্তার সব স্তরে এক রকমে ক্রিয়াশীল নয়। অতীন্দ্রিয় দর্শনের নিকট আলৌকিক বিশ্বে সত্তার নানা স্তর, উচ্চাবচ উদ্ঘাটিত হয়। এখানে স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে সৌন্দর্য্যের শ্রী ও বিজ্ঞানের দ্যুতি। দিব্যশক্তি সর্ব্বত্র একরূপেই ক্রিয়াশীল হয় না; বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন সত্তার অস্তিত্ব অলৌকিক বিজ্ঞানের বিষয়,—এই পর্য্যায়ক্রমে শ্রী, ধী, শক্তি এবং তাদের আধার-সত্তা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়।

অলৌকিক জ্ঞান প্রাকৃত অপ্রাকৃতের সমান অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং প্রকৃতির ভিতর অপ্রাকৃতের অনুসরণ স্পষ্টতঃ প্রকাশ করে।

প্রাকৃত শক্তি ও বিকাশ কখনই অস্বীকৃত হয় না—প্রাকৃতের ভিতর অপ্রাকৃতের সঞ্চার তার লক্ষ্য এবং তাকে অবলম্বন করে অপ্রাকৃতকে প্রাকৃতের ভিতর অবস্থান ও প্রতিষ্ঠা করাই তার বিশেষ কর্ত্তব্য। যে অজ্ঞানের যবনিকা এই ভেদ সৃষ্টি করেছে, তাকে দূরীভূত করে অপ্রাকৃতের সম্ভূতি-সম্পদে জীবনকে পূর্ণ করে। তন্ত্রের বিশেষত্বই এখানে। তন্ত্র যেমন শিবদ্যুতিকে জীবনে আহ্বান করেছে, তেমনি সম্ভূতির বিকাশ অন্নময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময় কোষও উদ্বোধন করেছে। এই অবরোহ ও আরোহ তন্ত্রের পরম কৌশল। এই বিশ্বময় অন্তর-দৃষ্টি এক দিব্যরহস্য উদ্ঘাটিত করে, বিশ্বচক্রের সকল ঘটনার ভিতর দিব্যশক্তির অনুপ্রেরণা অনুভব করে। ক্ষুদ্রও তার কাছে পরম রহস্যাবৃত। সকল সঞ্চার এক দিব্যালোকে অভিষিক্ত। সৃষ্টিকে ত্যাগ করে' নয়, সৃষ্টির ভিতর চেতনাকে পূর্ণ উদ্বোধিত করে' তার রমণীয় বিকাশ।

* *
*

বিদেহ ও জ্যোতির্দ্দেহ

তান্ত্রিক সাধনা মানুষের আন্তর-জীবনের সকল সম্ভাবনাকেই জাগিয়ে তোলে। অধ্যাত্মজীবনে আত্মার শরীরসম্বন্ধ ত্যাগ করে' বিদেহ হওয়াই পরম লক্ষ্য। শরীরের স্থূলতা ও জড়তা আত্মপ্রকাশের পথে পরম বাধা। তাই সাংখ্যে, বেদান্তে শরীরের—সূক্ষ্ম, স্থূল ও কারণের—সংস্পর্শশূন্য হওয়া হয়েছে পরম শ্রেয়ের রূপ। অধ্যাত্ম-জীবন একটা হেঁয়ালি মাত্র নয়; এতে আছে সুস্পষ্ট অনুভূতি ও দ্যোতনা, যাকে এ সত্য অবিসম্বাদিতরূপে উপস্থিত করে। সত্য সত্তার সূক্ষ্মতম স্বরূপ; আবরণ উন্মোচিত না হলে এর স্বরূপ পূর্ণরূপে বোধগম্য হয় না। এজন্য সকল সাধনায়ই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের আবরণ উন্মোচনের কথা আছে। আত্মা আন্তর-কেন্দ্রে কোষ দ্বারা আবৃত। তরবারির কোষোন্মুক্তির ন্যায় এ কোষ উন্মুক্ত হলে আত্মার মহিমার অনুভব। বিষয়-জ্ঞান সূক্ষ্ম বা কারণ যতই প্রোজ্জ্বল ও সূক্ষ্ম হউক, আত্মাকে অধিকৃত করতে পারে না। সাংখ্য ও বেদান্তের কথা এই।

তন্ত্রেও এ বিষয়ে মতভিন্নতা নেই—কারণ, তন্ত্রের শেষ অনুভূতি শিবতত্ত্বের। শিব পরম শান্ত জ্ঞানস্বরূপতা—কল্লোলহীন প্রশান্তি—অদ্বৈত তত্ত্ব। এ ভূমিকায় জীবের জীবত্ব থাকে না; কারণ, জীবত্ব তো চেতনার সঙ্কুচিত বৃত্তি—মুক্তিকামী চেতনা পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে ঊর্দ্ধগামী হয়ে সকল সঙ্কোচ লয় করে' শিবভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সঙ্কোচহীনতাই মুক্তি। ক্রমমুক্তিতে সঙ্কোচের ধীরে ধীরে অপসারণ, ক্রমশঃ ব্যাপকতর সত্তার স্বরূপে এবং অবশেষে নিরুপাধিক চেতনায় প্রতিষ্ঠা। বন্ধন চেতনার সঙ্কুচিত প্রকাশ; অসঙ্কুচিত প্রকাশ মুক্তি। এর অন্বেষণে চেতনায় প্রকাশের বিভিন্ন স্তরের পরিচিতি।

তন্ত্র বেদান্তের ন্যায় জীবব্রহ্মের অভিন্নতাবোধক ব্রহ্মাকারবৃত্তি উদ্বোধিত করে না। এর মার্গ যোগমার্গ—আন্তর-সত্তাকে মহাশক্তির সাহায্যে উন্মোচিত করে' কেন্দ্রে করে প্রতিষ্ঠিত। তন্ত্রমতে সম্প্রসারিত সত্বাই আমাদের জীবত্বের স্বরূপ। সঙ্কুচন অপসারিত হ'লে প্রকৃতির ঊর্দ্ধলোকে প্রতিষ্ঠা, প্রাকৃত বন্ধনের উন্মোচন।

সাংখ্যে প্রকৃতির সহিত পুরুষের বিবেকখ্যাতিপূর্ব্বক মুক্তির প্রতিষ্ঠা। সাংখ্যমতে জীবন্মুক্ত বিবেকসম্পন্ন পুরুষ। বিবেকের ঊর্দ্ধে পরা-বৈরাগ্য দ্বারা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে মগ্ন পুরুষের উত্থান হয় না। পূর্ণ বিবেক ও জ্ঞানে এই প্রতিষ্ঠা; এই প্রতিষ্ঠা হতেই প্রকৃতির অধিকার পায় লয়। চিদের অবসান ভোগ, আর চিদের জাগরণই তো মুক্তি। প্রকৃতির বন্ধনের উন্মোচনে পুরুষতত্ত্বে অবস্থান। বেদান্ত অভিন্নকার বৃত্তি উদ্বোধন করে, অজ্ঞানের ধ্বংস করে। কিন্তু নিরবছিন্ন বৃত্তি প্রারব্ধকর্ম্মের দ্বারা খণ্ডিত হয়। অবিদ্যা ধ্বংস হলেও, অবিদ্যালেশজনিত প্রারব্ধভোগ বেদান্তাচার্য্যেরা স্বীকার করেন। সাংখ্য ও বেদান্তে মুক্তি সদ্যমুক্তি; সদ্যমুক্তিতে দেহপাত। যাঁরা প্রারব্ধভোগের জন্য সদ্যশরীরপাত স্বীকার করেন না, তাঁরা জীবনমুক্তিকেও সদ্যমুক্তি বলেন। জীবনমুক্তিতে শরীরপাত না হলেও, শরীরে বা অন্তঃকরণের কোন অধিকার থাকে না। সকল অধিকারের লয় হয়, বিশ্বভ্রান্তি চিরকালের তরে লয় হয়। জীবনমুক্তি ও বিদেহমুক্তিতে জ্ঞানের দিক দিয়ে ভেদ নাই—ভেদ শুধু শরীর ও অন্তঃ-করণের সাময়িক স্থিতি নিয়ে। মুক্তি যখন জীব-ব্রহ্মৈক্যবোধ, তখন কোনরূপ সংঘাত মুক্তিভূমিকায় থাকতে পারে না; সংঘাতের কারণ অবিদ্যা ও তা' হতে উদ্ভূত সংস্কাররাজি এবং ব্যক্তিত্ব—সবই হয়ে যায় বিলীন। মুক্তি চেতনার নির্ব্বিশেষ প্রকাশ; কোন সবিশেষতার স্থান তাতে নাই। প্রারব্ধক্ষয়ে পূর্ণ বিদেহ ভাবপ্রাপ্তি। ব্যক্তিবিশেষের যখন সংস্কারের লয় হয়, তার ব্যক্তিত্বের ভাণও চিরকালের তরে

অপসারিত হয়—দেশ, কাল, কর্ম্ম, ঈশ্বর, অবিদ্যা সকলেরই হয় লয়। মানস ধারণায় এদের স্থান আছে, জ্ঞান-সূর্য্যের উদয়ে তা বিলীন হয় এরূপ অবস্থা স্বরূপ অবস্থা—স্বরূপ হলেও, সাধারণ বৃত্তি হতে এত ভিন্ন আমাদের মানস জ্ঞান এর ধারণা করতে পারে না। এরূপ স্থিতি সহিত মানসিক স্থিতির কোন তুলনাই হ'তে পারে না; মানসিক স্থি যতই শোভন ও সুন্দর হোক না কেন—উদার জ্ঞান, উচ্চ ভাব, বিশ্ব সঙ্গতিবোধ, অনাসক্ত কর্ম্ম, মঙ্গলের উদ্বোধন, এ সকল কিন্তু এই জ্ঞা প্রতিষ্ঠায় থাকে না, বিদেহ হলে থাকার সম্ভাবনাই ওঠে না।

তন্ত্রে জ্ঞানের চরমভূমিকায় শিবস্বরূপতার কথা থাকলেও, সে শিবরূপ অবস্থাতে বিশ্ব অঙ্গীকৃত হয়—চরমানুভূতিতে শক্তির বিল হয় না, বরং শক্তির পূর্ণ স্ফুরণ হয়—যে স্ফুরণে সমস্ত বিশ্বে শিববো জাগরিত হয়। লয়ে বিশ্ব বীজরূপে থাকে; কারণরূপে নিত্যই শক্তি শিবে অবস্থিত। মুক্তিতে সঙ্কোচ থাকে না; প্রসারিত চেতন ও শক্তি ক্রিয়াশীল হয়; বিশ্বের ও বিশ্বাতীত চেতনার সহিত অভিন্নতা প্রতিষ্ঠা হয়। শক্তি সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ উভয়েই অনুস্যুত— কোন বিরোধ নেই। সবিশেষ নির্ব্বিশেষেরই প্রকাশ। নির্ব্বিশেষ বিশেষের অভাব নয়। দেশে ও কালে নির্ব্বিশেষের স্ফুরণ। শিবে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ দুইই অঙ্গীভূত—এইজন্য শিবজ্ঞানে শক্তি সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ প্রত্যক্ষ হয়। নির্ব্বিশেষ অবস্থা নিত্য সম্ভাবন (potential), সবিশেষ কার্য্যকরী (actual) স্ফুরণ। এই দু অবস্থাই শিবে অবস্থিত ও অঙ্গীকৃত। শিবই তত্ত্ব (Real), তত্ত্বে শক্তি নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ রূপে নিত্য ক্রিয়াশীল।

তন্ত্র মতে পূর্ণজ্ঞানে অস্তিত্বের প্রকাশ হয় সকল স্তরের। এ জ্ঞা সাধারণ জ্ঞান হতে ভিন্ন—এ জ্ঞানে ভেদ থাকে না, ভেদবুদ্ধি বিলয় হয় এইজন্য এ জ্ঞানে এক তত্ত্বেরই প্রতিভাস। নির্ব্বিশেষ সবিশেষ

একই তত্ত্বের অবস্থাবিশেষ এবং পরস্পর অভিন্ন। সাধকের পূর্ব্বাবস্থা থাকে না, অতিমানসিক জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়—যা' কালের ক্রমিক স্বরূপে সঙ্কীর্ণ হয় না। এই অতিমানস জ্ঞানে জীবত্ব অপসারিত হয়, শিবের সহিত ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। এরূপ জ্ঞানসিদ্ধিই জীবনমুক্তি। জীবনমুক্ত পুরুষ পূর্ব্বসংস্কার হতে হয় মুক্ত। মায়ীয় মল, আণব মলের বিলয় হয়। সঙ্কুচনের অপসারণে দেশ, কাল, কর্ম্ম নিরপেক্ষ হয়ে মুক্ত পুরুষ বিচরণ করে। শৈবমতে মুক্তি বৃহত্তম সত্তার ও শক্তির জাগরণ। মহার্থমঞ্জরীতে আছে—সঙ্কোচবৃত্তির ও সত্তার স্থানে ব্যাপকতম বৃত্তি ও স্থিতি স্থাপনাই মুক্তি। এই শক্তি ও সত্তার সহিত অভিন্নতাবোধই জীবনমুক্তি (মহার্থমঞ্জরী)। এ শুধু জ্ঞানের পূর্ণ উদ্বোধন ও তুষ্ণীভাবে স্থিতি নয়—ইহা সত্তার এমনি উদ্বোধন যাতে থাকে অসীম জ্ঞানের সহিত শক্তির ছন্দের অপূর্ব্ব মিলন। এ বিষয়ে স্বচ্ছন্দতন্ত্র বলেছেন—পূর্ণরূপে জ্ঞানের স্থিতি যেখানে শক্তি সেখানে বিশ্রাম লাভ করে। জীবনমুক্তি বিবেক বলেছেন—এখানে অ-স্পৃষ্ট আমি-বোধের বিশ্রান্তি। এ কথা ঠিক যে, জীবনমুক্তিতে "অহং" ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিলয়—এই বিলয়ে কোথাও জাগ্রত হয় বিরাট্ ও সার্ব্বভৌমিক অহংসত্তা, কোথাও তার বিলয় হয়। এরও সামঞ্জস্য সম্ভব। কারণ, তন্ত্রমতে কার্য্য-ব্রহ্ম ও কারণ-ব্রহ্মে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নেই, অনুভূতির ক্রমোচ্চ বিকাশে ক্ষুদ্র অহং-এর স্থানে বিরাট্ অহংএর প্রতিষ্ঠা—তদূর্দ্ধে তা-ও থাকে না, যেহেতু শক্তির উন্মেষ ও আভাসের লয় হয় চেতনা পূর্ণরূপ কেন্দ্রীভূত হ'লে। অনুভব-ভূমিকার একটা অবস্থা হয় যেখানে কার্য্য ও কারণ ব্রহ্মানুভূতি হয় যৌগপদ্যরূপে এবং অভিন্নরূপে—এখানে জীবত্বের কোন ভাণই থাকে না, সিদ্ধ সাধক অনুভব করেন তার অপরিচ্ছিন্নতা ও সার্ব্বভৌমিকতা। এ ভূমিকাই জীবন্মুক্তিভূমিকা; এখানে জ্ঞানের ও সত্তার সব সঙ্কীর্ণতা লয় হয়। সাধক বিশ্বহিল্লোলের স্পন্দন

নিজেরই স্বরূপভূত বিকাশরূপেই দেখতে পান—শিবভিন্ন সত্তা কোথাও কিছু দেখেন না, এবং সে সত্তাও সে স্বয়ং। শান্তি ও উল্লাস দুয়েরই অনুভব হয়। শান্তির স্পন্দন পরমশিবে নিত্য। পরমশিবের শান্ত ও নিষ্ক্রিয় ভাব একটা অবস্থাবিশেষ, একে লয়ভূমিকা বলা যেতে পারে; কিন্তু শিবের চিন্ময় ভোগ ও অধিকার-ভূমিকা আছে। এদের পরস্পরের ভেদ কখনই হয় না। এরা অতীন্দ্রিয়, শিবে অভিন্নরূপে অঙ্গীকৃত। সিদ্ধ সাধক যত শিবভূমিকাপ্রাপ্ত হন, তাঁর ভিতর একদিকে যেমন অনবচ্ছিন্ন শান্তি ও স্থিতি প্রতিষ্ঠা হয়, অন্যদিকে তেমনি শক্তিক্রিয়া ও আনন্দ অবাধিতরূপে প্রকাশিত হয়। একই আধারে সিদ্ধ সাধক নিজ সত্তার অপৌরুষেয়ত্ব ও পৌরুষেয়ত্ব অনুভব করেন। জীবনমুক্ত পুরুষের সংস্কারাত্মক ব্যক্তিত্বের লয়ে ঈশ্বরত্বের ব্যাপকত্ব ও অপ্রতিহত ইচ্ছা ও শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়। সকল আধিকারিক পুরুষ শিবের ন্যায় বিশ্বাধিপত্য করতে পারেন না। এরূপ প্রকাশ নির্ভর করে তাঁর বাসনার অধিকারের উপর এবং তাঁর স্বরূপতার উপর (temperament)। সিদ্ধ সাধক শক্তির উন্মেষে জগদ্ব্যাপারে লিপ্ত হন না—কেহ হয়তো লয়ের দিকে অগ্রসর হন, কেহ কেন্দ্রস্থিত হয়ে শক্তির বিভূতির দিকে অগ্রসর হন। সিদ্ধ সাধকের কেন্দ্রাভিমুখীনতায় জ্ঞানের পরিসরতা ও শক্তির ব্যাপকতা উপস্থিত হয়; কিন্তু রুচি ও অধিকার অনুযায়ী কেহ শক্তির কোন বিশেষ বিকাশের দিকে ধাবিত হন, কেহ শিবময় স্থিতিতে লয় প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় শ্রেণীর সিদ্ধ সাধকেরা বিদেহ-ভাব প্রাপ্তির দিকে ধাবিত হন। শক্তিকে শিবে বা আত্মস্বরূপে বিলীন করে' পরম শান্তস্বরূপে উপনীত হন। বিদেহভাবারূঢ় পুরুষের শরীরের অনুবৃত্তি হয় না—সূক্ষ্ম ও কারণকে তুরীয়ে লয় করে' তাঁরা শিবৈক্য অবস্থা লাভ করেন।

বিদেহ পুরুষের কোন স্তরে প্রকাশ থাকে না, হতে পারে না যেহেতু বিকাশের মূলীভূত কারণ শক্তি সেখানে স্পন্দীভূত—শিবসত্তা

ক্তি আচ্ছন্ন। বিকাশের সব ভূমিকা ভেদ করে' সিদ্ধ সাধক শিব-স্থিতি প্রাপ্ত হন। এইরূপ লয় কিন্তু প্রাকৃত লয় নয়, প্রকৃতির ঊর্দ্ধে কোন তত্ত্বে য় নয়—ইহা সর্ব্বশেষ লয়, শিবত্বপ্রাপ্তি।

জীবনমুক্ত পুরুষ শিবৈক্য অবস্থা লাভ করলেও তা'তে শক্তি থাকে ন্মেষিত ও ক্রিয়াশীল। সকল মল অপগত হওয়ায় তিনি হন জ্যোতির্ম্ময় তেজোময়, শিবজ্যোতিঃতে দীপ্তিমান্। মহাশক্তির পূর্ণ বিকাশে বিশ্বের সকল স্তরের সহিত হয় তাঁর একাত্মবোধপ্রতিষ্ঠা এবং মহাশক্তির আশ্রয় হয়ে তিনি করেন শক্তিকে চালিত। তাঁর সমস্ত সত্তাটি হয় জ্ঞানে ভাসিত ও মহাশক্তিতে উদ্বুদ্ধ। শক্তিসিদ্ধ পুরুষের সত্তা হয় পূর্ণ রূপান্তরিত। প্রকৃতির ভিতর মহাশক্তির অবতরণে প্রকৃতির কমনীয়তা ও নময়ীয়তা জাগ্রত হয়—সত্ত্বশুদ্ধিতে সত্তা পূর্ণ হয়। সিদ্ধসাধক জ্যোতির্দ্দেহ প্রাপ্ত হন। মল উচ্ছেদ হলে, চেতনার দীপ্তিসকল সত্তায় ছড়িয়ে পড়ে—কোষে কোষে অবতরণ করে জ্যোতিশ্ছন্দ। ক্রমশঃই স্থূল শরীরবোধ যেন সূক্ষ্মাধারের বোধে পূর্ণ হয়—এমন কি, কারণাতীত ও কারণাধারের শক্তির সহিত এদের জ্ঞানতঃ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা হয় এবং শক্তির সম্পাতে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের পরিবর্ত্তন হয়—মায়ীয় ও আণব মল সংস্কার হতে মুক্ত হয়ে জ্যোতির্দ্দেহের বিকাশ হয়। এই জ্যোতির্দ্দেহের বিকাশ-শক্তি একমাত্র সিদ্ধ সাধকেই সম্ভব। এ সম্ভাবনা মহাশক্তিতেই আছে; শক্তির আধার হতে পারলে এ সম্ভাবনা কার্য্যকরী হয়। বিজ্ঞানকলায় এ সম্ভাবনা কার্য্যকরী হয় না, এ স্থান অতি উচ্চে হলেও, এখানেও সাধকের আণব মল বিদূরিত হয় না। একমাত্র মহাশক্তির অবতরণে এ অসম্ভব সম্ভব হয়, কিন্তু মহাশক্তির অবতরণের যোগ্যতা সকল আধার অর্জ্জন করতে পারে না। বিশুদ্ধতা এর একমাত্র হেতু নয়, হেতু মহাশক্তিকে পরিপূর্ণরূপে আধারে আহ্বান, শক্তির সহিত ঐক্য অনুভব করা এবং প্রকৃতিকে স্বেচ্ছায় পরিচালিত করা।

বেদান্তে প্রারব্ধভোগের কথা আছে—প্রারব্ধ কর্ম্মকাল ভোগ হয়নি, ভোগাবশেষ আছে। এই প্রারব্ধ জ্ঞানীর পক্ষে রচনা করে একটি পরিধি। জ্ঞানীর ভোগবৃত্তি না থাকলেও, তাঁর ভোগের পরিধি দেখতে পাওয়া যায়। প্রকৃতির ক্রিয়া হতে জ্ঞানী পূর্ণরূপে মুক্ত হলেও, কার্য্যতঃ তাঁর শরীরাদি প্রারব্ধভোগ করে থাকে।

তন্ত্র শক্তির অবতরণসাহায্যে প্রারব্ধকার্য্যের পরিধি হতে পূর্ণরূপে মুক্ত করতে চায়। সর্ব্বপ্রকার পরিধি দূরীভূত করে' এবং প্রকৃতিকে নমনীয় করে' শক্তি স্ববিকাশানুকূল দেহের আবির্ভাব করতে পারে। শক্তির সাহায্যে শিবতত্ত্বানুভূতি যতই জাগ্রত হয়, ততই প্রারব্ধ দূরীভূত হয় এবং শক্তি প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করে' জীবনমুক্ত পুরুষের শিবের ন্যায় স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করে।

তন্ত্রশাস্ত্রে শিবের পঞ্চকৃত্যকারিত্বের কথা বলা হয়েছে। এই কৃত্যকারিত্ব হচ্ছে সৃষ্টি, স্থিতি, বিলয়, সংহার, কৃপা, আর্ত্তি ও বিনাশ। প্রকৃতির পরিধি ও সঙ্কীর্ণতা হতে মুক্ত হলে শিবভাব স্থিত হয়। এই কৃত্যকারিত্বের অধিকার সিদ্ধসাধক ও জীবনমুক্তের হয়ে থাকে—তখন শিবের সর্ব্ব শক্তির আশ্রয় তিনি হয়ে থাকেন। এরূপ পুরুষ প্রকৃতির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব করতে পারেন ও করেন—এরূপ পুরুষই জ্যোতির্দ্দেহ ও শক্তিধর হয়েন। তন্ত্রসিদ্ধ সাধক বিভূতিসম্পন্ন হয়েন, এ বিভূতি দিব্য মহাশক্তির দ্যোতনীয় স্পন্দন। বিশ্বের প্রতি স্তরের সহিত তাঁর সত্তার অভিন্নবোধ সুস্পষ্ট বলে তন্ত্রসিদ্ধ সাধকের সত্তা হয় সর্ব্বত্র ক্রিয়াশীল। সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বান্তঃকরণ প্রতিভাসকত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রতিষ্ঠা দেয় শক্তি—শক্তি জ্ঞানধৃত। জ্যোতির্দ্দেহ পুরুষের কোথাও থাকে না এতটুকু সঙ্কোচ ; অন্তর্নিহিত শক্তি পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হয়—প্রাণের স্পন্দন হয় ব্যাপক। প্রাণে মহাপ্রাণ অনুপ্রবিষ্ট হয়, বিজ্ঞান বিশ্ববিজ্ঞানে সমুদ্ভাসিত হয়, সত্তা বিশ্বসত্তার সহিত ঐক্য লাভ করে।

এই সুস্পষ্ট ঐক্যবোধ জাগ্রত করে ঈশ্বরীয় বোধ, অপ্রতিহত জ্ঞান ও শক্তি। গতি হয় ঈশ্বরীয় গতি, জীবত্বের লয় হয় ঈশ্বরত্বের প্রতিষ্ঠায়। এই প্রতিষ্ঠার স্তর আছে। কোথাও শক্তি আচ্ছন্ন করে' সাময়িক ঈশ্বরীয় ভাব জাগিয়ে তোলে, কোথাও অভিন্নতার প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু যেখানে পূর্ণ জ্যোতিঃসম্পন্ন হয় সেখানে শিব-অভিন্নতা প্রতিষ্ঠা হয় স্থির। সেখানেই সর্বজ্ঞত্ব শক্তিমত্তা হয় সুস্পষ্ট ও সুসিদ্ধ।

দেশ ও কালের ব্যবধান সেখানে ক্রিয়াশীল হয় না। বিদেহ পুরুষ কালকে অতিক্রম করে—তাঁর অকালে অবস্থিতি। এই অকাল কালশূন্য। শিবস্বরূপ পুরুষে কাল কোনও রূপেই কার্য্যকরী হয় না—ক্রমিক বা অক্রমিকরূপে। এখানেই তন্ত্রমতে জীবনমুক্ত পুরুষ ও বিদেহ পুরুষের ভেদ। জীবনমুক্ত পুরুষে কালের জ্ঞান থাকে, বিদেহ পুরুষ কালাতীত এবং পূর্ণ অকাল। জীবনমুক্তের ক্রমিক কালের স্থলে অক্রমিক কালের ভাণ। তাঁর অতিমানসজ্ঞানে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও কারণাতীত বিশ্ব সমুদ্ভাসিত। কোথাও থাকে না অজ্ঞানের এতটুকু আবরণ। তাঁর দৃষ্টি পূর্ণ সমষ্টির দৃষ্টি, সমষ্টিকে আত্মস্বরূপবোধে তিনি জাগ্রত ও উদ্বোধিত করেন। ক্রমিক কালজ্ঞানের আবরণ অক্রমিক কালে নেই। পূর্ণ অক্রমিক কালের উদ্বোধনে অজ্ঞান ও কালের ব্যবধানের অপসারণ এবং বিশ্বের স্তরে স্তরে ঘটনা-প্রবাহের প্রকাশ। জীবনমুক্ত পুরুষ অকাল হয়েও অখণ্ড কালে শক্তির প্রকাশ দেখতে পান। সাধারণ মানসিক জ্ঞান হতে তাঁর মানসিক জ্ঞান বিশিষ্ট; তিনি ত্রিকালজ্ঞ, তিনি জ্যোতিঃস্নাত এবং বিজ্ঞানোদ্ভাসিত। শৈবদর্শনে জীবনমুক্ত পুরুষের স্বরূপ ঈশ্বরবৎ। তাঁর ব্যক্তিত্বের লোপ ঊর্দ্ধতর শিবময় প্রকাশে, কিন্তু কালে এবং দেশে আবদ্ধ ব্যক্তিত্ব হতে জীবনমুক্ত চিরতরে মুক্ত। তাঁর জ্ঞান বিশ্ব-বিকশিত, তাঁর আত্মা বিশ্বাত্মসত্ত্বা, সেখানে পরিচ্ছন্নতার বিরাম; অপরিচ্ছন্ন বলেই তাঁর জ্ঞান বিশ্বের কালচক্র (epochal cycles) অতীত হয়ে বিশ্বকে দেখে।

বস্তুতঃ, জীবনমুক্ত পঞ্চকঞ্চুক হতে নিবৃত্ত।

পঞ্চকঞ্চুক জ্ঞানাবরণের কারণ। পঞ্চকঞ্চুক অবিদ্যা, কলা, রাগ, কাল এবং নিয়তি। অসীম জ্ঞানকে সসীম করে অবিদ্যা—কলাশক্তি এবং ক্রিয়ার সসীমতা। আসক্তি ও আকর্ষণই রাগ। নিয়তি প্রত্যেক পদার্থের রূপ এবং কার্য্যনির্ণয়কারক—এই জন্যই আগুনের দাহিকাশক্তি জলের শৈত্যশক্তি। কালে পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ।

সিদ্ধ সাধক এই পঞ্চকঞ্চুক হতে মুক্ত। তাঁর দৃষ্টি অপরিচ্ছন্ন, শক্তি অপ্রতিহত, কাল ও নিয়তি হতে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। এই পঞ্চকঞ্চুক হতে তিনি নিবৃত্তি হওয়ায় তাঁর পূর্ব্বস্বরূপ পরিবর্ত্তিত হয় এবং তিনি শিবময় স্থিতি লাভ করেন। এই পঞ্চকঞ্চুক হতে উন্মুক্ত মানুষই স্বাধীন। তখনই তিনি অনুভব করেন অন্তরাত্মার এক শিবময় স্বরূপ। শিবজ্যোতিঃ সঞ্চরণে চিত্তের সঙ্কীর্ণতার মুক্তি এবং চিত্তের জ্যোতির্দ্ধের অনুপ্রবেশ। শিবজ্যোতিঃসম্পন্ন পুরুষের সত্তা জ্যোতিঃসত্তা, কর্ম্মে তাঁর মহাশক্তির উন্মেষ। আধারে নবীন, উজ্জ্বল সত্তার জাগরণ এবং মহাপ্রকৃতির স্পন্দনের উদ্বোধন, এরূপ সিদ্ধ সাধকের বিশ্বচ্ছন্দের তালে শক্তি জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আনন্দের প্রকাশ। এঁরাই বিশ্বাধারে নামিয়ে আনেন সত্যের সংবাদ, বিজ্ঞানের দ্যুতি ও আনন্দের স্ফূর্ত্তি। এঁরা লাভ করেন স্বাধীন স্বতন্ত্র গতি সত্তার ঊর্দ্ধতম স্তরে; বস্তুতঃ, তাঁদের সত্তা তখন ঊর্দ্ধে, অধে, অতিমানসে, অধিমানসে অনুভব করে এক মহাশক্তির প্রকাশকম্পন এবং জ্যোতিশ্ছন্দে প্রাণ-মন-বিজ্ঞান-আনন্দের উজ্জ্বল প্রকাশ।

শক্তি জীব-ব্রহ্মভেদ সৃষ্টি করে, শক্তিই তাদের একত্ব প্রতিপাদন করে। এই জন্য তন্ত্রে উপাসনার দুটি রূপ দেখতে পাওয়া যায়—এক শক্তিকে উপাসনা, আর এক শিবের সহিত অভিন্নবোধে উপাসনা। শক্তি-উপাসনায় ভক্তিতে প্রতিষ্ঠা। মহাশক্তিকে আশ্রয় করে' তাঁরই কৃপায় ও অনুগ্রহে জ্ঞান ও শক্তিকে লাভ। কিন্তু এ উপাসনায় জীবে বিরা

শক্তির আবির্ভাব হলেও, উপাসকের পূর্ণ অভিন্নভাব প্রতিষ্ঠা হয় না। জীব তার তেজোময় সত্তার অনুভব করলেও এবং শক্তি অনুপ্রবিষ্ট হলেও, তার ব্যক্তিত্বের বিলয় হয় না। শক্তিতে আত্মসমর্পণ করলে অনুভূতির প্রাথমিক অবস্থায় শক্তির সহিত তাদাত্ম্য পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা হয় না। ভক্তির আতিশয্যে সাময়িক তাদাত্ম্য হয়, কিন্তু পূর্ণ অভিন্নত্ব হয় না। তন্ত্রের সাধনায় শক্তিসম্পাত হয় বটে, কিন্তু শক্তি জীবত্বের পূর্ণ অপসারণ এই ভূমিকায় করে না। এখানে যে আনন্দ ও রসের আস্বাদন হয়, তাকে অতিক্রম করা সম্ভব হয় না যদি ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম না করা যায়। এই জন্য তন্ত্রে অভিন্নভাবে উপাসনার উপদেশ আছে। এই অভিন্ন উপাসনা শক্তির সহিত দূরত্ব ও ভিন্নত্বের লয় করে দেয়; ক্রমশঃ জীবত্বের কেন্দ্রীভূত ভাব বিলুপ্ত হয়। শিবের সহিত অভিন্ন বোধেই সম্প্রসারিত সত্তায় অনুপ্রবেশ সম্ভব। বিরাট্ পুরুষের হয় তখনই আবির্ভাব এবং সে যে পুরুষ জীবেরই প্রকৃত সত্তা, এই অনুভব হয় সুস্পষ্ট। জীব শরীরাভিমানী চেতনা; কিন্তু এই পুরুষ শরীরাভিমানী নয়, এ বিরাট্ অন্তর্যামী পুরুষ; এঁর সুস্পষ্ট বোধে সর্ব্বগত ও সার্ব্বভৌমিক স্বরূপের আবির্ভাব। অহং সূক্ষ্মরূপে এখানেও থাকে, কিন্তু এই অহং হয় বিশ্বময়, বিশ্বপ্রাণ এবং বিশ্বচেতনার ভিতর দিয়ে এর প্রকাশ। এই বিশ্বময় ভাব প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় প্রকৃতিজগতে; বিশ্ব-প্রকৃতির সবটাই যেন এই ভাবে হয় অধিকৃত। শিব-শক্তিসাধক প্রকৃতির সব স্তরে স্বাধীন বিচরণ করতে পারেন; প্রকৃতি তার কোথাও বাধা জন্মাতে পারে না এবং সাধককে দিব্য শক্তিমণ্ডিত করে তোলে; বিশেষতঃ, অন্তর্যামী পুরুষের সহিত বিরাট্ পুরুষের এক অভিন্নবোধ প্রতিষ্ঠা করে। এই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হলে প্রকৃতির আবরণ হয় পূর্ণরূপে উন্মোচিত। মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিতে অধিমানস ও অতিমানস চেতনার অবস্থিতি। উন্মুক্ত প্রকৃতিতে এদের পূর্ণ পরিচয়। সত্তার সকল

স্তরেই চেতনার পূর্ণ প্রতিভার এবং উর্দ্ধে ও অধে বিরাটের প্রকাশ। এ ভূমিকায় সৃষ্টিস্তরের কিছুই অপ্রকাশ থাকে না; কিন্তু সিদ্ধ সাধক অনুভব করে বিরাট্‌কেই, কোন আংশিক প্রকাশ তার লক্ষ্য বা বিষয় হয় না। চেতনার প্রকাশই তার বিষয় এবং ক্রমশঃ এই চেতনার সহিত অভিন্নত্ব-বোধে তার প্রতিষ্ঠা। বিশ্ববিকশিত চেতনার সহিত এরূপ অভিন্নত্ববোধ তার জীবত্বকে ক্ষীণ ক'রে তোলে—সাধক নিজের ভিতর বিরাটত্বের উপলব্ধি করে। এই বিরাটের অনুভূতি তার সমস্ত সত্তাকে উজ্জীবিত করে এবং বিরাটের স্পন্দনে সে পরিচালিত হয়।

কিন্তু শক্তি শুধু বিরাটের অনুভবেই তৃপ্ত করে না, বিশ্বপ্রকৃতির অতীত বিশ্বাতীত প্রকৃতির ও তার বিশ্বাতীত প্রকাশের দিকে দৃষ্টিকে উন্মুক্ত করে। এ প্রকাশ বিশ্বের উর্দ্ধপ্রকাশ; এ ভূমিকায় বিশ্বস্পন্দন নেই—শক্তির অব্যাকৃত স্পন্দনে তার বিকাশের পরিচয়। অন্তর-ভূমিকা, বিশ্বভূমিকা, বিশ্বাতীত ভূমিকা—এই তিন স্তরে শক্তির ক্রমশঃ ব্যাপকতর প্রকাশ। একই শক্তির বিকাশের কেন্দ্র ঘনীভূত হয়ে আসে। এ কেন্দ্রগুলির পরস্পর সম্বন্ধ আছে। অন্তরকেন্দ্র পূর্ণ অধিগত হলে সেখানে বিশ্বকেন্দ্র ও বিশ্বাতীত কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যায়। অস্তিত্বের উচ্চতর স্তরের অনুভূতি অন্তরে হয় সুস্পষ্ট; উচ্চতর অনুভূতিতে নিম্নতর অনুভূতি হয় স্তব্ধ। প্রত্যেক কেন্দ্রের একটা সূক্ষ্ম অনুভূতি আছে; এই জন্য প্রাদেশিক অনুভবের কথা বলা হয়। এক একটা অনুভূতিতে এক এক জগতের পরিচয়—এক একটা বিশ্ব তাতে হয় প্রতিফলিত। এরূপে আমাদের আন্তর-জগৎ ও বিশ্বজগৎ হয় উদ্ভাসিত। জ্ঞানের পরিধির বৃদ্ধি উচ্চতায় ও ব্যাপ্তিতে। কারণ, শক্তির প্রকাশের উচ্চ ও নিম্ন স্তর আছে (স্থুল, সূক্ষ্ম ও কারণানুযায়ী) এবং ব্যাপ্তি আছে বিকাশের বিস্তীর্ণতা হেতু। এরূপ প্রকাশে জ্ঞানের ও শক্তির উচ্চতা ও ব্যাপ্তিই একমাত্র আনন্দ-

প্রদ নহে; শক্তির স্পন্দন এবং রূপও বিশেষ আনন্দদায়ক। শক্তির চঞ্চল গতির নানারূপে বিকাশ ও বিন্যাস হলেও, তান্ত্রিক সাধক শক্তির স্বাধীন ও স্বৈর গতিরও পরিচয় পায়, যেখানে সৃষ্টির কোন সঞ্চার হয় নি, শক্তি অজ্ঞান ও সৃষ্টির অন্তরালে থাকে, তার নিরাবরণ প্রকাশ সেখানে নেই। সৃষ্টিতে বা আভাসে শক্তির বিকাশ মুগ্ধকর, নিরাবরণ শক্তির প্রকাশ বিস্ময়কর; কারণ, এখানে শক্তিই অনুভবের বিষয় কোন উদ্ভূত রূপ বা বিষয় নয়। এখানেই শক্তি অনন্ত রূপকে অতিক্রম করে' নিজের স্বরূপে স্ফূর্ত্তি হয়। এ স্ফূর্ত্তিতে বিশ্বের কোন ভাণ নেই, নিরবচ্ছিন্ন নিরাবরণ নির্ব্বিশেষ শক্তিরই স্ফুরণ। তান্ত্রিক সাধনায় শক্তির এই স্বরূপজ্ঞান অনুভূতির একটি বিশেষ স্তর। এর নিম্নস্তর-গুলিতে শক্তির নানাপ্রকার প্রকাশের জ্ঞান হয়; কিন্তু শুদ্ধ নিরাবরণ প্রকাশ ও শক্তির পরিচয় সেখানে নেই। তন্ত্রের সার রহস্য সৃষ্টির সব স্তর ভেদ করে' এই নিরাবরণা শক্তির স্বরূপ অনুভব করায়। শক্তির এই রূপ বুদ্ধির অতীত।

এই নিরাবরণা শক্তির ধ্যানে ও জ্ঞানে শক্তিরই স্বরূপের প্রকাশ। আমাদের বুদ্ধি স্ফুষ্ট ও অস্ফুষ্ট রূপের ভিতর দিয়ে শক্তি দেখতে অভ্যস্ত; কিন্তু শক্তির নির্ব্বিশেষ স্বরূপ দেখতে অভ্যস্ত নয়। এই প্রকাশ সকল ছন্দের মূলে, কিন্তু ছন্দের সার অনাহত ছন্দে ও জ্যোতিশ্ছন্দে এর স্বরূপ প্রকাশ হয় না—শক্তির স্বরূপ এদেরও অতীত—নিস্তরঙ্গ, দেশ ও কালের অতীত শক্তির এই নির্ব্বিশেষ স্বরূপ নিয়েই প্রত্যক্ষীভূত। স্বকীয় স্বরূপে এরূপ শক্তি নিত্য আশ্রিত। এরূপ উন্মেষহীন, নির্ব্বিশেষ শক্তির ভূমিকা বুদ্ধির অগম্য। এ শিবস্বরূপে প্রতিভাত—সাক্ষিচেতনার নিকট দেশকালের অতীত হয়ে শক্তি প্রতিভাত হয়। এ অনুভব বিরল; শিবভূমিকা পূর্ণ অধিকার করে'ই তা সম্ভব হয়। তত্ত্ব উদ্ঘাটন করতে করতে বিরোধের ঊর্দ্ধ ভূমিকায় এরূপ অবস্থা প্রাপ্তি।

শৈব-সিদ্ধান্তে শক্তিকে অবলম্বন করে সাধনার প্রবর্ত্তন ; হৃদয়-পুরুষ, বুদ্ধি-পুরুষ অতিক্রম করে' বিরাট্ পুরুষ এবং তাও অতিক্রম করে' বিশ্বাতীত পুরুষ ও সর্ব্বশেষে শিবানুভূতি এই সাধনার ক্রম। অন্তর সত্তার গ্রন্থিগুলির উন্মোচনে এই উর্দ্ধস্তরগুলি খুলতে থাকে। এ সাধনার ক্রমোচ্চ গতিতে শক্তির প্রসার-বৃদ্ধি। প্রতি স্তরে শক্তির বিকাশ সূক্ষ্ম ও ব্যাপক, সর্ব্বশেষ ভূমিকায় জ্ঞানে শক্তির কোন রূপ বা প্রকার (formation) থাকে না। এ অবস্থায় বৃত্তি হয় শিব-অভিমূখী। সাংখ্য-সাধনায় প্রকৃতির নিবৃত্তি হলেই সাধনারও ক্রম শেষ; শিব-সাধনায় প্রকৃতির নিবৃত্তি ও শক্তির সবিশেষ বিকাশের নিবৃত্তি। শক্তির কিন্তু এ সাধনায় লয় হয় না; কারণ শক্তি নিত্য পদার্থ—শক্তির নির্ব্বিশেষতা পরম উপভোগ্য। শক্তি যত নির্ব্বিশেষতা প্রাপ্ত হয়, শিব ও সাক্ষিরূপতা তত হয় প্রতিষ্ঠিত। তান্ত্রিক সাধক এই অবস্থায় নির্ব্বিশেষ জ্ঞান ও নির্ব্বিশেষ শক্তি যুগপৎ অনুভব করে। জ্ঞানের এ সর্ব্বোচ্চ বিকাশ। এই অবস্থায় সঙ্কুচিত বৃত্তির উপশম—উদার, প্রশান্তির অবস্থিতি—নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের ও আনন্দের বিকাশ।

একথা বললে ভুল হবে যে, তন্ত্রের সাধনপ্রণালী এক প্রকার ইচ্ছা অনুশীলন। ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন মানুষের সাধারণ ইচ্ছাকে করে উদ্বোধিত ও কার্য্যকরী, কিন্তু বিরাট্ ইচ্ছার সহিত তার কোন পরিচয় হয় না; পরন্তু ইচ্ছার ভিতর দিব্য ইচ্ছাকে জাগ্রত করে' তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হওয়াই তন্ত্রের সাধনা—মানুষের ভিতর দিব্য ইচ্ছা ক্রিয়াশীল হলে মানুষের শক্তিসম্পদ্ অসম্ভবরূপে বর্দ্ধিত হয়। আন্তরসত্তার কেন্দ্রে হয় এই ইচ্ছার ও শক্তির উদ্গম। আধ্যাত্মিকতায় বিজ্ঞানের ও সঙ্কল্পের অব্যর্থতার প্রতিষ্ঠা। এ সম্ভব হয়, কারণ, বিরাট্ ইচ্ছা ও সম্ভূতি প্রকৃতির উপর কর্ত্তৃত্ব করে এবং প্রকৃতিকে বশীভূত করে' নবীন মূর্চ্ছনা ও সৃষ্টি প্রকাশ করে।

অধ্যাত্মজীবনের লক্ষ্য শিবস্বরূপতাপ্রাপ্তি। এই স্বরূপ লাভ করবার পথে অনেক অলৌকিক শক্তি ও জ্ঞানের লাভ, বিশেষতঃ জড় প্রকৃতির সীমা ও বাধাকে অতিক্রম করে'। তন্ত্র শুধু তত্ত্ব হিসাবে প্রকৃতির জড়ত্ব অস্বীকার করেছে, তাই নয়; এর প্রভাব অতিক্রম করতে চেয়েছে। তন্ত্র মানুষের ভিতর ঐশী ইচ্ছা ও শক্তিকে জাগ্রত করবার পথ সুন্দররূপে নির্দ্দেশ করেছে। চিত্তসত্তা এরূপভাবে এই উচ্চ শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয় যে, এক নবীন বিজ্ঞান ও নবীন শক্তিতে মানুষ জাগ্রত হয়, সমস্ত সত্তা এক নবীন প্রেরণায় চালিত হয়। এক দিব্য শক্তি সমস্ত সত্তাকে অধিকার করে' বিজ্ঞান, মন, প্রাণ উজ্জীবিত করে তোলে। সাধনায় আরও ঊর্দ্ধগামী হলে বিশ্ববিজ্ঞান উদ্ভাসিত এবং বিশ্বশক্তি ক্রিয়াশীল হয়। এরূপ সম্ভাবনা খুব উচ্চ হলেও, তন্ত্রসাধক বিশ্বব্যাপার অতিক্রম করে' মহাশক্তিতে ও শিবস্বরূপতায় প্রতিষ্ঠা চায়।

তন্ত্র-সাধনার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, সাধক ইচ্ছামত শক্তির সঙ্কোচ ও প্রসার অনুযায়ী যে কোন ভূমিকায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে; কারণ, সত্তার সকল স্তর অতিক্রম করেই সে উচ্চতর ও উচ্চতম ভূমিকা জয় করতে পারে। সাধক এই সব ভূমিকা জয় করে' কখন অবরোহ করে, কখন আরোহ করে। এটা এত স্বাভাবিক হয় যে, সিদ্ধ পুরুষেরা যে কোন ভূমিকায় ইচ্ছামত বিচরণ করেন। এই জন্য তন্ত্রসিদ্ধ-পুরুষের শক্তির পরিচয় অধিকতর হয়। জ্ঞানে স্থিত হয়ে সাধক শক্তিকে কখন সঙ্কুচিত ও কখনও প্রসারিত করে' ব্যবহার নিষ্পন্ন করে, তাই অনেক সময় তাদের ব্যবহার হয় রহস্যময়। প্রকৃতির সঙ্কোচ ও বাধা অপসারিত হলে, প্রকৃতির উপর শিবত্ব প্রতিষ্ঠা হয় এবং ঊর্দ্ধ শক্তির প্রেরণায় বিশ্বব্যাপার নিষ্পন্ন করে। শক্তিসাধনায় মানুষের ঊর্দ্ধস্থিতি অনুযায়ী শক্তির সম্প্রসার। এ যে শুধু তন্ত্রের

সাধনার বিশেষত্ব তা নয়, সাংখ্যেও এজন্য ঈশ্বরত্ব স্বীকৃত হয়েছে। যোগের দ্বারা প্রবৃত্তির ও বুদ্ধির সঙ্কোচ দূরীভূত হলে বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, ঐশ্বর্য্য উদ্ভূত হয়, যাতে নানা অলৌকিক শক্তির প্রকাশ পায়। মানুষের শক্তির সসীমতা আসে প্রকৃতির স্থূলতা ও তামসিকতা হতে; প্রকৃতি সত্ত্ব বা বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান হলে, তার বিকাশ হয় অপূর্ব্ব। তন্ত্রে সম্বৃতি ও মহাশক্তির আশ্রয়ে আমাদের সত্তার হয় বিশেষ জাগরণ, যার দ্বারা দিব্য বিকাশ সম্ভব হয়। শুধু স্থূলজগতে এ শক্তির ক্রিয়া হয় না, সূক্ষ্মে ও কারণে ইহার ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। শক্তির জাগরণে সব আড়ষ্টতা নষ্ট হয়ে যায়, মানুষ দিব্য বিভূতিসম্পন্ন হয়। অন্তরে জ্যোতিশ্ছন্দের জাগরণে জ্ঞান, কল্যাণছন্দের জাগরণে মৈত্রী হয় বিশ্বময়। ইচ্ছা বিরাটের সংবেশে হয় বিশ্ববিস্তৃত। এরূপ সম্ভাবনা হিন্দুসাধনায় সর্ব্বত্রই আছে। এ সাধনার লক্ষ্য তত্ত্বের সন্ধান এবং পরম তত্ত্বের প্রাপ্তি তখনই সম্ভব, যখন অস্তিত্বের সব স্তরগুলি ভেদ হয়। সাধনা নিমীলিত শক্তিকে উন্মীলিত করে। তন্ত্রে শুধু বিভিন্ন তত্ত্ব (যথা বায়ু, আকাশ, মন ইত্যাদি) ভেদ করেই ঊর্দ্ধে অবস্থিতির কথা বলে নি; পরন্তু তত্ত্বগুলিকে আয়ত্ত করে' সূক্ষ্ম জগতে প্রভাব বিস্তার করার কথাও বলা হয়েছে। যথার্থ তান্ত্রিক সাধক প্রকৃতির ঊর্দ্ধতম ও অধস্তম স্তরগুলি ও তাদের শক্তির সহিত পরিচিত এবং প্রকৃতির ঊর্দ্ধে মহাশক্তির ক্রিয়ার সহিতও পরিচিত। এইজন্য জীবত্বের স্বাভাবিক সঙ্কোচ দূরীভূত হয়ে সাধক নানা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হয়। সত্তার প্রতি স্তরে শক্তির পূর্ণ প্রতিষ্ঠায় তার অন্তর হয় এত সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ যে, বিশ্বশক্তির স্পন্দনে সে হয় চালিত।

শক্তির প্রতি কেন্দ্রটি বিশ্বশক্তিতেই অনুপ্রাণিত ও চালিত। এ সব শক্তি অন্তর্নিহিত হলেও, তাদের জাগরণে প্রতি কেন্দ্রে হয় বিশ্বশক্তির ক্রিয়া অনুভূত। তান্ত্রিক সাধকের কাছে অন্তর ও বাহির ভেদ স্তিমিত—

অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যে সাধক বিরাটে জাগ্রত, তার শক্তির প্রতি কেন্দ্রে বিরাটের অনুপ্রবেশ। এরূপ সিদ্ধ সাধকের নিকটে বিশ্ব প্রতিফলিত—জ্ঞান হয় সর্ব্ব অবভাসক, ইচ্ছা হয় অব্যর্থ ও ক্রিয়া হয় অপ্রতিহত। এই-ই ঈশ্বরত্ব। প্রকৃতির দাসত্ব মুক্ত হয়ে সিদ্ধ সাধক হয় প্রকৃতির উপর ক্রিয়াশীল।

তান্ত্রিক যোগে এ সিদ্ধি স্বাভাবিক, কিন্তু বিরাট্ সম্ভাবনা যে শিবময় অবস্থিতি তার নিকট এও অকিঞ্চিৎকর। একটি দেয় মুক্তির প্রশান্তিময় অবস্থিতি ও পূর্ণ সংজ্ঞান, আর একটি দেয় শক্তির পরিচালনা। একটি দেয় শক্তি, অদ্বৈত, শিবজ্ঞান; আর একটি দেয় বিশ্বের উপর অধিকার ও দিব্য ঐশ্বর্য্য ও ভোগ। এই দুই-ই যোগে, বিশেষতঃ তান্ত্রিক যোগে সম্ভব হয়। জ্ঞান ও শক্তি যোগের অবশ্যম্ভাবী ফল।

তন্ত্রে জ্ঞানের বিস্তৃতিতে শক্তির বিস্তৃতি। জ্ঞান ও শক্তির অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করবার জন্য ভুক্তি ও মুক্তির স্থান তান্ত্রিক সাধনায় আছে; অদ্বৈত সাধনায় জ্ঞানস্বরূপে শক্তির পূর্ণ অভাব। কোন কোন তন্ত্রে দেখতে পাওয়া যায়, তত্ত্বকে নির্গুণ ও সগুণ হতে ভিন্ন বলা হয়েছে। তত্ত্বকে নির্গুণ বলে' তাকে অভাবমুখে এবং সগুণ বলে' ভাবমুখে নির্দ্দেশ করা হয়। তত্ত্ব কিন্তু নির্দ্দেশের বিষয় নয়। তাই কুলার্ণবে উক্ত হয়েছে, 'কেউ দ্বৈত চায়, কেউ অদ্বৈত; মম তত্ত্ব যে জানে, সে দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিত।' জীবের পূর্ণ শিবস্বরূপতা তন্ত্রে প্রতিপাদিত হলেও, সর্ব্বশেষানুভূতিতে ক্রিয়া থাকে বলেই তান্ত্রিক জ্ঞান ও অনুভূতি বৈদান্তিক জ্ঞান ও অনুভূতি হতে ভিন্ন। দ্বিধাকরণ ও একীকরণ সম্ভব হয় শক্তির নিত্যত্ব স্বীকার করলে। তন্ত্রের অদ্বৈত অনুভূতিতে একটা অবস্থা আছে যেখানে শক্তি পূর্ণরূপে শিবের সহিত এক এবং শক্তি নিস্তরঙ্গ উন্মেষহীন হয়। কিন্তু অদ্বৈত স্বরূপমুক্তি হয় না যদি শক্তির পুনরায় উন্মেষের সম্ভাবনা থাকে। তন্ত্রে এই সম্ভাবনা থেকে যায়;

বেদান্তে এর পূর্ণ নিরাকরণ এজন্য যে, বেদান্তে তত্ত্ব একমাত্র অদ্বৈত সত্তা, শক্তি বা গতি তত্ত্বই নয়। অনেকে হয়ত মনে করতে পারেন, বেদান্ত সাধনা শূন্যে প্রতিষ্ঠিত করে এবং তন্ত্র পূর্ণতায় অভিষিক্ত করে। এ কথা তাৎপর্য্যহীন। তন্ত্রের শেষ ভূমিকায় শক্তি স্পন্দনহীন—মাত্র শিবস্বরূপতা থাকে। একভাবে এও অদ্বৈতরূপ। তন্ত্র এখানে শক্তিকে কার্য্যতঃ অস্বীকার করেছে, বেদান্ত স্বরূপতঃ অস্বীকার করেছে। এই শক্তি-স্বরূপের অস্বীকৃতিও বৈদান্তিক অনুভূতিকে দিয়েছে এক বৈশিষ্ট্য যা তান্ত্রিক পরাবিজ্ঞানে নেই।

অপ্যয় দীক্ষিত বহ্‌বৃচোপনিষদের টীকায় শ্রীবিদ্যার উপাসনায় শক্তি উপাসনা ও অদ্বৈত জ্ঞানের ভেদ দেখিয়ে বলা হয়েছে, যারা মুক্তিকামী তারা নির্গুণের উপাসনা করে; যারা অভ্যুদয়কামী তারা সগুণের উপাসনা করে। এও তো উত্তম অধম অধিকারীর কথা; কিন্তু যারা মধ্যমাধিকারী তারা উপাসনা ও জ্ঞানের সমুচ্চয় সাধনা করে। এরূপ অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রেও দেখতে পাওয়া যায়।*

* *
*

* সমুচ্চয়োপাসনাফলভূতনিঃশ্রেয়সাভ্যুদয়য়োঃ সামানাধিকরণ্যং চ পরমেশ্বরনিয়মিতাধিকারবৎসু ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাদিষু শ্রূয়তে এব। ন চাধিকারিব্যতিরিক্তেষপ্যুভয়ফলসিদ্ধিরিতি শক্যং সম্ভাবয়িতুম। সমুচ্চয়োপাসনসিদ্ধাবতিফলসমুচ্চয়সিদ্ধেঃ।

অধ্যাত্ম যজ্ঞ

তন্ত্রে অধ্যাত্ম-সাধনার একটি বিশেষ রূপ আছে। সাংখ্যের ন্যায় ব্যক্তির মুক্তিতে তন্ত্রের সাধনার পর্য্যবসান হয়নি। সাংখ্যে পুরুষ বহু এবং তার মুক্তির কারণ বিবেক। বিবেক ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত নয়। এজন্য সাংখ্যের সাধনায় সমষ্টি-সাধনা নেই, থাকতে পারে না। কোন পুরুষের বিবেক হলে তার স্বরূপের প্রকৃতি-ভিন্নতার জ্ঞান হয়। পুরুষ কেবল, পরস্পর কোন সম্বন্ধ নেই ; অতএব একজনের সাধনা ও সিদ্ধিতে অন্য পুরুষের পক্ষে কোন অর্থ নাই। যোগদর্শনের ভাষ্যে বলা হয়েছে, অস্মিতা-সাধনায় সিদ্ধ হলে যোগী সঙ্কল্পের দ্বারা নির্ম্মাণচিত্ত সৃষ্টি করেন। জ্ঞান-উপদেশ লোক-কল্যাণের জন্য। শুভবুদ্ধি উপগত হলে এরূপ ম্ভব হয়। বুদ্ধি নির্ম্মাণ-চিত্তের উপাদানকারণ। নির্ম্মাণচিত্তসম্পন্ন পুরুষ অনাবৃত বুদ্ধি দ্বারা অসংস্কৃত বুদ্ধিকে উদ্বোধিত করতে পারেন। সমাহিত হবার পূর্ব্বে এরূপ সঙ্কল্পে তাঁদের ব্যুত্থান হয়। এ এক প্রকার অধ্যাত্ম যজ্ঞ, াতে অন্যের উদ্বোধন সম্পাদিত হয়। কিন্তু পূর্ব্ব সঙ্কল্পের সিদ্ধির র আর এরূপ ব্যুত্থান হয় না। যোগী পরাবৈরাগ্যাবলম্বনে চিরতরে মাহিত হন। পরাপ্রসংখ্যানসম্পন্ন হয়ে পুরুষ-তত্ত্বে অধিষ্ঠিত হন।

শুদ্ধ বুদ্ধি যেমন জ্ঞানের কারণ, শুদ্ধ চিত্ত তেমনি কল্যাণের কারণ। মাধি-সাধনায় নির্ম্মল ও ভাস্বর চিত্তে বিশ্বকল্যাণ-বোধ পুরুষকে উদ্বুদ্ধ রে ; কল্যাণব্রতী তিনি, তাঁর তপস্যা-সঞ্চিত জ্ঞান কল্যাণপূতচিত্ত-সম্পন্ন রুষকে দান করেন। বুদ্ধদেবও বিশ্বকল্যাণের জন্য বোধি-চিত্তে ধর্ম্ম ও র্ব্বাণ প্রচার করেছিলেন। বৌদ্ধ যোগশাস্ত্রে ধর্ম্মকায়, নির্ম্মাণকায় ও ম্ভোগকায়ের কথা আছে। যোগী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এরূপ চিত্তভূমিকা সৃষ্টি রেন বিশ্বহিত ও কল্যাণের জন্য। পরানির্ব্বাণে এসব সম্ভাবনার লয় হয়। ধ্যাত্ম-জ্ঞানের পূর্ব্বস্মৃতিকে অবলম্বন করে সিদ্ধ পুরুষেরা সক্রিয় হন জ্ঞান-

রক্ষা ও বিশ্বহিতের জন্য। অধ্যাত্ম-সাধনায় চিত্তের সম্প্রসারতা ও সূক্ষ্ম-গ্রহণসামর্থ্য জন্মে; তার ফলে অধ্যাত্ম যজ্ঞ সম্পাদন—যা এক চিত্ত অন্য চিত্তকে উদ্বোধিত করে মঙ্গলাস্পৃহায়। এক চিত্তের অন্য চিত্তের উপর প্রভাব বিস্তার সম্ভব সেখানে যেখানে চিত্ত সুসংস্কৃত, সুমার্জ্জিত ও শুদ্ধ।

এরূপ লোকহিতকর ব্যাপার সম্ভব হলেও, তাত্ত্বিকতায় এর কোন স্থান নেই। নির্ব্বাণের অথবা শিবভূমিকার নিম্ন এ ভূমিকা। এ ব্যুত্থানের ভূমিকা—শক্তি-সাধনায় অধ্যাত্মযজ্ঞের একটা বিশেষ রূপ। তন্ত্রে শক্তি নিত্য-পদার্থ। প্রকৃতির ঊর্দ্ধে শক্তির অবিরাম প্রকাশ, এজন্য শক্তি-সাধকের সমষ্টি আধ্যাত্মিকতার রূপ অন্য প্রকারের। পরাশক্তিসম্পন্ন ঊর্দ্ধগ চিত্তের ব্যাপকতা স্বাভাবিক। মুক্ত পুরুষ নিত্য প্রকাশিত শক্তিতে উদ্বুদ্ধ; তাঁর সত্তা পরাশক্তির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত। পরাশক্তির উদ্বোধনে বিলয় নহে। এরূপ শক্তিসাধকের পূর্ব্ব সংস্কার বিগলিত এবং অন্তর পরাশক্তিতে প্রোজ্জ্বলিত ও মহাশক্তিতে ধৃত। সত্তার বিন্যস্ত স্তরগুলি শুদ্ধ হলে মহাশক্তির উদ্বোধন। এ শক্তিতে চিত্তের সম্প্রসারণ। সম্প্রসারিত চিত্তের অন্য চিত্তের সাথে সূক্ষ্ম ভূমিকায় মিলন। শক্তির স্বভাব অনুপ্রবেশ। এ অনুপ্রবেশ স্বাভাবিক বলেই তন্ত্রে সমষ্টিগত সাধনার বৈশিষ্ট্য। সিদ্ধ সাধকের সাহচর্য্যে অন্তরে জাগরণ সহজসাধ্য। সূর্য্যের ন্যায় সিদ্ধ সাধকের তেজোরাশি সূক্ষ্মে বিকীরিত। চিতিশক্তির অন্তরে অনুপ্রবেশে সাধকের উদ্বোধন।

শক্তির সঞ্চার ও নিপাত স্বাভাবিক। শাক্তমতে নিরোধ শ্রেষ্ঠতম বৃত্তি নয়; নিরোধ ও উদ্বোধন একই শক্তির ক্রিয়া। নিরোধ শক্তির শিব-অভিমুখী গতি, উদ্বোধন প্রকাশ-অভিমুখী বৃত্তি—দুই-ই শক্তিরই প্রকাশ। জ্ঞান নিত্যধৃতি মাত্র নহে, নিত্য উন্মেষও বটে। এই দুই বৃত্তি শক্তির নিত্য-স্বভাব। শক্তি-সঞ্চারের পূর্ণতায় অন্তর-শুদ্ধি। এই শুদ্ধ অন্তরের গতি বিশ্বাভিমুখী। শক্তি-সাধকের স্বকেন্দ্র থেকে বিশ্ব-অন্তরে

স্পর্শ ও উদ্বোধন। শক্তিবাদের এই-ই স্বাভাবিকতা এবং শক্তিসিদ্ধেরও এই-ই সম্ভাবনা ; শক্তিসিদ্ধ পুরুষ সম্প্রসারিত শক্তিতরঙ্গে নিজকে সিঞ্চিত ও আপ্লুত করে। শক্তি-উন্মেষিত অন্তর দেশ ও কাল ব্যবধান অতিক্রম করে' পরস্পর মিলিত হয়। বিশ্বময় অধ্যাত্ম-চক্র রচনা করে। যেখানে শক্তির নির্ব্বাণই লক্ষ্য, সেখানে চরম সাধনায় ইহা অন্তর্নিবিষ্ট হতে পারে না। কিন্তু শক্তি-সাধনার ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে ; শিব-নির্ব্বাণ যেখানে বিশেষ কাম্য, সেখানে চক্র রচনা সম্ভব নয় ; কিন্তু শক্ত্যারূঢ় হয়ে প্রতি কেন্দ্রে মহাশক্তির উদ্বোধন যার কাম্য, সে অধ্যাত্ম-চক্র রচনা করে, অধ্যাত্ম-যজ্ঞ সম্পাদন করে। এ ভাবে অধ্যাত্ম-সাম্রাজ্য তন্ত্রপ্রতিষ্ঠা করতে তৎপর।

স্বারাজ্যসিদ্ধি আত্ম-প্রতিষ্ঠা। ব্যক্তির আত্ম-প্রতিষ্ঠায় সমষ্টির আত্ম প্রতিষ্ঠা হয় না। সিদ্ধের শক্তির দ্বারা এই সমষ্টি-প্রতিষ্ঠা সম্ভব। নিত্য সম্প্রসারিত শক্তির অনুপ্রবেশ এই সম্ভাবনাকে রূপ দেয়। এইজন্য তন্ত্রে অধ্যাত্ম-চক্র স্বভাব-সিদ্ধ। যে বিশ্ব-শক্তির সর্ব্বত্র অনুস্যূতি (immanent), তার সমষ্টিগত জীবনে জাগরণ ও সম্প্রসারণ তন্ত্র-সাধনার একটি লক্ষ্য। তন্ত্রের লক্ষ্য সমষ্টি-জীবনে অধ্যাত্মশক্তির উদ্বোধন। এই অধ্যাত্মচক্রে কোন বিশেষ জাতির (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি) বা ব্যক্তির (নর বা নারী) স্থান নেই—জাতি ও ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে সকলের স্থান এ অধ্যাত্মচক্রে। অধ্যাত্মশক্তি সর্ব্বত্রই সমভাবে বিদ্যমান ও ক্রিয়াশীল। সিদ্ধপুরুষে দীপ্তশিখার ন্যায় তার জাগরণ এবং বায়ুবিকম্পিত প্রোজ্জ্বলিত বহ্নির ন্যায় তার বিকীরণ। এই মুক্তশক্তির জাগরণে অধ্যাত্ম-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। এই অধ্যাত্ম-সাম্রাজ্যের কল্পনা বৌদ্ধধর্ম্মেও পাওয়া যায়, কিন্তু তন্ত্রে এই পরিকল্পনা স্বভাবসিদ্ধ ; শক্তি এর ভিত্তি। শক্তির জাগরণে সমষ্টির স্বাভাবিকত্বের ও অধ্যাত্মরূপের স্ফুরণ—এরূপে জীবনমুক্ত পুরুষের চেতনায় অভিন্নত্ব অনুভব ও বিভিন্ন শক্তির সম্প্রসারণে বিশ্বব্যাপী অধ্যাত্মচক্র

রচনার সম্ভাবনা স্বরূপে থাকলেও, এ সম্ভাবনার জাগরণ অধ্যাত্ম-শক্তির কার্য্য। অধ্যাত্ম-বোধ দেয় একাত্মতার জ্ঞান, অধ্যাত্ম-শক্তি দেয় অধ্যাত্ম-সমাজ রচনার সংবেগ। এরূপ অধ্যাত্ম-চক্রের সম্ভাবনা শুধু মানবসমাজেই কল্পিত হয়নি, এর অস্তিত্ব সূক্ষ্মজগতেও অনুভূত হয়েছে। সিদ্ধ পুরুষদের সঙ্ঘের কথা তন্ত্রের বহু স্থানে উল্লেখ আছে। সিদ্ধ পুরুষদের সঙ্ঘ হতে অধ্যাত্মশক্তি মানবসমাজে অবতরণ করে' থাকে। মানুষের যখন অধ্যাত্ম-প্রেরণার দ্বারা উদ্বোধন ঘটে, তখনই সিদ্ধ পুরুষের সাক্ষাৎকার হয়ে থাকে। সিদ্ধ পুরুষে জ্যোতিঃ দেহের প্রকাশ। শুধু তাই নয়, সিদ্ধ পুরুষ মানুষকে অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন করে, তাদের অভিষিক্ত করে। পূর্ব্ব সংস্কারবশে পূর্ব্ব জীবনের পুনরাবৃত্তি হলেও ঐ শক্তির সঞ্চার কখন লুপ্ত হয় না এবং এই দিব্য স্মৃতি আরূঢ় হয়ে যোগযুক্ত থাকে। এই ভাবে অপ্রাকৃত বিশ্বের সহিত এই বিশ্বের যোগ রক্ষিত হয়। এ যোগ নিত্যই আছে, কখনও পুরুষ-বিশেষের নিকট এ উন্মুক্ত হয় মাত্র। সিদ্ধ সঙ্ঘের নানা রূপ প্রকাশ, কোথাও জ্ঞানের প্রকাশ, কোথাও প্রেমের প্রকাশ—কোথাও শক্তির প্রকাশ। এই সঙ্ঘ দিব্যৌঘ, মন্ত্রৌঘ, সিদ্ধৌঘ। দিব্যৌঘ-সঙ্ঘ—দেবসঙ্ঘ, মন্ত্রৌঘ-সঙ্ঘ—ব্রহ্মর্ষি-সঙ্ঘ। (যথা বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ইত্যাদি)। সিদ্ধৌঘ—সিদ্ধদের সঙ্ঘ (যেমন নারদ, সনৎকুমার ইত্যাদি)। সব সঙ্ঘেরই সংযোজনী সূত্রের দ্বারা সম্বন্ধ আছে। এ সব সঙ্ঘের সকলই উজ্জ্বল, দীপ্ত, সৌন্দর্য্য ও সুষমার স্পন্দনে স্পন্দিত। অধ্যাত্মবিজ্ঞান শক্তিতে সমুজ্জ্বলিত। সত্যানুসন্ধিৎসু সাধক এরূপ বিজ্ঞান ও আনন্দ সমুদ্ভাসিত সাধক-সঙ্ঘের সহিত এক শুভ মুহূর্ত্তে সংস্পর্শ অনুভব করেন এবং তাহাদের সাহায্যে প্রাপ্ত হন। ঈশ্বরীয় কেন্দ্র হতে যে জ্ঞান ও শক্তি স্বতঃ প্রকাশশীল, অনেকেই তাহার বেগ ধারণ করতে সমর্থ নয়। এই জন্যেই সনাতনী ঐশীশক্তি এরূপ সঙ্ঘের ভিতর দিয়ে সাধককে উন্মেষিত করে।

অধ্যাত্মজীবনে মানুষের স্থূলজ্ঞানদৃষ্টির অগোচরে এক কেন্দ্রগ শক্তির উদ্বোধন এবং অলক্ষ্যে আলম্বন। অধ্যাত্মজীবনের প্রাথমিক উদ্বোধনে যে শক্তির সংবেগ, বিজ্ঞানের জ্যোতিতে তার পূর্ণ পরিণত প্রকাশ স্বাধীন এবং সহজ। তখন সমস্ত সত্তাটি হয় ঔজ্জ্বল্য দ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং সুষমা দ্বারা পরিশোভিত। সম্পূর্ণরূপে অধ্যাত্মশক্তির সম্ভাবনা বুদ্ধির অগোচর। অধ্যাত্মসজ্ঘ এবং চক্রের ভিতর দিয়ে এরূপ ঐশী অনুপ্রেরণা ছড়িয়ে পড়ে। অনুসন্ধিৎসু সত্তার স্বচ্ছতা ও নমনীয়তার অনুরূপ সাধক এ শক্তি গ্রহণ করে থাকে। এই অলৌকিক বিজ্ঞান এবং অলৌকিক অনুষ্ঠানই মহাপ্রকৃতির শ্রেষ্ঠ অবদান। একে সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হতে হলে অধ্যাত্মশক্তিতে পূর্ণ অবগাহন আবশ্যক। গঙ্গাধারার ন্যায় যে কল্যাণ ও শক্তিপ্রবাহ বিশ্বের অন্তরে নিয়তই বর্ত্তমান, শ্রদ্ধা ও বিবেক-পূর্ব্বক তার গ্রহণে মানুষের সকল লঘুতা ও অভাবমুক্তি। এই সম্পদ-প্রাপ্তির উপায় অধ্যাত্মশক্তিকে জাগরণ করা এবং অধ্যাত্মচক্রের সহিত সম্পৃক্ত হওয়া। সমস্ত বিরুদ্ধশক্তি দূরীকরণপূর্ব্বক অধ্যাত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা করাটা তন্ত্রের অধ্যাত্মসাম্রাজ্যের পরিকল্পনা।

স্থূল শক্তির প্রভাবমুক্তিতে সূক্ষ্মতর অধ্যাত্মশক্তির স্পন্দনের অনুভূতি। সৃষ্টিকে উজ্জ্বলতর ও শোভনতর করাই এর প্রধান কাজ। জীবনশক্তির স্পন্দনকে অভিভূত করে' অধ্যাত্মশক্তি ক্রিয়াশীল; অধ্যাত্মশক্তির স্পর্শে এই শক্তির ব্যাপকতর ও রমণীয় প্রকাশ। তাই অধ্যাত্মচক্রে এক মহাশক্তির স্ফুরণে সবাই আচ্ছন্ন, অভিভূত। সাম্রাজ্যসিদ্ধি এই শক্তিসাধনার বিরাট্ সম্ভাবনা। শক্তি বহুকে একই কেন্দ্রীভূত করে। প্রকৃতি বিচ্ছিন্নরূপে কাজ করে; মহাশক্তির ভিতর দিয়েই সমষ্টি সংহত হয়ে ওঠে। শক্তির এই সংহত রূপই অধ্যাত্মচক্রের প্রেরণা দেয় এবং অধ্যাত্ম-সাম্রাজ্য রচনা করে। তন্ত্রের সাধনার ও সমাজ রক্ষার ভিত্তি এই অধ্যাত্মশক্তি। অধ্যাত্মশক্তি শক্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ এবং এর কার্য্যকারিতা

অমোঘ—প্রাণ, মন, বিজ্ঞানকে সংহত করে' জীবনের অভিব্যক্তিকে আরও উচ্চতর পর্য্যায়ে চালিত করে এবং পার্থিব আকর্ষণগুলিকে শুদ্ধ করে' অধ্যাত্মসূর্য্যের (spiritual sun) শান্ত জ্যোতিঃ-ধারায় পূর্ণ করে। মানুষের ভিতর আছে দুর্দ্দমনীয় অন্ধশক্তির প্রেরণা, তন্ত্র তাকে অস্বীকার করে না। অধ্যাত্মশক্তির কিরণসম্পাতে এই অন্ধশক্তির স্বভাব হয় পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত। মানুষের উজ্জ্বল ও রমণীয় বিকাশের দিকে তন্ত্র অবহিত। ক্রমূর্দ্ধ গতিতে এরূপ সম্ভাবনার দ্বার খুলে যায় এবং সাধকের অন্তরে এক মহান্ তেজোময় শক্তির বিকাশ ঘটে। সত্তার স্তরে স্তরে সেই তেজঃ বিকীরণে দিব্যভাবের প্রকাশ। অধ্যাত্মচক্রে এই শক্তির স্ফুরণ ও নিপাত সমষ্টিগত অধ্যাত্মশক্তি জাগিয়ে তোলে—তাই তন্ত্রশাস্ত্রে অধ্যাত্মযজ্ঞের এত প্রাধান্য। বস্তুতঃ, সমষ্টিসাধনা তন্ত্রের একটি বিশেষ রূপ। এ সম্ভাবনা তখনই সিদ্ধ হয়, যখনই কোন কেন্দ্রে শক্তি সংহত হয়ে সত্তার সকল স্তর শুদ্ধ করে' তোলে। শুদ্ধ ও দিব্য আধার হতে শক্তি হয় সঞ্চারিত ও বিস্ফুরিত। অশুদ্ধ আধারে শক্তির বিরাট্ সংহতি সম্ভব নয়; কারণ অন্তরের সে প্রসার থাকে না—যা সকলকে স্পর্শ করে' উদ্দীপ্ত করতে পারে। মহাশক্তির অবতরণে ইহা সম্ভব; কিন্তু মহাশক্তি অশুদ্ধ আধারে অবতরণ করেন না।

অধ্যাত্মসঙ্ঘের সহজ স্বাভাবিক স্ফুরণ প্রতিপন্ন হয় না বিরোধী ও বিচ্ছিন্ন শক্তির ক্রিয়াশীলতায়। অধ্যাত্মশক্তির স্ফুরণে এই বিচ্ছিন্নতার স্থানে সংহতির অনুভব পরিস্ফুট হয়ে থাকে। অধ্যাত্মশক্তি কিরূপে বিশ্বময় এক বিরাট্ চক্র স্থাপিত করতে সুচেষ্টিত তারও স্পষ্ট অনুভূতি জাগে। এ চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় না বিরোধী শক্তির ও আধারের অযোগ্যতার জন্য। শক্তির বিকাশ ও স্ফুরণ পূর্ণরূপে সম্ভব হয় আধারের যোগ্যতায়। শক্তির বিকাশে আধার ক্রমশঃ প্রস্তুত হয় এবং বিরাট্ শক্তি অনুপ্রবেশের ধারণসামর্থ্য লাভ করে।

মানুষের ভিতর দুটি আকর্ষণ কাজ করে—একটি নিম্নদিকে, আর একটি উর্দ্ধদিকে। নিম্নের আকর্ষণ বিচ্ছিন্ন শক্তির ক্রিয়া, উর্দ্ধ আকর্ষণ ব্যাপক শক্তির ক্রিয়া। এই বিচ্ছিন্ন শক্তি ক্রিয়াশীল বলেই বিরাট্ দিব্য সমাজ ও অধ্যাত্মচক্র গঠিত হতে পারে না; যেহেতু মানুষ শক্তির বিরাট্ স্পন্দনে স্বভাবতঃ উদ্বোধিত নয়। শক্তি উর্দ্ধগ হলে জ্ঞানের বিস্তৃতিতে সর্ব্বত্র সত্তায় এক বৃত্তি অনুভূত হয়। এই বৃত্তির অনুগামী হয়ে প্রাণ ও বিজ্ঞানপ্রসারে অধ্যাত্মচক্রের স্বাভাবিকতা স্পষ্ট অনুভব করে। এই সংহতির উদ্বোধন স্বেচ্ছাকৃত (voluntary) নয়, এক বিরাট্ সত্তার বোধ সহজরূপেই এর সত্য অনুভব করে এবং অবচেতনায় স্বচ্ছন্দরূপে (spontaneously) এর প্রেরণা কাজ করে। আধারের বাধা-বিঘ্ন চেতনার উন্মেষে স্বতঃই বিদূরিত হয়। প্রাচীন সংস্কারের স্থানে স্যবলীল জীবনের ছন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ছন্দই এরূপ সংহতির ভিত্তি—এর সত্তা জ্ঞানে স্ফুরণ হলেই বিরাট্ সমাজের রচনা। অধ্যাত্মচক্র ছন্দোবদ্ধ, ছন্দধৃত—প্রাণের, মনের ও বিজ্ঞানের ছন্দে দীপ্ত। এই বিরাট্ ছন্দ সত্তার স্তরে যখন অবতরণ করে, তখন আসে এক মহাজাগরণ এবং বিরাটের স্পর্শে জাগে সত্তার পুলক। এই বিরাট্ ছন্দেই মানুষের ব্যক্তিত্বের বৃহত্তর প্রকাশ। বিরাটে তার স্বরূপের প্রকৃত রূপের স্ফূর্ত্তি। শক্তিসাধকের অস্তিত্বের প্রত্যেক স্তরেই শক্তির অনুপ্রবেশ; এই বিরাটের অনুপ্রবেশে তার স্বরূপে হয় বিরাটের অনুভব—তার লুপ্ত ঈশ্বরত্বের জাগরণ। আধারের প্রতি স্তরে, প্রতি স্পন্দনে ও ক্রিয়ায় সাধক পায় বিরাটের স্পর্শ ও প্রতিষ্ঠা। তার ক্ষুদ্রতা, দৈন্য, সঙ্কীর্ণতার হয় লয়। স্বরাট্ হয়ে সে অধিকার করে তার সাম্রাজ্যকে।

* * *

শব্দছন্দ ও জ্যোতিশ্ছন্দ

ভারতীয় সাধনার লক্ষ্য তত্ত্বজ্ঞান। জ্ঞান-সাধনায়ই ইহা যে কেবল সত্য, তা নয়; কি যোগ, কি ভক্তি সব সাধনায় একথা পূর্ণরূপে সত্য। ভারতীয় সাধনা শুধু একটা ভাবের উচ্ছ্বাস নয়, এ তত্ত্বনির্ণয়, তত্ত্বের স্বরূপ উপলব্ধি। ভারতের সাধনার মূলকথা উচ্চারিত হয়েছে একটি মন্ত্রে: 'অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।' সত্তা সত্যে ধৃত, অমৃতে সিঞ্চিত, জ্যোতিঃতে আপ্লুত। এই সত্যজ্যোতিঃ জীবনে উদ্ধার করাই হিন্দুসাধনার বিশেষত্ব। তত্ত্ববোধ দেয় তত্ত্বপ্রতিষ্ঠা। তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠা তত্ত্বানুভূতিসম্পন্ন হলেই হয়। জীবনে তত্ত্বপ্রতিষ্ঠাই পরম সিদ্ধি।

তন্ত্রে সাধনার সব মার্গেরই কথা আছে—জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, শাস্ত্রীয় কর্ম—এ সকল সাধনা পূর্ণাঙ্গ সাধনা। তন্ত্র সত্যকে জীবনের ভিতর দিয়ে পেতে চেয়েছে বলে' এর সাধনা জীবনের সকল স্তরের ভিতর দিয়ে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। মানুষের অন্তর্জীবনে নানাবিধ ভাব আছে, সাধনায় সেগুলির স্ফূর্ত্তি অবশ্যম্ভাবী। তন্ত্রে সাধনা ভিত্তি নিয়েছে জীবনে—কোনও বিশেষ মতবাদে নয়। জীবনের প্রত্যেক কোরকটি জ্ঞান-সূর্য্যের আলোকে অভিস্নাত হলে কোথাও মাধুরিমা, কোথাও স্বচ্ছতা, কোথাও আনন্দ, কোথাও তৃপ্তি, কোথাও পূর্ণতা উদ্বোধিত হয়ে জীবন পবিত্র, সুন্দর ও মহিমান্বিত হয়। জীবনের স্বাভাবিক গতি বৃহতে, স্থিতি ঋতে, তৃপ্তি আনন্দে। তান্ত্রিক সাধনায় জীবন প্রতি স্তরে ও প্রতি দলে জ্যোতিশ্ছন্দে আলোকিত হয়—এক নির্ম্মল জ্যোতিঃধারায় সত্তার সব স্তরগুলি অভিষিক্ত হয়। তন্ত্রসাধনায় সত্তার কোথাও এতটুকু মল থাকে না, আবরণ থাকে না, সমস্ত সত্তাটি জ্যোতিঃস্নাত হয়ে জাগ্রত হয়।

সাধারণ যোগমার্গে সাধক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে করতে অগ্রসর হয়; বিশ্লেষণে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম তত্ত্বের পরিচয় হয়—এরূপে সূক্ষ্মতম জ্ঞান হয়। তন্ত্রসাধনা বিশ্লেষণের (analysis) সাধনা নয়, ছন্দের সাধনা। এই জন্যই এর বিশেষত্ব। এতে ফলের কোন ভেদ হয় না, হতে পারে না। আমাদের সত্তার স্বরূপ তো এক—যদিও সে স্বরূপের অন্তর্নিহিত উপাদান-গুলিকে উন্মুক্ত করবার পথ বিভিন্ন। ছন্দঃ অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক-রূপে অন্তর-সত্তাকে উদ্বুদ্ধ ও উন্মুক্ত করে। এর জন্য গভীর ধ্যানাবেগ ও প্রয়াস আবশ্যক হয় না, অথচ ভক্তি বা জ্ঞান-বিকাশেরও কোন লঘুতা থাকে না। সত্তার জাগরণের এই কৌশল তন্ত্রের অন্যতম বিশেষত্ব। তন্ত্রের সাধনার ক্রম: (১) শক্তির জাগরণ, (২) শক্তি-সম্পাত আধারের সর্ব্বত্র অনুপ্রবেশ, (৩) সত্তার বিভিন্ন স্তরের বিকাশ।

যোগাদি শাস্ত্রে যা জ্ঞান ধ্যান ও বিশ্লেষণের দ্বারা লাভ করবার উপদেশ আছে, তন্ত্রে তা লাভ হয় ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ছন্দের জাগরণে। তন্ত্রসাধনার মূল ভিত্তিই হচ্ছে এই ছন্দের জাগরণ। সত্তার প্রতি কোরকে অন্তঃসত্তার ছন্দোবদ্ধতায় পরম রমণীয় বিকাশ।

এই ছন্দঃ সর্ব্বত্র একরূপ নয়। বিভিন্ন স্তরের ছন্দঃ বিভিন্ন; কিন্তু, সকল ছন্দঃ এক বিরাট ছন্দের আংশিক প্রকাশ—সকল ছন্দের স্বাভাবিক গতি ঐ বিরাট্ ছন্দের দিকে। এ উপলব্ধিতে পরম জ্যোতিঃর প্রকাশ।

তন্ত্র মানুষের অন্তঃসত্তাকে ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য, এই তিন ভাবে নির্ণয় করেছে।

সাংখ্যাদি শাস্ত্রে প্রাণ, মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি ইত্যাদি তত্ত্ব বিভাগ অন্তঃসত্তার পরিচয় দেয়। তন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, তন্ত্র সত্তাকে অতি-মানস, মানস ও অধিমানস বিজ্ঞানে বিভাগ করেছে এবং তাদের স্থান নির্ণয় করেছে। তন্ত্রের এই কৌশল সাধনাসম্ভূত। এই অতিমানস, মানস ও অধিমানস-বিজ্ঞান তন্ত্রসাধনার ভিত্তি। এই বিজ্ঞান পূর্ণ বিজ্ঞান,

এতে অপরোক্ষভাবে সত্তার পূর্ণ পরিচয়। এ পরিচয় হলে মানুষের চিত্তের স্বভাব, তার অন্তর্নিহিত শক্তি এবং তাদের উন্মেষে জ্ঞানের পরিসর সহজে নিষ্পন্ন হয়। তন্ত্র তত্ত্বগুলির (পৃথ্বী, অপ, তেজ, বায়ু ইত্যাদি) সহিত আমাদের প্রাণ, মন, বিজ্ঞানের বৃত্তির সম্বন্ধের কথা বলেন। তত্ত্বের পরিবর্ত্তনে ভাবের পরিবর্ত্তন, এ তন্ত্র-সাধনার প্রধান কথা। তত্ত্ব ও ভাব পরস্পর আশ্রিত। তন্ত্রে তত্ত্বের অবস্থিতি (location) স্থির আছে—সেই সব তত্ত্বানুযায়ী ভাব-বৃত্তির অবস্থিতিও নির্ণীত হয়েছে। তত্ত্ব ও ভাবের অবিভাজ্য সম্বন্ধ দিয়েছে সাধনার রূপ। কতকগুলি তত্ত্বের সহিত অন্নময়, প্রাণময় কোষের সম্বন্ধ, কতকগুলির সহিত মানসিক বৃত্তির, কতকগুলির সহিত বিজ্ঞানবৃত্তির সম্বন্ধ।

তত্ত্বের সহিত ভাবের সম্বন্ধ ছন্দের ভিতর দিয়ে। প্রত্যেক তত্ত্বের একটী অন্তর্নিহিত ছন্দঃ আছে। এই ছন্দঃই করে ভাবের পুষ্টি। ছন্দোবদ্ধ হলে প্রত্যেক তত্ত্ব ও ভাবকেন্দ্রটি সঞ্চালিত হয়, তার ক্রিয়া হয় সুস্পষ্ট।

প্রত্যেক ভাব ও তত্ত্বকেন্দ্রে ছন্দঃ জাগানই সাধনার উদ্দেশ্য। এই ছন্দঃ কেন্দ্রগুলিকে নিয়মিত করে এমনিভাবে যে, তার ভিতর বিরাট্ ছন্দের যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা হয়। তন্ত্রের দৃষ্টিতে সব জীবনটাই ছন্দঃ। এই ছন্দঃ-সূত্র হারিয়ে যাবার জন্যই জীবনে দ্বন্দ্ব জেগে উঠে এবং জীবনের বৃত্তি সঙ্কুচিত হয়। প্রসারেই শান্তি এবং সঙ্কোচেই দ্বন্দ্ব। ছন্দের অনুপ্রেরণায় অধিমানস, মানস ও অতিমানসের পূর্ণ বিকাশ হয়।

তন্ত্র শুধু অন্তর্জীবনের ছন্দঃ অনুভব করেনি; অন্তরের সহিত বহির্বিশ্বের ছন্দের পরিচয় করিয়ে দেয়। আন্তর ও বহির্ভেদ এবং মানসিক ভেদ প্রভৃতি ছন্দের গভীরতায় ও বিশালতায় দূরীভূত হয়—অনুভব হয় অন্তঃপ্রাণ বহিঃপ্রাণের, অন্তর্মন বহির্মনের, অন্তর বিজ্ঞানের বহির্বিজ্ঞানের সহিত অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ। একই বিজ্ঞান মন প্রাণ ও সঙ্কোচ বৃত্তির জন্য অন্তঃ ও বহিঃরূপে প্রতীত হয়।

তন্ত্রের সাধনার দু'টি ভিত্তি—(১) অধিমানসের সহিত অতিমানসের সংযোগ (২) অন্তর্বিশ্বের সহিত বহির্বিশ্বের সংযোগ (আধ্যাত্মিক জগতের সহিত আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক জগতের যে নিত্যসম্বন্ধসূত্র বর্ত্তমান, তা' অধিকৃত করা)। এই দু'টির সাধনে বিশ্ববিজ্ঞানের একটা বিশেষ পরিচয় ফুটে উঠে অপরোক্ষভাবে। তন্ত্র পরোক্ষ জ্ঞানের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেনি, জ্ঞানের সকল পরিচ্ছেদ অনুভূতির দ্বারা অধিকৃত করেছে। এই বিশেষত্ব হিন্দু যোগশাস্ত্রের। এখানে এর মহিমা ও বিশেষ কার্য্যকারিতা। সত্যানুসন্ধিৎসার বিরাম হয় না এতটুকু জ্ঞানের অভাব থাকলে; তাই তন্ত্র সত্তার সব স্তরের পূর্ণ জ্ঞানে বিশ্বস্থ ও বিশ্বাতীত উজ্জল সত্যের উদ্বোধন করেছে—জ্যোতিঃস্পন্দনে সত্যের পরম রূপের স্ফূর্ত্তির। এমন কি সৃষ্টির ছন্দেও এই জ্যোতিঃস্পন্দন অমৃতরূপে প্রতিভাত হয়। মৃত্যুর অধিকার পায় লয়; জীবনের প্রত্যেক স্পন্দন, প্রত্যেক রূপ অমৃত সিঞ্চিত হয় এবং বিশ্ববর্ণে, বিশ্বস্বরে, বিশ্বরূপে একই শক্তির অভিব্যঞ্জনা ও দীপ্তি প্রত্যক্ষ হয়।

এই বর্ণ ও স্বরের সাধনা তন্ত্রের প্রধান সাধনা। এর ভিতর দিয়ে ছন্দ চিত্তকে অধিকার করে' প্রকৃতির ও মহাপ্রকৃতির বিকাশের প্রত্যেক স্তরটি উপস্থিত করে। ছন্দ শক্তির বিশেষ বিকাশ, ছন্দেই শক্তি ধৃত। ছন্দই শক্তির মূল আকর্ষণ।

তন্ত্রে এই ছন্দসাধনা প্রধানতঃ দুই প্রকার। শব্দছন্দ ও জ্যোতিশ্ছন্দ। এরা একই ছন্দের দুই রূপ। শব্দ ও জ্যোতিঃ দুই শক্তির বিকাশ। তবুও এদের কার্য্যকারিতা লক্ষ্য করলে ভেদপ্রতীতি স্বাভাবিক। জ্যোতিশ্ছন্দ দেয় প্রকাশ, শব্দছন্দ দেয় গতি। জ্যোতিশ্ছন্দে সর্ব্বত্র আবরণের উন্মোচন; জ্যোতিশ্ছন্দের জাগরণে সত্তার সকল অংশের প্রকাশ, এক অপরূপ সত্তার উদ্বোধন। তখন যেন সত্তা সর্ব্বত্রই এক তেজোময় স্পন্দনে স্পন্দিত হয়, এ শুধু অন্তর সত্তার সত্য নহে;

বিশ্বসত্তা সম্বন্ধেও সত্য—বিশ্বময় জ্যোতি-স্পন্দন। এমনি অবস্থা হয় যখন তেজঃছন্দ বিশ্বাতীত হয়েও জাগ্রত হয়—পূর্ণ জ্যোতিরূপের পরিচয় দেয়। এই তেজঃছন্দে প্রাণের শক্তি নিথর হয়ে আসে—সমস্ত শক্তি যেন তেজস্পন্দনে অভিভূত হয়ে জ্যোতিরূপতা প্রাপ্ত হয়। সমস্ত অস্তিত্বটাই যেন বিরাট জ্যোতিঃ—জ্যোতির অন্তরে জ্যোতিঃ—বিশ্ব জ্যোতিতে বিগলিত হয়—উর্দ্ধে জ্যোতিঃ, অধে জ্যোতিঃ, জ্যোতির অন্তরে জ্যোতিঃ। জ্যোতির অন্তরে জ্যোতির কোন কম্পন নাই, শান্ত জ্যোতিঃ—শক্তি এখানে স্তব্ধ। জ্যোতিশ্ছন্দ হৃদয়-গুহা আলোকিত করে' উর্দ্ধে ও অধে অনুপ্রবিষ্ট হয়; অধিমানস সত্তাকে উজ্জ্বল করে' উর্দ্ধমানস ও অতিমানস সত্তার সহিত যোগ করে দেয়। এই ভাবে বিশ্বময় জ্যোতিশ্ছন্দের পরিচয়। এতো শুধু সাংখ্যের বিভিন্ন স্তরের তত্ত্ববোধ নয়, তত্ত্ববোধের সঙ্গে সর্ব্বত্রানুগামী চিতিশক্তির পরিচয়। তন্ত্রসাধনার প্রধান উপায় চিতিশক্তির সহিত সমন্ধ—এই চিতিশক্তি আধারের মলিনতা বিনাশ করে' সর্ব্বত্র জ্যোতিরূপে প্রকাশ পায়—আধারকে জ্যোতিঃস্নাত করে' নিবিড় জ্যোতিতে সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করে। অন্তর বাহিরে জ্যোতিঃকম্পন অনুভব করে' সিদ্ধ সাধক ক্রমশঃ জ্যোতিঃসত্ত্ব হয়ে জ্যোতিঃস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। সাংখ্যমার্গে এরূপ সাধনা সম্ভব নয়, সাংখ্য চিতিশক্তি বলে কিছু মানে না। অতএব সাংখ্যসাধনায় বিশ্বময় চিতির কম্পন ও শরীরময় তেজ সঞ্চারের কোন সার্থকতা নেই; অপর পক্ষে তন্ত্রে এরূপ চিতিস্পন্দনের অনুভূতি সাক্ষাৎ চিৎশক্তিরই পরিচয়। এই চিতিশক্তির ক্রিয়া যত জ্ঞানতঃ বর্দ্ধিত হয়, ততই প্রাকৃত ক্রিয়া অভিভূত হয়ে চিতিশক্তির সঞ্চার হতে থাকে। এই সঞ্চারের উচ্চতা, প্রসার ও আধিক্য ক্রমশঃ সত্তাকে দীপ্ত করে' তোলে। জ্যোতিমূর্চ্ছনা প্রসাররূপী, শব্দমূর্চ্ছনা ক্রিয়ারূপী। শব্দচ্ছন্দে শক্তি আলোড়িত হয়, ক্রিয়া রূপ নেয়, সুস্পষ্ট গতির বিকাশ হয়,

চিত্তের ভাব—শতদলের মত স্ফূর্ত্ত ও মূর্ত্ত হয়। শব্দছন্দ সুপ্ত শক্তিগুলিকে স্তরে স্তরে জাগ্রত করে' ক্রিয়াশীল করে' তোলে। শক্তি শব্দসম্পুট—শব্দের অভিব্যঞ্জনাতে শক্তির বিকাশ।

শব্দছন্দের রূপ আহত ও অনাহত। আহত ছন্দের প্রকাশ মূর্ত্ত, অনাহতের প্রকাশ অমূর্ত্ত। মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত প্রকাশ নিয়েই তো শব্দসমষ্টি। আহত শব্দশক্তির ক্রিয়া প্রাণ ও মন অনুভব করে—শক্তির জাগরণ হয়। প্রাণ ও মন ও বিজ্ঞানের পুঞ্জীভূত শক্তির জাগরণ শব্দের ছন্দে। আমাদের সত্তার নিম্ন গ্রাম ও উচ্চগ্রাম শব্দের ছন্দে পুলকিত হয় এবং পুষ্পকোরকের ন্যায় দলে দলে প্রস্ফুটিত হয়। শুধু কি তাই—শব্দ-ছন্দ অধিমানসের গহনতম ভূমিকায় সঞ্চারিত হয়, অতিমানসের ঊর্দ্ধতন ভূমিকায় প্রবেশ করে। অতিমানস ভূমিকায় আহত শব্দের প্রবেশ নাই, একমাত্র অনাহতের প্রবেশই সেখানে সম্ভব। অনাহত শব্দ কিন্তু শব্দ বলতে যা বুঝি, তা নয়—অ-রবের রব—ক্রিয়ারূপ এখানে সাধারণ শব্দ নেই, আছে সুক্ষ্মতম চিত্তের ক্রিয়া, যা' আকাশ-তত্ত্বের উপরে; এজন্য এখানে আহত হয়ে কোন শব্দের উৎপত্তি হয় না। অতএব অতিমানসে শব্দ-ছন্দ বল্‌লে ক্রিয়ার ছন্দ বুঝতে হবে। অনাহত শব্দ ইচ্ছা ও ক্রিয়ারূপী। এই অনাহত শব্দ উৎপন্ন হয় কুণ্ডলিনী হতে। কুণ্ডলিনী শক্তিরই রূপ—কুণ্ডলিনী ক্রিয়াশীল হলেই অনাহত নাদের উপলব্ধি হয়, তার পূর্ব্বে হয় না। এই অ-রবের রব যোগীর প্রত্যক্ষ; অনুভবের অতি উচ্চ অবস্থায় ইহার প্রকাশ।

এই অনাহত শব্দ-ছন্দে সাধক প্রকৃতির স্থুল গ্রন্থিকে অতিক্রম করে সূক্ষ্মকেও অতিক্রম করে, মহাপ্রকৃতির শক্তির ছন্দে আপ্লুত হয়। এই অনাহত শব্দই প্রকৃতির অতীত হওয়া সুকর মার্গ—এই অনাহত ছন্দ স্বাভাবিক রূপেই কেন্দ্রাভিমুখী; কেন্দ্রাভিমুখী বলেই প্রকৃতির বিন্যাসকে স্বাভাবিক ভাবে অভিভব করে। সকল ছন্দই এই অনাহত ছন্দে

অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়, সকল শব্দই অনাহত ক্রিয়ার খণ্ডবিকাশ। আরোহে শব্দরাশি অনাহতে লয় পায়, অবরোহে অনাহত ক্রিয়া শব্দসম্পুট হয়ে প্রকাশ পায়। অনাহতের প্রাথমিক প্রকাশ ধ্বনিতে। ধ্বনি চিতিশক্তির প্রাথমিক স্পন্দন—ঘনীভূত হয়ে শব্দছন্দ বিকাশ করে। নাদের প্রসারীভূত অবস্থায় ধ্বনি ও শব্দের উৎপত্তি। প্রসারীভূত বলতে বুঝব অবকাশে ছড়িয়ে পড়া; অবকাশ শক্তি দ্বারা আহত হলে স্পন্দনের সৃষ্টি। এই স্পন্দন একটুখানি ঘনীভূত হলেই হয় শব্দ, যার প্রাথমিক প্রকাশ মাতৃকা। মাতৃকায় ধ্বনি প্রথম রূপ নেয়। এই অনাহত ধ্বনি কিরূপে আহত হয়, আহত কিরূপে অনাহতে লয় পায়, অনাহত কিরূপে ক্রিয়া ও শক্তিতে লয় পায়—এই বিজ্ঞান বিশেষ বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানই তান্ত্রিক সাধনার বেদী বলা যায়।

শব্দের সহিত জ্যোতির বিশেষ সম্বন্ধ। শব্দস্পন্দনে জ্যোতিঃস্পন্দন। শব্দের সূক্ষ্মক্রিয়ার আরম্ভে জ্যোতির সমাবেশ। শব্দ যত সূক্ষ্ম হয় জ্যোতির স্পন্দন তত দ্রুত হয়—ক্রমশঃ মূর্ত্তত্বের স্থানে অমূর্ত্ত জ্যোতিঃ-স্পন্দন হতে থাকে। শব্দের সূক্ষ্মতা দেয় জ্যোতির সম্প্রসার—শব্দ অনাহতরূপে জ্যোতির্ম্মালার ভিতর অখণ্ড ভাতির উদ্ভব করে। তান্ত্রিক সাধক এরূপে জ্যোতিঃ ও শব্দের ছন্দে মহাশক্তিস্বরূপে প্রবেশ লাভ করে' থাকে। মানুষের চিত্তবৃত্তিরূপ ও বৃত্তির সমষ্টি—শক্তিরই বৃত্তি; শব্দতরঙ্গে এই বৃত্তিগুলি প্রাচীন সংস্কার ও স্মৃতির স্থানে নবীন স্মৃতি উদ্বোধিত করে। বস্তুতঃ তন্ত্রের এই ছন্দসাধনার লক্ষ্য হচ্ছে সাধককে ক্রমশঃ সূক্ষ্মে রূপান্তরিত করা, সাধকের সত্তাকে জ্যোতির্ম্ময় ও শক্তিময় করে তোলা। চিত্তের গ্রন্থিগুলির পূর্ব্বরূপ এই শব্দস্পন্দনে শিথিল হয়ে আসে, নবীন ভাবে গ্রন্থিগুলি স্পন্দিত হ'তে থাকে। এই স্পন্দনে মহাপ্রাণ ক্রিয়াশীল হয়ে অনুভূতির গভীর স্তর জাগিয়ে তোলে। মহাপ্রাণের ক্রিয়ার ফলে মহাশক্তির

প্রতিষ্ঠা হয় অন্তরে বাহিরে। সাধক আর বাসনার স্পন্দনে স্পন্দিত হয় না। রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ চিরতরে অস্তমিত হয়; মানুষ নবীন আলোকে সূক্ষ্মতর প্রেরণার উদ্বুদ্ধ হয়। সবই যেন শিবময় সত্তায় মণ্ডিত হয়—এক সার্ব্বভৌমিক শিবময় সত্তার উদ্বোধন হয়। বিশ্বের সব কিছু চিতিস্পন্দনে পর্য্যবসিত হয়। গ্রন্থিগুলি উন্মোচিত হয়—নাদের শক্তিরূপতা ও বিন্দুর শিব-রূপতা প্রতিপন্ন হয়।

সিদ্ধ সাধক এইরূপে শব্দও জ্যোতিশ্ছন্দে মগ্ন হয়ে তার শিবত্বের অনুভব করে—সঙ্কুচিত জীবত্বের অপসারণ হয়। জীবত্ব চেতনার বিশিষ্ট বিকাশ; এই জীবত্ব বেদান্তে আরোপিত সত্তা, শৈবাগমে সঙ্কুচিত সত্তা। এই সঙ্কোচের অপসারণে জীবত্বের অপসারণ, শিবত্বের প্রতিষ্ঠা—পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে জীবত্বের সুপ্ত শিবত্বের অনুভূতি—শব্দ ও জ্যোতিশ্ছন্দের অবতরণে চিত্তগ্রন্থিগুলির সম্প্রসারে অস্তিত্বের ব্যাপিত্ববোধ স্ফুট হয়—জীবত্বের ক্লেশ লাঘব হয়। সঙ্কুচিত জ্ঞান ও শক্তিই তো ক্লেশের কারণ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারগ্রন্থি অবসন্ন হয়—সম্প্রসারিত সত্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তার অবস্থিতিটা অনুভব করে এবং তাদাত্ম্যবোধে বিশ্বকে গ্রহণ করে। ছন্দ প্রতিষ্ঠিত হলে অন্তরের কাঠিন্য নষ্ট হয়, ছন্দের সঙ্গে অনন্তের আহ্বান প্রবেশ করে। জীব বিস্মিত হয় তার বিরাট স্বরূপের প্রথম পরিচয়ে। একবার এই পরিচয় হলে তার স্মৃতি আর নষ্ট হয় না; এই স্মৃতির আবৃত্তিতে তত্ত্বের উন্মেষণা নিত্যই জাগ্রত থাকে। পূর্ণ স্মৃতিপ্রতিষ্ঠায় জ্ঞানের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। সাধক এই শব্দ ও জ্যোতিশ্ছন্দে বিশ্বের কারণসত্তাকে উপলব্ধি করে। কার্য্যজগতের পশ্চাতে যে সব শক্তি ক্রিয়াশীল তারও উপলব্ধি হয়ে থাকে। এই বিশ্বছন্দের অনুভবে উপলব্ধি হয় কিরূপে বিশ্বের অন্তরে একই শক্তি ক্রিয়াশীল, কিরূপে একই বিন্দুতে পূর্ণের বিকাশ, কিরূপে সত্তার এক

অংশে বিরাটের অবভাস। কবি ব্লেকের (Blake) ভাষায় বলতে হয়, "বালুকণায় কিরূপে অনন্তকে" (to see infinity in a grain of stand) দেখা যায়। এই ছন্দবোধ জাগ্রত হলে জীব দেখে তার অন্তরে ঈশ্বরকে ও শিবকে—ভেদবুদ্ধি অপসারণে. সর্ব্বত্র ক্ষুদ্রতম পদার্থে এক শিবসত্তাই দৃষ্ট হয়। সকলের সত্তা এই শিবসত্তায় উদ্ভাসিত। ইহা স্পষ্ট উপলব্ধ হয়, যে সত্তা বিশ্বাতীত তাই বিশ্বের অন্তরে, তাই আবার আমাদের হৃদয়াভ্যন্তরে। ছন্দ খণ্ড দৃষ্টির স্থলে অখণ্ড দৃষ্টি দেয়—প্রতি অণুপরমাণুর অভ্যন্তরে, বিরাটের অভ্যন্তরে একই সত্তাকে অনুভব করে। এই দৃষ্টির কোথাও বাধ হয় না। এই দৃষ্টি দেয় অভয় ও অমৃত। উর্দ্ধে অধে অভ্যন্তরে একই অনন্তের সংবাদ—একই জ্যোতির্ময় লোক—একই অনন্ত ছন্দকম্পন। এ ভেদবুদ্ধির অপসারণ শুধু বুদ্ধিগত নয়, জীবন ছন্দে কোথাও আর ভেদের স্ফুরণ হয় না, যদিও ছন্দের ভিতর বিচিত্র ও নানা রসের উপলব্ধি হয়। এই বৈচিত্র্য মহাছন্দের অন্তর্গত হয়ে এক মহাশক্তির পরিচয় দেয় ও উদ্বোধন করে। তন্ত্রশাস্ত্র সাধারণতঃ বেদান্তের ন্যায় তত্ত্বে বিশেষ বা ভেদ স্বীকার করে না। ছন্দবৈচিত্র্য কার্য্যজগতে থাকলেও, কারণজগতে এক মহান ছন্দই থাকে। সাধনা ও ছন্দ বৈচিত্র্যানুভূতিকে অবলম্বন করে' ছন্দস্বরূপতায় বা মহাছন্দে নিমজ্জিত হয়—যে ছন্দে বিরাটের অনুভূতি হয় সর্ব্বত্র অখণ্ড সত্তারূপে।

অধ্যাত্মবহ্নি : অগ্নি, সূর্য্য, সোম

তান্ত্রিক সাধকের জ্যোতিশ্ছন্দে তিন প্রকার অধ্যাত্মবহ্নির পরিচয়। অধ্যাত্মবহ্নি প্রকাশশীল—চিতিশক্তির বিভিন্ন স্তরে প্রকাশ। অন্তরে প্রকাশিত বলে এ অধ্যাত্মবহ্নির জাগরণে সত্তার স্বচ্ছতা, বিশুদ্ধি, রমণীয়তা ও তেজস্বিতা।

এই বহ্নি তিন প্রকার (ষট্চক্র নিরূপণ দ্রষ্টব্য)। প্রত্যেক কেন্দ্রস্থানে অধ্যাত্মবহ্নি ক্রিয়াশীল। প্রত্যেক কেন্দ্রটি স্বচ্ছ জ্যোতির্ময়। অধ্যাত্ম-বহ্নির কিন্তু প্রধান রূপ তিনটি : অগ্নি, সূর্য্য ও সোম। অগ্নি পবিত্র করে, স্থূলও সূক্ষ্ম দেহের আবরণ ভস্মীভূত করে—ধাতুগত মল বিনাশ করে; সত্তাকে সূক্ষ্মতর অনুভূতি, জ্ঞান, ক্রিয়া ও বেদনার জন্য প্রস্তুত করে। সাধনামথিত অগ্নি উচ্চতর সাধনার পথের ইঙ্গিত করে ও সত্তাকে প্রস্তুত করে। এ অগ্নির জাগরণে তামসিক জড়তা, রাজসিক চাঞ্চল্য দুরীভূত হয়—এ প্রজ্জলিত অগ্নিতে সাধক সকল নিম্নবৃত্তির আহুতি দিয়ে তার পশুস্বরূপতার সঙ্কীর্ণতা হতে মুক্ত হয়। এই অগ্নির আহ্বান, চয়ন, স্থাপন ও প্রজ্জলিত প্রকাশে ও প্রতিষ্ঠায় অনুপম শক্তির জাগরণ। সাধকের আন্তরিকতায় স্বতঃই অগ্নি সত্তায় প্রকাশ পায়—এর স্বভাবই এই। প্রচ্ছন্ন থাকা বা আবৃত থাকা এর স্বভাব নয়, এ সতত প্রকাশশীল; সাধকের শুদ্ধা স্পৃহায় এর স্বতঃই প্রকাশ।

সূর্য্য তেজোময়, দীপ্তিময়। অন্তরে সূর্য্যের আবির্ভাবে এক স্নিগ্ধ দীপ্তির (শত সূর্য্যের সংগৃহীত দীপ্তির ন্যায় দীপ্তি) প্রকাশ—প্রকাশে দীপ্তি আছে, পরন্তু প্রচণ্ডতা বা উগ্রতা নেই। শান্ত, স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ, এ জ্যোতিঃ সংবিদে গরীয়ান।

চন্দ্র তেজোময়, আনন্দকর। এর আবির্ভাবে শ্বেত, স্নিগ্ধ, শীতল জ্যোতির আবির্ভাব। এখানে সংবিদ হ্লাদিনীযুক্ত, হ্লাদিনীস্নাত—এ বিশুদ্ধ আনন্দ।

তান্ত্রিক সাধক কিছুদূর অগ্রসর হলে এদের প্রকাশ হয়। এ প্রকাশে অন্তরের সকল স্তরের প্রকাশ। অন্তর শতদলের ন্যায় জ্ঞানদীপ্তিতে উজ্জ্বল, আনন্দসমুল্লাসে রমণীয় হয়ে ওঠে। এ জ্ঞানে আনন্দস্নাত বিশ্বও উদ্ভাসিত হয়। বস্তুতঃ সূর্য্য ও সোম বিশ্বের অন্তর স্বচ্ছপ্রকাশে

উদ্ভাসিত করে, সকল আবরণের উন্মোচন করে। জ্ঞান—বিশ্ব বিজ্ঞান, বিরাট্ বিজ্ঞান। সত্তা স্বরাট, প্রতিষ্ঠা স্বারাজ্য। তন্ত্র সাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন কিছুকে পরোক্ষরূপে গ্রহণ করা হয় না। সবটাই এখানে প্রত্যক্ষ। সত্তার সমস্ত স্তরকে উদ্ঘাটিত ক'রে সাধক অগ্রসর হয়। এক এক স্তরের উদ্বোধনে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। সূর্য্য ও সোমের প্রকাশে সত্তার সকল স্তরের অপরোক্ষ জ্ঞান। এ সংবিদ কিছুর দ্বারা প্রতিহত হয় না। সংবিদ স্থির হয়ে প্রতিষ্ঠিত হলে উচ্চাবচ সকল ভূমিকার জ্ঞান হয়—এমন কি এ সংবিদ অন্তর ও বহির্বিশ্বের মধ্যে যে ভেদ তা অপসারিত করে' স্বরূপের নিরুপাধিক শক্তির চমৎকারিত্ব প্রকাশ করে। এই স্বরূপাববোধের পথে প্রত্যেক বিকাশের মনোহারিত্ব তন্ত্রসাধনা অপরোক্ষরূপে অনুভব করায়। শক্তির অনন্ত বিকাশের সাক্ষাৎকার হয়। রূপসৃষ্টির অতীত অরূপ জগতের বিকাশের মহিমায় সাধক মগ্ন হয়। তান্ত্রিক সাধক বিকাশের প্রতিটি রূপের অন্তর্নিহিত উল্লাস অনুভব করে। বিকাশ নিরর্থক নয়। সর্ব্বত্র মহাশক্তির স্ফুরণ। সাধনায় প্রবুদ্ধ হয়ে সাধক জড়, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান জগতে প্রত্যক্ষ দেখতে পান শক্তির স্পন্দন এবং প্রত্যেকটি স্পন্দনের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন চেতনা ও আনন্দের সঞ্চার। এ দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য এই—সাধক প্রতি স্পন্দনের আনন্দে মুগ্ধ হয়, বিজ্ঞানে বিস্মিত হয়। জগতের বাহিরের রূপ বদ্‌লে যায়। সংবিদের ভিতরই অনন্তের সংবাদ ও স্মৃতির জাগরণ। সকলের ভিতর মহাশক্তির স্পর্শ। জীবনের প্রতি কোরকে আনন্দের উল্লাস। বস্তুতঃ সৃষ্টি তো আনন্দ-যজ্ঞ!

তান্ত্রিক সাধক মায়া বলে কিছুকেই লঘু দৃষ্টি করেন না; মায়া বলেই তো এর এত চমৎকারিত্ব! প্রত্যেক ব্যাপারে—ক্ষুদ্রে ও বৃহতে, সামান্যে ও অসামান্যে—কত গভীর অর্থ, কত দিব্য দ্যোতনাই না বর্ত্তমান! হেয় ও পরিত্যাজ্য কিছু নেই, তারাও শক্তিরই একরূপ বিকাশ। রূপ-জগতে

বস্তুর ভিতর শক্তির ছন্দ ধীরে ধীরে অরূপকে রূপায়িত করে তুলে। অরূপ জগতে শক্তির নির্ব্বিশেষ প্রকাশ—রূপের ভিতর অরূপের পরিচয়; রূপ ও অরূপ দুই-ই শক্তির উল্লাস। একটিতে শক্তির সাবলীল ক্রিয়া ও ছন্দ, অন্যটিতে শক্তির প্রসারিত, উদার, মহিমময় বিকাশ। রূপজগতে উল্লসিত শক্তিচ্ছন্দে অরূপ জগতের সন্ধান মিলে; উল্লাসের ভিতর শক্তির ব্যাপিকা ও উন্মনা অবস্থার বিকাশ। শক্তিসাধক রূপচ্ছন্দের ভিতর দিয়ে অরূপে সমাহিত হন; ব্যুত্থান ও সমাধি শক্তির সহায়ে নিষ্পন্ন হয়। ব্যুত্থানে শক্তির রূপবিকাশ, সমাধিতে অরূপের অনুভূতি। ব্যুত্থানে শক্তির স্পন্দনে সত্তার ছন্দরূপ, আর সমাধিতে শক্তির স্পন্দনের ও ছন্দের লয়। তান্ত্রিক সাধক রূপচ্ছন্দের ভিতর দিয়ে অরূপে আরূঢ় হন। শক্তির আনন্দ, বিলাস ও আনন্দঘন অবস্থায় তাঁর গতি ও স্থিতি। সমাধি তাঁর একমাত্র কাম্য নয়, যদিও সমাধিতে তিনি শিব-ভূমিকায় শক্তির স্পন্দনের বিরাম (poise) আস্বাদ করেন এবং জগতে শক্তি-বিকাশের মধ্যে ছন্দের অনন্ত ভঙ্গী উপভোগ করেন। বিরুদ্ধ শক্তির ক্রীড়ার ভিতর সাধকের অন্তর্দৃষ্টি একই ছন্দ অনুভব করে। শক্তির ক্রিয়া ছন্দেই বিকশিত, ছন্দেই ধৃত, ছন্দেই লীন—আপাতঃদৃষ্ট বিরুদ্ধ শক্তির সঞ্চার হলেও, এই বিরোধের অন্তরেই আছে পারস্পরিক প্রবল আকর্ষণের ছন্দ। ছন্দই শক্তিপ্রকাশের রূপ। ছন্দকম্পনের অনুবৃত্তি স্থির থাকলে রূপস্তর হতে অরূপস্তরে অনুপ্রবেশ হয়। রূপোল্লাসের আনন্দলোক হতে অরূপের ভাবগভীর প্রসারতায় প্রবিষ্ট হতে না পারলে সাধক জ্ঞানের চরম ভূমিকা প্রাপ্ত হন না। এজন্য তান্ত্রিক সাধকের বিপদের আশঙ্কা আছে রূপজগতের উল্লাসে মগ্ন হলে'; সে ক্ষেত্রে অরূপে অনুপ্রবেশের পথ পাওয়া যায় না। এই আশঙ্কা হতে উত্তীর্ণ হবার কৌশল, উল্লাসকে অনুভব করা, কিন্তু তাতে আকৃষ্ট না হওয়া। আকৃষ্ট হ'লে উর্দ্ধতর ভূমিকায় আরোহণ করা যায় না। উক্ত দৃষ্টির অভাব না হলে এবং শক্তির উল্লাসের

অন্তঃপ্রবিষ্ট হলে এ আশঙ্কা স্বতঃই দূরীভূত হয়। কারণ, ঐ বিকাশের ছন্দের ভিতরই মহাশক্তির অনুভব হয়। মহাশক্তির স্পর্শে রূপবিলাস আরোহণের পথরোধ করতে পারে না। সাধক মহাশক্তির আকর্ষণে সকল রূপাবস্থা ভেদ করে' এবং সমনাও উন্মনা ভূমিকা অতিক্রম করে' শূন্যে, মহাশূন্যে ও পরম শিবপদে অবস্থিতি লাভ করেন।

* *
*

তন্ত্র : বেদান্ত : পাতঞ্জল

বেদান্ত ও তন্ত্র :

বেদান্ত ও তন্ত্রের মধ্যে ভেদ হচ্ছে শক্তির নিত্যত্ব নিয়ে। এই ভেদে তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এবং সাধনারও বৈশিষ্ট্য। বেদান্ত জীব ও ঈশ্বরের ঐক্য প্রতিপাদন করেছে। তার সাধনা মুখ্যতঃ অখণ্ডাকার বৃত্তিপূর্ব্বক ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠা জীব ও ব্রহ্মের ভেদ নিরাকৃত করে'। মানুষের বিজ্ঞানের ভিত্তি 'আমি'-বোধ। সাধারণ জ্ঞান 'বিষয়-বিষয়ী' সম্বন্ধ নিয়ে। এই সম্বন্ধাত্মক জ্ঞানের অপসারণে মানস ও অতিমানস অভিজ্ঞতা অস্তমিত হয়। মানুষ প্রজ্ঞাস্বরূপমণ্ডিত হয়ে এই বিশ্বস্বপ্ন হতে জাগ্রত হয়।

বেদান্তের প্রধান প্রতিপাদ্য অদ্বৈত জ্ঞান। অদ্বৈত জ্ঞান আবৃত হয় দ্বৈতের ভাণে। অদ্বৈতই তত্ত্ব, দ্বৈত ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তির উৎপত্তি অজ্ঞানে, ইহার নিরসন জ্ঞানে। অজ্ঞানধ্বংসেই জ্ঞানের প্রকাশ। এ যেন মেঘাপসারণে আবৃত সূর্য্যের স্বাভাবিক প্রকাশ। অদ্বৈতসাধনা—প্রধানতঃ বুদ্ধিগত মল ও আবরণের অপসারণ। এ বিচার 'বিবেক' দ্বারাই হয়। বুদ্ধির স্বরূপগত মলের দূরীকরণ সম্ভব যাথার্থ্যবুদ্ধির দ্বারা। শ্রৌত মার্গানুমোদিত বিচারের দ্বারা এই যাথার্থ্যবুদ্ধির উদয়। বিচার গভীর হলে বুদ্ধির ছন্দে ও একমুখী বৃত্তিতে অখণ্ড ব্রহ্মাকার চিত্তপ্রবাহ সকল সংস্কার লয় করে' নিজে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানসূর্য্যের আবরণ চিরতরে অস্তমিত হয়। অদ্বৈতবাদ বলতে চেয়েছে যে, জ্ঞানের স্বরূপে সংসার-নিবৃত্তি। সেখানে সংসারের ভাণ নাই—বস্তুতঃ লয়ও নাই। ভাণ ও লয়ের অতীত সে তত্ত্ব। সম্বিদের উদয় নাই, অস্তও নাই। সম্বিদ্ স্বয়ংপ্রভ। অবিদ্যার আবরণহেতু জ্ঞানের 'অহম্-ইদম্'এর জাগরণ। জ্ঞানের এই 'বিষয়-বিষয়ী' বোধই সংসার—এ যেন পূর্ণ আলোর

সঙ্কোচে আলো-আঁধারের সমাবেশ। অদ্বৈতবাদ এই আঁধার-আলোর বিশ্বকে অতিক্রম করতে চেয়েছে। পরিপূর্ণ আলোতে অস্পষ্টতার স্থান নেই। এরূপ সিদ্ধান্ত বিভিন্ন স্তরের জ্ঞানের ভিতর কোন সম্বন্ধ নির্ণয় করে না। অদ্বৈত জ্ঞানে এটা দোষাবহ নয়; কারণ, জ্ঞানের নিজের স্বরূপে কোন স্তর নেই। যেখানে স্তর স্বীকৃত হয়েছে, সেখানে জ্ঞান পূর্ণজ্ঞান নয়—উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর প্রকাশ থাকলেও পূর্ণতা নেই।

তাহলেও অদ্বৈতবাদে এরূপ ক্রমিক উপলব্ধির কিছু মূল্য আছে। এসব উপলব্ধি প্রকৃত তথ্য না হলেও, জীবনে এদের সঙ্গতি আছে। এরাই জীবনের রমণীয় ও প্রোজ্জ্বল বিকাশের পরিচ্ছেদ। অদ্বৈতবাদ জীবনের পর্য্যায়ে অনুভূতিকে অস্বীকার করেনি, যদিও এ অনুভূতি নির্ব্বিশেষ অনুভূতি হতে ভিন্ন। এ অনুভূতিতে দিব্য ও রমণীয় গতির পরিচয় এবং ঈশ্বরের সহিত তাদাত্ম্যবোধ। উপাসনা দেয় বিশ্বের কল্যাণরূপের এবং বিশ্বের তেজোময় সত্তার পরিচয়। আচার্য্য শঙ্কর এই উপাসনার রূপ দেখেছেন অহং-গ্রহোপাসনায়—যেখানে উপাস্যের সহিত উপাসকের তাদাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত। এই তাদাত্ম্য শক্তিতাদাত্ম্য (dynamic identity)—ঠিক অভিন্নতা নয়। শক্তির আহ্বানে এবং শক্তির সম্পাতে ও অনুপ্রবেশে হৃদয়াভ্যন্তরে সত্তা ও শক্তির অভিন্ন-বোধ এবং ঐশ্বরিক বৃত্তির আবির্ভাব। ঈশ্বরের সহিত শক্তির অভিন্নতায় সত্তার প্রসারতা এবং প্রভূত শক্তির সমাবেশে জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতির প্রকাশ অধিকতর। এই অহংগ্রহোপাসনার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা সঙ্কোচক বৃত্তি লোপ করে এবং শক্তির উদ্গম করে। প্রত্যেক উপাসনার একটা প্রসারতা আছে, কিন্তু ঈশ্বরীয় শক্তির সহিত অভিন্ন ভাব এই প্রসারতাকে একটি রূপ দেয়—ঈশ্বরীয় বোধের সঞ্চারে সাময়িক তাদাত্ম্যের প্রতিষ্ঠার জন্য অলৌকিক শক্তির প্রকাশ। বিস্তৃতি, অপরিসীমতা এবং শক্তির সমাবেশ এর প্রধান ফল। প্রজ্জ্বলিত

অন্তঃসত্তায় ঈশ্বরীয় ইচ্ছা ও শক্তির তাদাত্ম্য জীবত্বের সঙ্কোচবৃত্তিকে অপসারিত করে। এমন কি সুপ্ত ঈশ্বরত্বের জাগরণ হলেও, এরূপ স্থিতিকে বেদান্ত পরম প্রতিষ্ঠা মনে করে না। ব্রহ্মৈক্য অবস্থা তো এতে লাভ হয় না এবং শক্তির সমাবেশ হলেও, তা অজ্ঞানের তিরোধান করতে পারে না। সে অধিকার শক্তির নেই। একমাত্র জ্ঞানেই ইহা সম্ভব।

শঙ্করবেদান্ত এই জন্য উপাসনালব্ধ কোন স্থিতিকে জ্ঞানস্থিতির সমান মনে করে না—একটি দেয় কল্যাণ ও শক্তিপ্রতিষ্ঠা, আর একটি দেয় অভয় ও স্থিতিপ্রতিষ্ঠা। এ উপাসনায় তেজোময় সত্তার বিকাশ হতে পারে, বিশ্বময় সত্তার অভিন্নতা বোধও হতে পারে, কিন্তু দ্বৈত নিরসন হয় না। এইজন্যই শঙ্করবেদান্তে উপাসনা জ্ঞানের সহায়ক হলেও এবং অধ্যাত্মজীবনে তার স্থান থাকলেও, তার পারমার্থিক তত্ত্ববোধের শক্তি নেই। উপাসনা ও জ্ঞানের এ ভেদের জন্য শক্তির অনুভূতি অদ্বৈত অনুভূতি হতে ভিন্ন হয়ে পড়েছে। উপাসনায় দক্ষ ব্যক্তি সত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে অদ্বৈত ভাবনার দ্বারা মুক্তি লাভ করে। অদ্বৈত বেদান্ত জন, তপ, সত্য লোক ঈশ্বরের অধিষ্ঠান মনে করে, চিতিশক্তি এখানে পরম উজ্জ্বল ও বিষয়হীন, কিন্তু বৃত্তিশূন্য নয়। "অপহতপাপ্মা" হয়েও এ পরম স্থিতি নয়—কারণ বিশ্বের অভিব্যক্তির সাথে এরও অভিব্যক্তি। এর নিত্য পরিস্থিতি নেই। অবিদ্যাসৃষ্টির উপরে এর স্থান হলেও, মায়ার সৃষ্টিতে এদের সমাবেশ। মায়া শুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান, তাই এখানকার প্রকাশও উজ্জ্বল এবং জ্যোতির্ময়।

বেদান্তের উপাসনা ও জ্ঞানের স্বরূপপার্থক্য শক্তিবাদে স্বীকৃত হয় না, যদিও উপলব্ধির চরম ভূমিকায় শক্তি শিবে অন্তর্হিত হয়। এই জন্য তন্ত্রসাধনায় শক্তির উপাসনা ও জ্ঞানের প্রাধান্য। শক্তি জ্ঞানের স্তরের উপর স্তর অতিক্রম করিয়ে সাধককে শিবপদে প্রতিষ্ঠিত করে।

জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য তন্ত্রে অস্বীকৃত হয় নি—কিন্তু চরম অনুভূতিতে শিবে শক্তির উন্মেষ ও লয় নিত্যরূপে স্বীকৃত হয়েছে। জীব অনুভূতির শেষ ভূমিকায় শিবের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করে ও বিশ্বময় শিববোধ অনুভব করে। তন্ত্র-সাধনার স্বরূপ এই—কেন্দ্রগ শক্তি ক্রমশঃই ব্যাপক হয়ে' সৃষ্টির সব স্তরের ভিতরে একটা তাদাত্ম্য অনুভব করে। এই শক্তি কার্য্য-ব্রহ্ম অতিক্রম করে' কারণ-ব্রহ্মের সুস্পষ্ট অনুভূতি দেয়। এজন্য তন্ত্রের সাধনায় শক্তি প্রধানতম ভিত্তি, শক্তি সত্যধৃত—তার স্বরূপ কখনও সত্য হতে চ্যুত হয় না। শক্তিগর্ভে সত্য নিহিত। শক্তিকে অবলম্বন করে' সাধনা করলে সনাতন সত্যে আরূঢ় হওয়া যায়। শক্তি সত্যেই প্রতিষ্ঠা দেয়।

তন্ত্র ও পাতঞ্জল যোগ ঃ

তন্ত্রের সাধনামার্গ যোগ, পতঞ্জলিরও তাই। উভয়ের সাধনপ্রণালী সত্যই রহস্যপূর্ণ। সর্ব্বাংশে একরূপতা না থাকলেও অনেক বিষয়ে মিল আছে। কারণ, উভয়েরই লক্ষ্য এক তত্ত্বাববোধ। যাঁরা তন্ত্রের সাধনার ভিতর মাত্র শক্তির উদ্দীপন দেখ্‌তে পান, তাঁরা সাধনার একাংশ দেখেন। বস্তুতঃ আমরা দেখতে পাই তন্ত্রের উচ্চতম লক্ষ্য হচ্ছে শুধু সম্প্রজ্ঞাত জ্ঞান নয়, অসম্প্রজ্ঞাত জ্ঞান ও সমাধি।

উভয় সাধনার পথ আপাতঃ ভিন্ন বলেই মনে হয়। তন্ত্র যোগ হলেও তার স্বরূপ অন্যপ্রকার। পতঞ্জলির সাধনা বিশেষ করে' সমাধি,—সমাধির প্রকারবিশেষে প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরের ও পুরুষের প্রকাশ। সমাধি বা যোগ দুই প্রকার—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। যে যোগ সদ্ভূতির অর্থ প্রকাশ করে, ক্লেশ ক্ষীণ করে, কর্ম্মবন্ধন শ্লথ করে, চিত্তকে নিরোধ-অভিমুখী করে, তাই সম্প্রজ্ঞাত যোগ। এই যোগে বুদ্ধি হতে ভূত পর্য্যন্ত সকল তত্ত্বের জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়, বিষয় কিছুই অপ্রকাশ

থাকে না। এই সম্প্রজ্ঞাত জ্ঞানে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণের অতীত আর কোন জ্ঞানের সম্ভাবনা থাকে না।

এই যোগের দ্বারা গ্রাহ্যের ও গ্রহণের বা গ্রহীতার জ্ঞান হতে পারে। গ্রাহ্য বিষয়ে ভেদানুসারে সমাপত্তি তিন প্রকার : (১) বিশেষ যাবতীয় ভৌতিক বস্তুবিষয়ক (স্থূল পঞ্চভূতবিষয়ক), (২) সূক্ষ্ম বা পঞ্চতন্মাত্র-বিষয়ক, (৩) গ্রহণসমাপত্তি বাহ্য ও অভ্যন্তর ইন্দ্রিয়বিষয়ক। বাহ্য-ইন্দ্রিয় ত্রিবিধ—কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও প্রাণ। অন্তর-ইন্দ্রিয় মন বাহ্য ইন্দ্রিয়-গুলির নেতা। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন—এরা মূল অন্তঃকরণত্রয়। এদের উপরে সমাধিসম্পন্ন হলে' এদের নির্ম্মাণের. স্বরূপের ও ক্রিয়ার পূর্ণ জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে। যোগীর সম্প্রজ্ঞাত জ্ঞানে বিষয়ের সর্ব্বাংশের অবভাস। এই জ্ঞান বিষয়ের স্বরূপ নির্ণয় করে বলেই যোগীর বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ হয় না এবং তার ভিতর কোন তত্ত্ব দেখতে পান না বলে' যোগী বিষয়বিমুক্ত হন। করণগুলির উপর সমাধিতে যোগীর চিত্তে আনন্দ সঞ্চারিত হয়। এই সমাধি সাত্ত্বিক সঞ্চারসম্পৃক্ত বলে আনন্দ স্ফূর্ত্ত। সাত্ত্বিক সঞ্চার, কেন না, ইন্দ্রিয় প্রকাশধর্ম্মী।

এরূপ সমাধিতে অভ্যস্ত যোগী আরও সূক্ষ্মতর বিষয়ে সমাহিত হন। বিষয় ও করণগ্রাম ত্যাগ করে' যোগী তখন সকল জ্ঞানের গ্রহীতা—অস্মিতার উপর সমাহিত হন। অস্মিতা-বুদ্ধিও পুরুষের অবিবেকজনিত একাত্মতা—এ বুদ্ধি আমাদের ভিতর ব্যবহারিক দ্রষ্টা ও গ্রহীতা। এ গ্রহণেন্দ্রিয় (intellect) নয়—বস্তুতঃ গ্রহীতা (subject)।

যোগীর লক্ষ্য থাকে স্মৃতিপরিশুদ্ধ জ্ঞানের দিকে কি স্থূল কি সূক্ষ্ম বিষয়ে ; এরূপ জ্ঞান বিষয়মাত্র প্রকাশক। এতে বিশিষ্ট বিকাশ নেই। ইহা বিষয়ের স্বরূপপ্রত্যক্ষ। শব্দ-সঙ্কেতশূন্য কেবল অর্থমাত্র-নির্ভাসক জ্ঞান, সত্য বা ঋতজ্ঞান। স্থূল বিষয়ের এরূপ জ্ঞান নির্ব্বিতর্ক সমাধিতে

উৎপন্ন হয়। এরূপ জ্ঞানের পূর্ব্বেকার ভূমিকা সবিতর্ক সমাপত্তি—যেখানে জ্ঞান বাচ্য, বিষয় ও সংজ্ঞা দ্বারা বিশিষ্ট হয়ে উদ্ভাসিত। নির্ব্বিতর্ক জ্ঞানে কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না; "আমি জানিতেছি" এরূপ ক্রিয়াও থাকে না—বিষয়মাত্র উদ্ভাসিত হয়। যেমন স্থূল বিষয়ে, তেমনি সূক্ষ্মতর ধ্যানে বিষয়ের সূক্ষ্মতর অবস্থার চিত্তে প্রতিভাস। বিষয়ের স্থূলাবস্থার সূক্ষ্মাবস্থায় পরিণতি, যেমন তেজোময় স্পর্শের রূপতন্মাত্রে পরিণতি। এরূপ ধ্যানও শব্দ ও অর্থের দ্বারা অনুরঞ্জিত হতে পারে। যেমন রূপ, রস ইত্যাদি তন্মাত্রধ্যানে সাক্ষাৎকার হয়। এরূপ ধ্যান, অহঙ্কার, বুদ্ধিবিষয়েও হয়, এরা সূক্ষ্মবিষয় এবং এরূপ সূক্ষ্ম বিষয়ের ধ্যানই সবিচার।

আরও উচ্চতর ধ্যানভূমিকায় বৈশিষ্ট্যহীন কেবলমাত্র সূক্ষ্ম বিষয়ের ভাণ। এখানে বিষয় এত সূক্ষ্ম যে, বিষয়ের দেশ, কাল, নিমিত্তের কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না। এজন্য এরূপ সমাপত্তি সর্ব্ব দেশ ও কালব্যাপী বিষয়ের ও যুগপৎ সকল ধর্ম্মের অবভাসক কালিক, দৈশিক ও ধর্ম্মবৈশিষ্ট্যশূন্য হয়ে। এরূপ সমাধিও ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কারকে বিষয় করতে পারে। সেক্ষেত্রে সমাধি হয় গ্রহণবিষয়ক—এ সমাধিতে জ্ঞান নিরাবরণ সত্ত্বপূর্ণ। এজন্য ইহা সাত্ত্বিক সুখময় ভাণযুক্ত। এই আনন্দ সমাধি—করণব্যাপী একটা সাত্ত্বিক সুখময় সঞ্চারে পূর্ণ। এ সমাধি ইন্দ্রিয়, মন ও অহঙ্কারের কারণ অস্মিতা, অভিমানবিষয়ক। এই সব কারণের মূলীভূত কারণরূপে অস্মিতার প্রতীতি। ইহা অস্মিতারূপ অভিমান। এই অভিমানশূন্য হয়ে শুধু অস্মিতাজ্ঞানের উপর সমাপত্তি অস্মিতা-সমাধি। এই অস্মিতার উপরে প্রকৃতি বা অব্যক্ত—এ ধ্যানের বিষয় হয় না; কারণ, এ আলম্বনবিষয়ক নয়। ইহা ব্যক্তের লীন অবস্থা। নির্ব্বিচার সমাপত্তিতে সকল বিষয়ের গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতার প্রকাশ—জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ, যুগপৎ সকল বিষয়ের অবভাস। ইহা বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশ—কোন আবরণ

থাকে না—নির্ম্মল সত্ত্বের আবির্ভাব। এ শান্তিকর ক্রমহীন সর্ব্ববিভাসক বোধস্ফুট পূর্ণ প্রজ্ঞালোকে ঘনীভূত বস্তুর জ্ঞান। বস্তুর স্বরূপের অবভাস। এ জ্ঞান সত্য বা ঋতের ধৃতি—মিথ্যাস্পর্শহীন। যোগীর নির্ম্মল চিত্তসত্ত্বে কোন কিছু অপ্রকাশ থাকে না। ঋতম্ভরী প্রজ্ঞার উদয়ে যোগীর সার্ব্বজ্ঞ্য।

এই অস্মিতাধ্যান যোগীর প্রধান অবলম্বন। এইতো সকল জ্ঞানের আধার। এতে কিন্তু সূক্ষ্ম 'আমি' ভিন্ন আর কিছুরই ভাণ হয় না। এ প্রাণ, মন, শরীর হতে পৃথক "আমি" মাত্রের জ্ঞান। এতে ধ্যানমগ্ন চিত্ত তরঙ্গহীন সমুদ্রের ন্যায় শান্ত। এই অস্মিতার বিভিন্ন স্তরে ভাণ অনুযায়ী প্রকারভেদ আছে। এই অস্মিতার ভাণ বস্তুতঃ সর্ব্বত্রই সম্ভব, যেহেতু 'আমি' জ্ঞানে সবই উদ্ভাসিত। তবে প্রধানতঃ অস্মিতার সুস্পষ্ট ভাণ হয় হৃদয়ে, মস্তিষ্কে ও মস্তিষ্ক-উর্দ্ধে। যখন এরূপ কোন আধারে স্থিতিকে (location) অবলম্বন না করে' অস্মিতার ভাণ হয় তখনই শুদ্ধ অস্মিতার ভাণ। হৃদয় হতে অনন্তে প্রসারিত স্বচ্ছ আমিত্বের যে অনুভূতি তা বিষয়বতী, জ্যোতিষ্মতী বা বিশোকা। বিষয়জ্ঞানের আধিক্যহেতু ইহা বিষয়বতী। এখানে বিষয়প্রকাশ মুখ্য, 'আমি'-প্রকাশ গৌণ। ক্রমশঃ বিষয়বোধের প্রত্যাহারে প্রকৃত অস্মিতার সন্ধান। 'আমি'রূপ প্রকাশের (বৃত্তির নহে, সাংখ্যমতে অস্মিতা তত্ত্ব, আন্তর বৃত্তিমাত্র নহে) অনবচ্ছিন্ন সূক্ষ্মধারার স্ফুরণ। বিষয়বতী অস্মিতার দৈশিক ব্যাপকতা ও কালিক অখণ্ডতার অপসারণে প্রকৃত অস্মিতার সন্ধান। হৃদ্‌গত অস্মিতাতে শান্ত আনন্দবোধ। মস্তিষ্কগত অস্মিতার ধ্যান হৃদ্‌গত অস্মিতার ধ্যানের ন্যায় এক সাত্ত্বিকী দীপ্তিতে পূর্ণ। হৃদয় হতে যে সূক্ষ্মমার্গ উর্দ্ধে প্রসারিত, তার অভ্যন্তরস্থ বোধ শারীর অস্মিতা। জ্ঞানাত্মা অধিগম করে' তদুপরি যে অস্মিতামাত্রের বোধ, তাই সর্ব্বোচ্চ অস্মিতা।

এ জ্ঞানের সঙ্গে গ্রহীতার বোধ। মস্তিষ্কগত অস্মিতা অতিক্রম করে মস্তিষ্কের ঊর্দ্ধে বিস্তীর্ণ জ্ঞান-ধারায় সমাহিত হলে বিশ্বগত অস্মিতার পরিচয়। এই অস্মিতায় স্থিত হলে জ্ঞানাত্মার পরিবর্ত্তে বিশ্বাত্মার পরিচয় জন্মে। এই অস্মিতাই বিরাট্ আত্মা বা হিরণ্যগর্ভ। এই অবস্থায় বাহির ও ভিতর রূপ দৈশিক ভেদজ্ঞান থাকে না। এখানে সর্ব্বব্যাপিত্ব বিরাটের বোধ স্ফুট হয়। কিন্তু এ বোধও বিরাট্ অভিমানে রঞ্জিত, এ শুদ্ধ অস্মিতা নয়। শুদ্ধ অস্মিতায় কোন স্থিতি (location) নেই, আধারের বা বিশ্বের কোন স্থিতিকে নিয়ে এর প্রকাশ নয়। এ নিজেই কেন্দ্রহীন হয়ে স্ফুট—এ শুদ্ধাত্মা বা বিশুদ্ধ অস্মিতা। অস্মিতা-সাধনার ইহা অত্যুচ্চ শিখর।

পুরুষ এরও উপরে—শান্ত আত্মা। শুদ্ধ আত্মরূপ অস্মিতা স্বচ্ছ ও প্রশান্ত। শান্ত আত্মা সাত্ত্বিক স্বচ্ছতা, প্রকাশশীলতা হ'তেও মুক্ত। তিনি সকল বৃত্তিশূন্য—কেবলী, দৃশিমাত্র। শান্ত আত্মপ্রতিষ্ঠা অস্মিতাধ্যানে সহজ লভ্য। অস্মিতা এর অতি সন্নিকট তত্ত্ব। যে পথেই সাধক অগ্রসর হউন, এই অস্মিতাতে আরূঢ় হওয়া পরাবিজ্ঞানের নিশ্চিত পথ। বিবেকখ্যাতিপূর্ব্বক অস্মিতাসিদ্ধ সাধক পুরুষতত্ত্বে উপনীত হন। বিবেকখ্যাতি পরম প্রসংখ্যানের অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থা। বিবেকখ্যাতি পুরুষ-তত্ত্বকে প্রকৃতি হতে পৃথক করে দেখে এবং সাধক পরাবৈরাগ্যসম্পন্ন হন, এমতাবস্থায় প্রকৃতির অবসান হয়।

এই সাধনা প্রসংখ্যানপর। তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে করতে পুরুষ-তত্ত্বের উদ্বোধন। সাধনার প্রত্যেক স্তরটি বিশ্লেষণাত্মক। ধ্যান ও সমাধি এই বিশ্লেষণের সহায়ক। এই বিশ্লেষণ তত্ত্ববিশ্লেষণ, ধ্যান তত্ত্বে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তার স্বরূপ দর্শন করে। স্থূল হতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হতে কারণে, কারণ হতে পরমতত্ত্বে এর অধিরোহণ। এ সাধনায় কিছুই অজ্ঞাত থাকে না—কি প্রকৃতির বা কি পুরুষের। বিবর্ত্তনের সব

স্তরের জ্ঞানে বৈরাগ্য ; স্বাভাবিক বৈরাগ্যে বিবেক ; বিবেকে পুরুষের বোধ। সাংখ্যের তত্ত্বজ্ঞানে পরম প্রশান্তি ও জীবত্বের চিরতরে বিলীন। বিবেকখ্যাতিসম্পন্ন পুরুষ জীবনমুক্ত।

তন্ত্র ও পাতঞ্জলযোগে সমাধি ও সাধনা ঃ

তন্ত্রও যোগবিশেষ, এর সাধনাও বিশ্লেষণাত্মক ; হিন্দু-সাধনামাত্রই তত্ত্ব-উদ্ভাসক। তত্ত্বের অবভাস ভিন্ন জ্ঞান অসম্ভব। পরাজ্ঞানে সাধনা পর্য্যবসিত, পরাজ্ঞান না হলে সাধনা বৃথাশ্রম। কিন্তু তান্ত্রিক সাধনার বৈশিষ্ট্য এই যে, শক্তির ছন্দ এর মূল ভিত্তি। ছন্দই ক্রমিকরূপে তত্ত্ব প্রকাশ করে। এই জন্য তন্ত্রশাস্ত্রে সকল যোগের স্থান থাকলেও, শব্দ ও মন্ত্রচ্ছন্দের সাধনা বিশেষ স্থানাধিকার করেছে। যোগ, ধ্যান, বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান, পরাবিজ্ঞান সবই তন্ত্র-সাধনার অন্তর্গত ; কিন্তু এ সবই শক্তির ছন্দে সহজ ও সুলভ হয়। এইজন্যই তান্ত্রিক যোগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চিত্তকে ছন্দোবদ্ধ করা ; ছন্দের প্রকারবিশেষে বিশেষ তত্ত্বের উপস্থিতি।

তন্ত্র সত্তার সব স্তরকে বিশ্লেষণ করে। কেন্দ্রবিশেষে বিশেষ তত্ত্বের ক্রিয়া ও প্রকাশ। এই তত্ত্বগুলিকে জাগ্রত করে' এবং স্থূলকে সূক্ষ্মেতে লয় করে ক্রমশঃ উর্দ্ধে আরূঢ় হতে হয়। সব তত্ত্ব একই শক্তির সঙ্কুচিত অবস্থা। উর্দ্ধে প্রসারিত সত্তা সৃষ্টির মুখে হয় সঙ্কুচিত। শক্তির সঙ্কোচে আকাশাদি তত্ত্বের উদ্ভব। এই সব তত্ত্ব আপাতঃ জড়রূপে প্রতীত হলেও, এর মূলে বর্ত্তমান সক্রিয় শক্তি। জড়ত্ব শক্তির স্তব্ধ প্রকাশ। তন্ত্রের সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, তত্ত্বের সঙ্কুচিত বৃত্তি দূরীভূত করে' সত্তার স্তরে স্তরে মহান্ প্রকাশকে উদ্দীপিত করা এবং ক্রমশঃ পৃথ্বী, আকাশাদি তত্ত্ব ভেদ করে' প্রকৃতির অতীত হয়ে সদ্বিদ্যাদি তত্ত্বের স্বরূপ অনুভব করা এবং আরও উর্দ্ধে শক্তিতে পরাশক্তির সব প্রকাশ উত্তীর্ণ হয়ে সদাশিব ও পরমশিবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা। সাধনা অর্থেই

সঙ্কোচহীনতা—অনন্ত প্রসারিত সত্তায় অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পরম শান্ত শিবরূপে অবস্থিতি।

তন্ত্রের মূল সাধনা ছন্দঃ। তত্ত্ববিশ্লেষণ ও তত্ত্ববোধ ছন্দে সম্ভব হয়। গভীর ধ্যানে চেষ্টার অবকাশ নাই। ছন্দঃ স্বাভাবিক রূপে ধ্যান জাগিয়ে তোলে। মন্ত্রচ্ছন্দ চিত্তকে সমতায় অনুপ্রাণিত করে—চিত্তের বিভিন্ন স্তরগুলিকে উদ্ভাসিত করে। ছন্দই সুখকর ধ্যান প্রতিষ্ঠা করে। ধ্যান তো চিত্তের ছন্দবিশেষ; বিভিন্ন ছন্দে বিভিন্ন প্রকারের ধ্যান। ছন্দের গভীরতায় ধ্যানের গভীরতা ও তত্ত্বের বিকাশ। এই ছন্দঃ অনন্তাভিমুখে চিত্তকে উদ্বোধিত করে, চিত্তকে লয় করে। শতদল পদ্মের ন্যায় চিত্ত স্ফুরিত হয়ে ভক্তির, জ্ঞানের আবরণ উন্মোচন করে' মহাশূন্যে লয় হয়। ছন্দঃ শুধু বিশিষ্ট তত্ত্বরাজিকে উদ্বোধিত করে না—এ কেন্দ্রগতি; ছন্দঃ তত্ত্বকে উদ্ভাসিত করে' ক্রমশঃ প্রসারশীলতায় পরমতত্ত্বে পর্য্যবসিত হয়। ছন্দে সত্তার সৃষ্টি আবার ছন্দেই লয়। সৃষ্টির ছন্দ-সঙ্কুচিত বিজ্ঞানও প্রাণের ছন্দঃ, লয়ের ছন্দ-প্রসারিত বিজ্ঞানও প্রাণের ছন্দঃ।

তন্ত্রসাধনা তত্ত্বভেদের সাধনা। ছন্দে তত্ত্বভেদ হয়। প্রত্যেক তত্ত্বের বীজ আছে, তার স্থাননির্দ্দেশ আছে। এই বীজ তত্ত্বের বীজ, মহাশক্তির সঙ্কুচিত শক্তি; ঐ বীজ সাহায্যে শক্তি আন্দোলিত হ'লে তত্ত্বটির ভেদ হয়। ভেদ হওয়া অর্থে সঙ্কুচিত অবস্থার লয়। সে ক্ষেত্রে ঊর্দ্ধ অভিমুখী শক্তি কার্য্যকরী হয়। সঙ্কোচ অপসারণমাত্র ঊর্দ্ধ গতিশক্তি অন্য তত্ত্বে উপনীত হয়ে উহাকে আন্দোলিত করে। সেখানেও ছন্দঃ সঞ্চারিত করে' আরও ঊর্দ্ধমুখী হয়। শক্তির প্রসারিত ভূমিকায় স্বাভাবিকী গতি। একবার ছন্দঃ উদ্বোধিত হ'লে তার আর লয় হয় না; ছন্দ ধীরে ধীরে যেন সমস্ত সত্তাটি অধিকৃত করে। ছন্দঃ শক্তিকে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করে।

একবার উর্দ্ধ গতিচ্ছন্দ জাগ্রত হলে, ঐ ছন্দঃ নিজের পথ খুঁজে নেয় এবং বিশেষ মর্ম্মস্থানে আঘাত করে' নানাবিধ জ্যোতিঃ, জ্ঞান, হ্লাদ সঞ্চার করে। এই ছন্দপ্রেরণার ও গতির বিরাম হয় না, এর বিরামহীন অনুবৃত্তি তান্ত্রিক সাধনার এক চমৎকারিত্ব। এই ছন্দের এমনি আকর্ষণ যে, বিনায়াসে অন্তরবৃত্তিকে আকর্ষণ করে' সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতত্ত্বে অনুপ্রবেশ করায়। এ যেন ঐন্দ্রজালিকের সম্মোহিনী শক্তিতে চিত্তকে অবস্থা হতে অবস্থান্তরে উপনীত করে। যতই ছন্দ উর্দ্ধগতিসম্পন্ন হয়, ততই তার প্রসার ও গভীরতার বৃদ্ধি হয়—ছন্দঃ গভীর ছন্দে অনুপ্রবেশ করে; এর সাথে সত্তার গভীরতম কেন্দ্রে স্থিতি লাভ হয়। ছন্দের গতি এমনি যে, একবার উত্থিত হলে সহসা লয় না; ক্রমশঃ সূক্ষ্ম দ্যোতনার আকর্ষণে ছন্দের অনুবৃত্তি; কেন্দ্রস্থানে স্থিতি লাভ না করা পর্য্যন্ত তার শেষ হয় না। ক্লেশ দূরীভূত করে ছন্দ চিত্তকে স্বাচ্ছন্দ্যে পূর্ণ করে। চিত্ত-বিগলিত ক্লেশ হয়ে সহজেই মহিমা, গরিমা, লঘিমা, অণিমা প্রভৃতি বিভূতিসম্পন্ন হয়। ছন্দের সূক্ষ্মতায় ও বিশালতায় অবিদ্যার অপসারণ হয়, দৈবী সম্পদ্ ও বিদ্যার প্রকাশ হয়।

ছন্দঃ ও সমাধি ঃ

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, তান্ত্রিক সাধক অধ্যাত্মবহ্নিত্রয় আরোহণের পথে অনুভব করেন। অগ্নি গুহ্য হতে নাভিতে, সূর্য্য নাভি হতে বিশুদ্ধ চক্রে বা কণ্ঠে, কণ্ঠ চন্দ্রমা হতে উর্দ্ধে প্রসারিত। এগুলির উত্থানে শুধু সাত্ত্বিকী প্রভা নয়, সত্তার ব্যাপকতার বৃদ্ধি, জ্ঞানের প্রসার। এইগুলি সম্প্রসারিত হয়ে নীচেকার তত্ত্বগুলি ভেদ করতে করতে অগ্রসর হয়। দ্বিদলে উপস্থিত হলে আকাশ তত্ত্ব পর্য্যন্ত ভেদ হয়, তার উপরে ছন্দের অনুবৃত্তি হলে সহস্রারে শক্তি উপনীত হয়ে ক্রমশঃ সমাধিভাবাপন্ন করে। সমাধি এখানে প্রযত্নপর নয়। ছন্দের গতিতে উহা সহজসাধ্য

এই ছন্দোগতি দ্বারা বিরাট্ চেতনায় অনুপ্রবেশ হলে সদ্বিদ্যা, ঈশ্বর, সদাশিব তত্ত্বের স্থির অনুভব হয়।

জ্ঞান সঙ্কীর্ণ ভূমিকায় বদ্ধ থাকে না। চেতনা এ অবস্থায় শরীর, প্রাণ, মন, বিজ্ঞানের উর্দ্ধে উন্নীত হয়; এমন কি শরীরে 'অবস্থিতি' (location) শূন্য হয়ে বিরাটে 'অবস্থিতি'র অনুভব হয়। বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞানের প্রকাশ হয়; কিন্তু শরীরে কোন অবস্থিতি থাকে না; কারণ, তার অবস্থিতি শক্তিকে নিয়ে। সম্প্রজ্ঞাত অবস্থা হতে অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় সহজে স্থিতি লাভ হয়। সদাশিব তত্ত্বে অহং-এর প্রাথমিক প্রতিভাস। এতে কোন বিষয় উদ্ভাসিত হয় না। তন্ত্রমার্গে শক্তির ছন্দ একে অতিক্রম করিয়ে পরমশিবে পৌঁছিয়ে দেয়। সাংখ্যে প্রকৃতি ও পুরুষ দুই তত্ত্ব বলে' বিবেকপ্রধান সাধনা; কিন্তু তন্ত্রে শক্তি ও তত্ত্বের মধ্যে কোন ভেদ নেই বলে' শক্তিই সব সঙ্কোচ, এমন কি চৈতন্যের প্রাথমিক সঙ্কোচ পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়ে পরমশিবে অবস্থিতি করায়। প্রকৃতি ভেদ হয়ে যায় সদ্বিদ্যা স্তরে, তার উপর শক্তিই ক্রিয়াশীল হয়ে উচ্চতর ভূমিকাগুলি অতিক্রম করায়। পতঞ্জলি কোন পরাশক্তি (প্রকৃতির উর্দ্ধে) স্বীকার করেন না, এইজন্য প্রকৃতি অতিক্রম করে' কোন শক্তির স্ফুরণের সহিত সাংখ্যযোগীর পরিচয় হয় না। এমন কি হিরণ্যগর্ভ পুরুষ যার ভিতর সব জ্ঞানই 'উদ্ভাসিত', তিনিও প্রকৃতির উর্দ্ধে' কোন তত্ত্বের সংবাদ দিতে পারেন না। কারণ প্রোজ্জ্বল জ্ঞান সাত্ত্বিক দীপ্তি সবই প্রকৃতির অন্তরে, উর্দ্ধে নয়।

* *
*

শক্তি ও কলা

মহাশক্তি ভিন্নও তন্ত্রে নানা শক্তির কথা আছে। এই শক্তিসকল মহাশক্তির নানা রূপের ও ক্রিয়ার প্রকাশ। কখনও মন্ত্র ও তদ্দেবতাকে শক্তি বলা হয়, কখনও ভিন্ন ভিন্ন পদ্মনিহিত শক্তিকে শক্তি বলা হয়—এগুলি চিতি-শক্তির বিভিন্ন কেন্দ্রের বিলাস-মূর্ত্তি।

কলা অর্থে অংশ। প্রাথমিক বিসর্গরূপে এর ব্যবহার হয়। এ হতে উত্থিত হয় অন্যান্য শক্তি। এসব শক্তি অনেকরূপে কার্য্যকরী হয়। কামকলাবিলাসে বলা হয়েছে—প্রাথমিক বিন্দু নবধা শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়। বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী, অম্বিকা, পরা, ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া ও শান্তা। এসব শক্তিবিন্দুর সক্রিয় সাকার প্রকাশ। প্রাথমিক স্পন্দন নানারূপে বিচ্ছুরিত হয়। বামকেশ্বর তন্ত্রে আছে—যখন পরম কলা পরমেশ্বরের সৃজনস্ফূর্ত্তি দেখতে পান, তখন তিনি পরা-বাক্। যখন তিনি সৃষ্টিবিকাশে রত বা মগ্ন, তখন তাঁকে বলা হয় বামা। ক্ষেমরাজ স্বচ্ছন্দ তন্ত্রে শক্তির প্রকাশবিশেষকে কলা বলেছেন, যথা—সিদ্ধি, দ্যুতি, লক্ষ্মী, কান্তি; কিন্তু বিভিন্ন (ষট্চক্র) কেন্দ্র-নিহিত শক্তিকেও শক্তি বলা হয়।

কুণ্ডলিনীর জাগরণে এসব শক্তি ক্রিয়াশীল হয়—এরা বিভিন্ন স্তরে জ্ঞান দেয়। প্রত্যেক কেন্দ্রের শক্তি সঞ্চালনে কেন্দ্রশক্তির সঙ্কোচের নিবৃত্তি এবং কেন্দ্রে শান্তি ও আলোর প্রতিষ্ঠা। এই শক্তি সঞ্চারে সত্তা পূর্ণ হয় এবং চতুর্দ্দিকে বিকীরিত হয়ে একটা নবীন ভাব-জগতের স্ফূর্ত্তি করে। সারদাতিলকে বলা হয়েছে—কুণ্ডলিনী যদিও মূলাধারে বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল ও দীপ্ত, তবুও ইহা পদ্মে পদ্মে আনন্দে নৃত্য করে এবং তার স্বরূপ প্রকাশ করে। কুণ্ডলিনীর উত্থানে বিভিন্ন চক্রগুলির সুপ্ত শক্তিগুলি জাগ্রত হয়; সকল শক্তিগুলি যদিও একই শক্তিরই

প্রকার, তা' হলেও তাদের ক্রিয়ানুযায়ী তাদের বৈশিষ্ট্য আছে। কোনটি প্রাণের সমতায়, কোনটি ভাবের ছন্দে, কোনটি শব্দোল্লাসে ব্যক্ত হয় এসব শক্তির পরিচয় সম্ভব নয়, যদি কুণ্ডলিনীর স্পর্শে এদের উত্থান না হয়। ষট্চক্র-নিরূপণে বিভিন্ন শক্তির কথা বিশদরূপ বর্ণিত আছে। এই শক্তিগুলি আমাদের সত্বার বিভিন্ন অংশের সহিত যুক্ত, যখন এরা জাগ্রত হয়, তখন এসব অংশ তীব্ররূপে ক্রিয়াশীল হওয়ার জন্য জ্ঞানের বিকাশ হয় আশ্চর্য্যরূপে; এমন কি এসব কেন্দ্রের আবরণ একেবারেই দূরীভূত হয়—কেন্দ্রে চিত্ত (psychic) শক্তির সহিত বিশ্ব (cosmic)-শক্তির প্রকাশ হয়। তন্ত্রমতে আমাদের প্রত্যেক শক্তি-কেন্দ্রের সহিত তত্বের সম্বন্ধ—এই তত্বের সহিত সৃষ্টির স্তরের সম্বন্ধ। কেন্দ্রবিশেষে বিশেষ তত্বের প্রকাশ—কেন্দ্রগুলির দ্বারোদ্ঘাটিত হ'লে বিশ্ব-তত্বের উদ্বোধন হয়। অধ্যাত্মশক্তিগুলি আধিভৌতিক ও আধিদৈবিকের সহিত সমন্বিত। একের উন্মেষে অন্যের উন্মেষ। এই জন্য সিদ্ধ সাধকেরা অতিমানবীয় শক্তির অধিকারী হন। শক্তির উন্মেষে প্রকৃতির আবরণ ও বাধা দূরীভূত হয়। যখন সিদ্ধ সাধক নানাবিধ উন্মুক্ত শক্তির অধিকারী হয়েও, সে সব শক্তির মহিমা ও সাত্তবিকতায় আকৃষ্ট হন না, তখনই তাঁর অবিপ্লবা শান্তি-লাভ। এই শান্তি ও স্থিতি লাভ করলে সিদ্ধ মানব বিশ্বদৃষ্টিতে (cosmic vision) ক্রিয়াশীল হন। জ্ঞান হয় অবাধিত—ইচ্ছা অপ্রতিহত। যোগী শুধু শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হন না, শক্তিশালীও হন। কিন্তু সৃষ্টির কোন ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ করেন না—কারণ, সৃষ্টি-পরম্পরার ধারা যে এক সুনির্দ্দিষ্ট পথে আবর্ত্তিত হচ্ছে, তদ্বিষয়ে তিনি হন চক্ষুষ্মান্। যদি তিনি আধিকারিক পুরুষ হন, তবে মহাশক্তি বা সম্ভূতি তাঁকে অবলম্বন করে' সৃষ্টির ব্যাপার সাধিত করেন। কলার ক্রিয়াশীলতায় মানবত্বের অভিব্যক্তি আরও সুন্দর হয়। সুপ্ত শক্তিকেন্দ্র জাগ্রত হ'লে শুভ্র মানবত্বের স্বচ্ছ বিকাশ হয়। শুধু প্রাণ ও মন

নয়, বিজ্ঞানের ক্রিয়া আরম্ভ হয়—বৃহত্তর প্রাণ, ব্যাপকতর মন, শুদ্ধ বিজ্ঞান স্ফুরিত হলে মানবত্বের অভিব্যক্তি হয় শোভন ও কল্যাণরূপে।

পরস্পর শক্তিকেন্দ্রগুলির মধ্যে এমনই সম্বন্ধ আছে যে, এক ক্ষেত্রে শক্তি জাগ্রত হ'লে, এর প্রভাব অন্য কেন্দ্রে পতিত হয় এবং তাকেও কার্য্যকরী করে' তুলে। শক্তির স্বভাবই এই। সমগ্র সত্বার বিভিন্ন কেন্দ্রে এমনই পারস্পরিক সমবেদনা (sympathy) আছে, যা' অবরোহ ও আরোহকে করে সরল ও স্বাভাবিক।

উচ্চতর কেন্দ্রে শক্তি ক্রিয়াশীল হ'লে আমাদের চেতনা হয় বিশ্বতোমুখী। শক্তির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রকার ভাব ও ক্রিয়ার বিকাশ হয়—স্বচ্ছতায় ও উজ্জ্বলতায় পূর্ণ। শ্রেষ্ঠ শক্তিতেই উর্দ্ধতম কেন্দ্রে নির্ব্বাণকলা ও নির্ব্বাণ-শক্তি বিকশিত হয়। নির্ব্বাণ-শক্তি সৃষ্টির মূলকেন্দ্রের পরমা শক্তি। ষট্চক্রনিরূপণে উক্ত হয়েছে—কোটি সূর্য্যালোকের স্বচ্ছতায় এ পূর্ণ—আনন্দে ও জ্ঞানে মিলিত।

প্রত্যেক চক্রের নিজস্ব শক্তি ও প্রকাশ আছে। উচ্চতর কেন্দ্রগুলি আনন্দ-সংবেদ বা শক্তিসংবেগ অপেক্ষা জ্ঞানে পূর্ণ। আজ্ঞাচক্রে সূক্ষ্ম জ্ঞানে সূক্ষ্মতর ইচ্ছা চালিত হয়। হৃদয়কেন্দ্রে শক্তি চালিত হয়ে আনন্দের বিলাস ও জ্যোতিষ্মান্ প্রত্যক্ষ হয়। হৃদয়কেন্দ্র চিত্তসংবিদের (psychic) স্থান—জ্যোতির্ম্ময় আলোকে পূর্ণ। এই জ্যোতির্ধারায় সত্বা সিঞ্চিত হয়। মানিনীবিজয়োত্তর তন্ত্রে উক্ত হয়েছে—হৃদয়কেন্দ্র হ'তে জ্যোতির্ধারা নির্গত হয়ে মস্তিষ্কে মহাপ্রাণে যুক্ত হয়—এখানে কোটি সূর্য্যের প্রকাশ (শ্লোক ১৬)। নাভিচক্রে শক্তির ক্রিয়াশীলতায় প্রাণক্রিয়া শুদ্ধ, স্বচ্ছ ও শক্তিশালী হয়। নবীন আলোকে এবং শক্তিতে পূর্ণ হয়ে সত্বা হয় জাগরিত। স্বচ্ছতর, গভীরতর, উচ্চতর বিকাশের সম্ভব হয়। বিচ্ছুরিত স্পন্দন ও আহ্বান জ্যোতির্ধারায় ঘনীভূত হয়ে দিব্য প্রজ্ঞার শান্ত ঔজ্জ্বল্য বিকশিত হয়। জ্ঞানসূর্য্য ক্ষণিকের জন্য স্বচ্ছ

সত্ত্বার উপর কিরণসম্পাত করে, যেমন নবোদীয়মান সূর্য্য তুঙ্গভেদী তুষারাচ্ছন্ন হিম-শৃঙ্গের উপর কিরণসম্পাত করে' থাকে।

ঊর্দ্ধমানস (Super-conscious) লোকের শক্তি অধিমানসের (Sub-conscious) গহনে অবতরণ করে' সাধকের প্রাচীন সংস্কার-রাজিকে (মনের ও প্রাণের) এবং অধ্যাত্মজীবনের বাধাগুলিকে অপসারিত করে। আরোহ ঊর্দ্ধমানসের প্রজ্ঞা ও জ্যোতিঃর সহিত পরিচয় করায়, অবরোহ সেই প্রজ্ঞাজ্যোতিঃতে অধিমানসকে জ্যোতির্ম্ময় ও ভাস্বর করে। ঊর্দ্ধ ও অধঃ—দুই-ই জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হয়। সাধারণতঃ কুণ্ডলিনীযোগে শক্তির উত্থান মূলাধারেই হয় এবং সেখান হ'তে শক্তিকে ঊর্দ্ধে পরিচালিত করা হয়। এই পদ্ধতি তান্ত্রিক সম্প্রদায়ে প্রচলিত। কিন্তু নির্ব্বিঘ্ন পথ হচ্ছে শক্তিকে হৃদয়কেন্দ্রে পাওয়া এবং সেখান হতে তাকে ঊর্দ্ধে অতিমানসে সঞ্চালিত করা। অতি-মানস কেন্দ্রে শক্তি স্থিতিলাভ করলে প্রজ্ঞালোকের হয় জাগরণ। এই প্রজ্ঞালোকের সহিত ঊর্দ্ধকেন্দ্রের এবং অধঃকেন্দ্রের সংযোগ। প্রজ্ঞালোক (বুদ্ধির ক্ষেত্র) নির্ম্মল উজ্জ্বল সত্ত্বে দীপ্ত। এই সত্ত্বের আবির্ভাবে ঊর্দ্ধপ্রদেশ ও অধঃপ্রদেশ উদ্ভাসিত হয়। ঊর্দ্ধের আলোক ও শক্তিসম্পাতে আধারের নিম্নতম প্রদেশও আলোকময় ও স্বচ্ছ দীপ্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠে। এই অতিমানস প্রজ্ঞালোক আমাদের স্থূল আধারের অতীত। এইরূপ প্রজ্ঞালোক ও শক্তি মিলিত হ'লে আমাদের স্থূল সত্ত্বাও সূক্ষ্মের তেজে পূর্ণ হয় এবং পূর্ণরূপে ইহা অধিকৃত হয়। কিরূপে শক্তিকে বর্ণমালার দ্বারা ঊর্দ্ধে ও অধঃদেশে চালিত করা যায়, তার উপদেশ তন্ত্রে বিশদরূপে আছে। কোথাও শক্তিকে ঊর্দ্ধ হতে অধোমুখে চালিত করবার উপদেশ, কোথাও শক্তিকে নিম্ন হ'তে ঊর্দ্ধে এবং ঊর্দ্ধ হ'তে পুনরায় নিম্নে চালিত করবার উপদেশ তন্ত্রে আছে। দুই পথই কার্য্যকরী। ব্যক্তিবিশেষের প্রবণতা ও সত্ত্বানুযায়ী পথের নির্দ্দেশ। আসলে ব্যাপার হচ্ছে এই,

যখন সত্তার সব গ্রামে শক্তি সঞ্চালিত হয়, তখনি অধ্যাত্মবোধের স্ফুরণ। অধ্যাত্মতেজ তখন বিস্ফারিত হয়ে' শক্তিপুঞ্জ রচিত করে।

এক এক সময়ে শক্তির সঞ্চারে সত্তার কেন্দ্রগুলি হয় স্পন্দিত। সে দীপ্ত শক্তিকে কোন স্বার্থসাধনে নিয়োগ করা অনুচিত। এরূপে নিযুক্ত হলে, সাময়িক প্রয়োজন মিটুতে পারে; কিন্তু শক্তির এ তো অকিঞ্চিৎকর দান! পূর্ণ নিয়তি বা ফল তখনি সম্ভব, যখন শক্তির প্রবাহ হয় স্বাভাবিক; এর স্বাভাবিক গতি হয় প্রসারিত প্রজ্ঞা ও মুক্তির বৈভবের দিকে। এই তার শ্রেষ্ঠ দান হলেও, শক্তি নানাবিধ সিদ্ধিও দিতে পারে—সবই নির্ভর করে কিরূপে শক্তিকে চালিত করা হয় তারই উপর। ভোগৈশ্বর্য্য ও মুক্তি দুইই শক্তির দান—আরোহে মুক্তি, আরোহ ক্রমে বিশ্ব হয় অতিক্রান্ত এবং অবরোহে বিশ্বানুপ্রবেশ, যোগৈশ্বর্য্যলাভ। প্রথমটিতে শক্তি শান্ত, দ্বিতীয়টিতে শক্তি বিশ্বকার্য্যে নিযুক্ত।

এই আরোহ-অবরোহের দ্বারাই দিব্যশক্তির সামগ্রিক পরিচয় ও তার অপ্রতিহত ক্রিয়াশীলতায় গভীর বিশ্বাসের উৎপত্তি। কুণ্ডলিনীর জাগরণ শুধু আরোহ-অবরোহের মানসিক ভাবনার দ্বারাই সম্ভব নয়। মানুষের অধ্যাত্ম-নিয়তির উপর পূর্ণ বিশ্বাস, অধ্যাত্মশক্তির উপর পরমশ্রদ্ধা ও আত্মসমর্পণ এবং ইহাকে আনন্দসহকারে গ্রহণ—এই দেয় এই পথে সিদ্ধি। এইজন্যই আরোহ ও অবরোহে এক বিশুদ্ধ আস্পৃহায় মহাশক্তির আহ্বান আবশ্যক। এতেই হয় নিশ্চিত উদ্বোধন। এ না হলে সমস্ত সাধনা ব্যাপারটি হয় প্রাণহীন ও উদ্দীপনাহীন অভ্যাস মাত্র। অধ্যাত্মসম্পদ-অধিকারের জন্য সাধনা হওয়া চাই গভীর ও তীব্র—তীব্র-সংবেগীর সিদ্ধি আসন্ন। আরোহ ও অবরোহক্রমে সত্তার বিভিন্ন কেন্দ্রের ভিতর সামঞ্জস্য ও ছন্দঃপ্রতিষ্ঠা হয়—প্রাণে, মনে, বিজ্ঞানে ও স্থূলদেহে সর্ব্বত্র এই অধ্যাত্মশক্তি সমর্থ ও ক্রিয়াশীল হয়। তন্ত্র জীবের পূর্ণ সত্তাকে জাগরণ করার কৌশল ও ইঙ্গিত দিয়ে থাকে।

আরোহ ও অবরোহের প্রয়োজনীয়তা আছে। অবরোহ সৃজনের বিকাশ, সৃজনের বৈচিত্র্যে স্ফূর্ত্ত মহাশক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে বর্ণমালারূপে প্রকাশিত হয়। পরাবাকের কেন্দ্রীভূত বিকাশ মাতৃকা। প্রত্যেক মাতৃকায় বিশেষ শক্তি আছে। প্রত্যেক মাতৃকা চিত্ত ও প্রাণ-কম্পন সৃষ্টি করে—প্রত্যেকেই বিভিন্ন ভাব-স্পন্দনে স্পন্দিত করে; অবরোহক্রমে শক্তির সূক্ষ্ম ভাব-স্পন্দন হ'তে স্থূল ভাব-স্পন্দনের সহিত পরিচিত হই। অবরোহ-বিজ্ঞান সূক্ষ্ম হতে স্থূলের উপলব্ধির সাক্ষাৎ অনুভব দেয়—কিরূপে সূক্ষ্মে ও স্থূলে যোগাযোগ উৎপন্ন হয়, তার জ্ঞান হয় সুস্পষ্ট।

মাতৃকা ক্রিয়াশীল হলে শক্তির সঞ্চারে সিদ্ধিলাভ হয়—মাতৃকা মাত্রই কিছু না কিছু শক্তিকে পুষ্ট করে—কিন্তু অবতরণে সমগ্র মাতৃকা চালিত হ'লে সিদ্ধি হয় করতলগত; সৃজনের শক্তি-উদ্বোধিত হ'লে সাধক যে কোন ভূমিকায় শক্তি বিস্তার করতে পারে। কিন্তু এ পথে বিপদ এই যে, শক্তির রমণীয় বিকাশে, নানা সিদ্ধিলাভে সাধক এমনি মগ্ন হয়ে পড়তে পারে যে, শেষ পর্য্যন্ত অনাসক্তি পূর্ণরূপে রক্ষা করতে পারে না—সৃজনবৈভবে পূর্ণ হয়ে সৃষ্টিতেই মগ্ন হয়। এই অনাসক্তি সম্ভব হয় না, যদি সাধক আরোহ-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না হয়। আরোহ দেয় লয়ের প্রসারতা, অনাসক্তি ও জ্ঞান। এইজন্যে তন্ত্রে আরোহক্রমে লাভ হয় সমাধি ও সমাধিলব্ধ প্রজ্ঞা। শক্তি আরোহক্রমে মূলে অন্তর্হিত হয়ে—সূক্ষ্ম ও কারণ অতীত হয়ে কারণাতীতের দেয় সন্ধান।

আরোহে বর্ণমালা বিলোমক্রমে মহাশক্তিতে লয় পায়—এই বিলোমে স্থূল কেন্দ্রশক্তি সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম কারণে, কারণশক্তি মহাকারণে লয় পায়। আরোহে ব্যাপকতর সত্তা ও জ্ঞানের অনুভব হয়, সাধকের কেন্দ্রীভূত জ্ঞান প্রসারিত জ্ঞানে, কেন্দ্রীভূত আনন্দ প্রসারিত আনন্দে, কেন্দ্রীভূত চেতনা প্রসারিত চেতনায় লীন হয়। এই আরোহে লয়

হয় স্বাভাবিকভাবেই, চেষ্টা করে' লয় প্রতিষ্ঠা করতে হয় না। স্বতঃই শক্তি কেন্দ্রগ হয়ে লয়মুখী হয়।

আরোহ ও অবরোহের বিজ্ঞানদীপ্ত সাধক অধ্যাত্মসম্পদে গরীয়ান্ এবং মুক্তির অনুপম স্বাতন্ত্র্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। যে কোন ভূমিকাতে তিনি স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারেন। বর্ণমালাই হচ্ছে অতিমানস ও অধিমানসে প্রবেশ করবার স্বাভাবিক পথ এবং অতিমানস ও অধিমানসের সম্বন্ধসূত্র। এই বর্ণমালার সাহায্যে উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরে, আবার নিম্ন হতে নিম্নতর স্তরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। এতে আমাদের সত্ত্বা হয় স্বচ্ছ। এই অবরোহ ও আরোহ অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে সমাধির সহিত শক্তির স্বাধীন ও স্বাভাবিক গতির পরিচয় করিয়ে দেয়। আরোহ না হলে জ্ঞান হয় না। কিন্তু জ্ঞান যদি কর্ম্মের প্রেরণা না দেয়, তবে জীবনের সবটার সহিত পরিচয় হওয়া যায় না। আরোহের পর অবরোহক্রমে প্রকৃতি অনমনীয়তাও স্থূলতাকে জয় করে' চিতিশক্তির বিকাশের সুন্দর সুগম পথ রচনা করে' দেয়। প্রায়শঃই মনে হয় যে, অবরোহ বন্ধন মুক্ত করে না। এ সত্য, কিন্তু আরোহের পর অবরোহ মানুষের ভিতর নবীন শক্তির সঞ্চার করে' প্রাণ, মন ও বিজ্ঞানে আমাদের সত্ত্বাকে দিব্যকর্ম্মে নিয়োজিত করে। একবার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হ'লে কেন্দ্রচ্যুতি কখনও হয় না। কেন্দ্রে স্থিত হয়ে বিরাট্ শক্তির আহ্বানে সিদ্ধ সাধকের নানা কর্ম্মশক্তি স্ফুরিত হয়; কিন্তু এ কর্ম্ম তখন তিনি আধিকারিক পুরুষরূপেই সম্পন্ন করেন—কারণ, জীবত্ব বিলীন হয়ে থাকে আরোহের পথে। যখন সত্ত্বা জ্ঞানসূর্য্যের আলোকে দীপ্ত, মহাশক্তির উদ্বোধনে পূর্ণ জাগ্রত—তখন তার বিন্দুমাত্র লঘুতা থাকে না; মহাশক্তির অধিকৃত সত্ত্বা তখন বিশ্বব্যাপারে নিযুক্ত হয়ে বিশ্বকর্ম্ম সম্পাদন করে, অথচ কেন্দ্রচ্যুত এতটুকুও হয় না।

* * *

তন্ত্রের সাধনা ও সিদ্ধি

কুণ্ডলিনী যোগ ঃ

তন্ত্রসাধনার প্রধান ভিত্তি কুণ্ডলিনী যোগ। এটা তন্ত্রের প্রধান সাধন। তন্ত্রে এর সুষ্টু প্রকাশ হয়েছে।

কুণ্ডলিনী মানুষের ভিতর সুপ্ত অধ্যাত্মশক্তি। কুণ্ডলী বলয়াকৃতরূপে থাকে বলেই ইহা কুণ্ডলিনী। এই শক্তি মূলাধারে সংগৃহীতভাবে থাকে। এই শক্তি সর্ব্বত্রই বিরাজমান। এ বিশ্বশক্তি। অণুপরমাণুর ভিতরেও আছে। মানুষের ভিতর এ অত্যন্ত কার্য্যকরী। এই সংগৃহীত সর্ব্বব্যাপী শক্তির তুলনায় যে শক্তি আধারে ভিতর ক্রিয়াশীল, তাহা মহাসমুদ্রে বিন্দুর ন্যায়। এই সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করেই মানুষের অভিব্যক্তির আরও উর্দ্ধতর উজ্জলতর প্রকাশ সম্ভব। তন্ত্রের অধ্যাত্মকৌশল এই শক্তিকেই জাগ্রত করা। সাধারণতঃ একে একটী সূক্ষ্ম শক্তিরূপে অনুভূত হয়—যা আমাদের শরীরান্তর্গত একটী সূক্ষ্মমার্গে প্রবাহিত হয় এবং ধীরে ধীরে স্থুল শরীরের উর্দ্ধে প্রবেশ লাভ করে। সারদাতিলকে বলা হয়েছে, এ শক্তি বিদ্যুল্লতার ন্যায়। কুণ্ডলিনী যখন সুপ্ত, ক্রিয়াহীন, মানুষ তখন তার সাধারণ জ্ঞান ও শক্তি নিয়ে কাজ করে। কিন্তু কুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে মানুষের ভিতরে দিব্যশক্তি ও বল আবির্ভূত হয়। কুণ্ডলিনী শক্তি উর্দ্ধগামী হলে আমাদের সত্তার সকল স্তরগুলি বিকশিত হয়ে উঠে, জীবন নবীন ছন্দে স্পন্দিত হয়, জ্ঞান প্রসারতা লাভ করে। ইহা কিছু অলৌকিক নয়, মানুষের ভিতরে যে পূর্ণ অভ্যুদয়ের বীজ নিহিত আছে তারই বিকাশ। মানুষ এই শক্তির বিকাশে তার বর্ত্তমান সত্তা ও জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতাকে অতিক্রম করে এবং নবীন শক্তি উর্দ্ধতর জ্ঞান-মণ্ডিত হয়ে দিব্য জীবনের বিকাশের জন্য প্রস্তুত হয় এবং মানুষের অন্তর্নিহিত সত্ত্বাকে জাগ্রত করে, মহিমামণ্ডিত করে। এ অবস্থায় সাধক

তার সর্ব্বশক্তিতে সম্ভাব্য পূর্ণবিকাশ লাভ করে নাই। অভ্যুদয়ের গতি আরও উর্দ্ধতর বিকাশের দিকে ধাবিত হ'লে মানুষ তার জ্ঞান ও শক্তির সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়। একমাত্র কুণ্ডলিনীর জাগরণেই অসাধারণ সূক্ষ্ম জ্ঞান ও মনীষা এবং নবীন কর্ম্মশক্তি প্রকাশিত হয়।

এ ধারণা সত্য নয় যে, কুণ্ডলিনী যোগ তন্ত্রেরই একটা কিছু সম্পূর্ণ নূতন কৌশল। প্রত্যেক অধ্যাত্মমার্গে--কি ভক্তি, কি জ্ঞান, কি যোগ-- কুণ্ডলিনীশক্তি ক্রিয়াশীল। যখন জ্ঞানে বা প্রেমে বা ধ্যানে আমাদের সত্তা প্রশান্ত হয়, তখনই কুণ্ডলিনীর জাগরণ হয়, যদিও এ জাগরণ সম্বন্ধে অনেক সময়ই আমরা থাকি অজ্ঞাত। এই অধ্যাত্মশক্তির উন্মুক্ত গতি বা দিব্য ভাবসঞ্চারের ফলে, নবীন দৃষ্টি খুলে দেয়, জীবনে স্ফূর্ত্তি নিয়ে আসে, আমাদের দিব্য স্বভাবকে জাগ্রত করে। তন্ত্রসাধনা প্রধানতঃ এই কুণ্ডলিনীর জাগরণ ও তার পরিচালনা, যাতে মানুষ তার সঙ্কীর্ণ পরিধি অতিক্রম করে' বিশালতায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

কুণ্ডলিনী ও জীবনীশক্তিঃ যেথানেই জীবনের স্পন্দন আছে সেখানেই এই শক্তি ক্রিয়াশীল। জীবজগতের সকল স্তরেই ইহা বিদ্যমান, কিন্তু এর পূর্ণ বিকাশ অধ্যাত্ম জীবনেই দেখা যায়—সেখানে ইহার প্রবাহ—ইহার বিস্তৃতি এবং বিকাশ—অপরোক্ষজ্ঞানের বিষয়। অধ্যাত্মজীবনে প্রবেশের সাথে সাথে ইহার স্পন্দন অনুভব করা যায়। এর আকর্ষণ—নবীন জীবনী শক্তি এবং জ্ঞান সঞ্চার। প্রাণস্পন্দন কুণ্ডলিনী জাগরণে দ্রুততর হয় এবং ধীরে ধীরে এই কুণ্ডলিনী শক্তি প্রাণকে এমনিভাবে সংযত ও চালিত করে যে, এ ক্রমশঃ হয়ে ওঠে শান্ত, আনন্দপ্রদ এবং গভীর। এই প্রাণশক্তি শান্ত ও গভীর হয়ে নবীন সৃজনে উদ্বোধিত হয়। এ প্রাণকে উজ্জ্বল করে এবং অধিকতর শক্তিতে উদ্বোধিত করে। প্রাণের ক্রিয়া এত সহজ, সুন্দর ও প্রশান্ত হয় যে, কোথাও অজ্ঞান আঁধারের

অস্পষ্টতা থাকে। এই কুণ্ডলিনী আমাদের সত্ত্বাকে পরিপূর্ণ করে এবং সমস্ত গ্রন্থিকে পরিচালিত করে। কুণ্ডলিনী যেমন নবীন প্রাণশক্তি সঞ্চার করে তেমন জ্ঞানও উদ্বোধিত করে। নবীন জীবনে নতুন জ্ঞানের সমাবেশ হয়। এর প্রধান ক্রিয়া অনুভবশক্তিকে সব স্তরেই বর্দ্ধিত করা। কারণ এর কাজই হচ্ছে প্রাণের, হৃদয়বৃত্তির ও অধ্যাত্মশক্তির পরিপূর্ণ জাগরণ। কুণ্ডলিনীর জাগরণে নবীন অধ্যাত্মশক্তি সত্তার স্তরে স্তরে জাগ্রত হয়ে নবীন ভাব ও বিজ্ঞানের উদ্বোধন করে। এ শক্তি বিশ্বশক্তি, এর সামান্য বিকাশে বিশ্ব প্রাণের ও বিশ্ব বিজ্ঞানের পরিচয় ঘটতে থাকে। এ আমাদের প্রাণশক্তিকে বিশ্ব-প্রাণের দ্বারা এবং আমাদের জ্ঞানকে বিশ্ব-বিজ্ঞানের দ্বারা উদ্বোধিত করে। এই জন্যেই কুণ্ডলিনীর ক্রিয়ায় জ্ঞানের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জগৎ উদ্ভাসিত হয় যা স্বাভাবিক রূপে মন-বুদ্ধির দ্বারা বুঝতেও পারা যায় না। আমরা এমন এক জীবন লাভ করি যাতে আমাদের সত্তা হয় সুন্দরতর, জ্ঞান হয় গভীরতর এবং যা দেশ ও কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন হয় না।

কুণ্ডলিনীর জাগরণে অন্তর-বিজ্ঞানের সহিত বিশ্ববিজ্ঞানের সম্বন্ধের স্ফূর্তি হয়। কুণ্ডলিনী ইন্দ্রিয়ের, মনের, প্রাণের সূক্ষ্মবেদনা, দ্যোতনা ও স্পন্দনের পরিচয় দেয়; নবীনভাবে আমাদের সত্তার উদ্বোধন করে। এ জাগরণ অনুভূতির বিভিন্ন স্তরের বিকাশ করে—হৃদ্গত, বুদ্ধিগত ও পরম অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। এর জাগরণে শরীর, প্রাণ ও মন স্বচ্ছ হয় এবং শক্তির সূক্ষ্মতর স্পন্দনে আন্দোলিত হয়। প্রাণ নবীন শক্তিতে, আর অন্তর কমনীয় দীপ্তিতে পূর্ণ হয়। এই সংযত প্রাণের শক্তি বা প্রাণের স্ফূর্তিই আমাদের আকৃষ্ট করে। এ শক্তি উদ্বোধিত অন্তরের আরও গভীর প্রদেশে প্রবেশ করে। ভূঃ, ভূর্বলোক ও স্বর্লোকবাসীদের এমন কি সম্ভূতির শক্তির পর্য্যন্ত পরিচয় করিয়ে দেয়। বিশ্বের অন্তর্নিহিত অতিমানস পরিকল্পনার ও বিশ্বচক্রের পরিচালনাশীল শক্তিবর্গের স্বরূপের অনুসন্ধান দেয়।

আমাদের অন্তর-সত্তার কতকগুলি কেন্দ্র আছে—যাদের সহিত শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশের সম্পর্ক আছে। এই সব কেন্দ্রের শক্তি সাধারণতঃ সুপ্ত থাকে। কুণ্ডলিনীর উত্থানে এই সব শক্তিপুঞ্জ জাগ্রত ও ক্রিয়াশীল হয় এবং জ্ঞান ও শক্তিসমন্বিত করে। সকল কেন্দ্রেই একরূপ জ্ঞান সঞ্চারিত হয় না। কোন কেন্দ্র প্রাণ-জগতের, কোন কেন্দ্র সূক্ষ্ম মানস-জগতের, কোন কেন্দ্র বিজ্ঞান-জগতের, কোন কেন্দ্র ঊর্দ্ধতর জগতের জ্ঞান দেয়। এই কেন্দ্রগুলি ক্রিয়াশীল হলেই জ্ঞান প্রতিভাত হয়। শীর্ষদেশে কুণ্ডলিনী শক্তি শান্ত ও শুদ্ধ হয়; আধারে পরিপূর্ণ স্থিরতা ও শান্তি বিরাজ করে।

অতীন্দ্রিয়—মন ও বুদ্ধির অতীত—বিজ্ঞানের কেন্দ্র। এর নিম্নকার কেন্দ্রগুলি সূক্ষ্ম শক্তি ও জ্ঞানের পরিচয় দেয়, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্তরের প্রকাশ করে; কিন্তু শীর্ষদেশে এই সর্ব্বোচ্চ স্তরে জ্ঞানের স্বরূপ সকল রূপবিরহিত হয়ে প্রকাশমান। এই-ই পরম শক্তি—সত্তার পরম কেন্দ্র—কুণ্ডলিনী এই কেন্দ্রে পূর্ণরূপে বিস্তৃতি লাভ করে এবং পরমাত্মায় অবস্থান্তরিত লাভ করে। প্রশান্ত অবস্থিতি এবং মুক্তির স্বাধীন আনন্দ এ অবস্থায় বিরাজ করে।

কুণ্ডলিনীর জাগরণে চিত্ত-সত্তা দীপ্ত হয়। এই দীপ্তির পূর্ণতায় দিব্য সম্বিৎ ও শক্তির উন্মেষ। যখন এই সম্বিৎ ও শক্তি চিত্ত-সত্তাকে পূর্ণ অধিকার করে, তখন সাধক দিব্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সম্যক্‌রূপে এই শক্তিকে ব্যবহার করতে পারে। কুণ্ডলিনীর জাগরণে বিশ্ব-বিজ্ঞানের সব শক্তির সহিত পরিচয় ঘটে। যখন কুণ্ডলিনী কেন্দ্রে কেন্দ্রে ক্রিয়াশীল হয়, তখন মানুষের সত্তায় উচ্চতা ও ব্যাপকতা অনুভূত হয়, জ্ঞান হয় সব স্তরেই অপরোক্ষ, গতি হয় অপ্রতিহত। কিন্তু এ শুধু কুণ্ডলিনীর জাগরণের অবান্তর ফল; ইহার মুখ্য ফল বিশ্বও বিশ্বাতীত চেতনার পরিচয় এবং মনের, প্রাণের সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতা

হতে মুক্তি। শক্তির জাগরণমাত্রেই একটা সজীবতা, একটা অপার পরিসরতায় মন অভিভূত হয়।

সকল কেন্দ্রেই একইরূপ ভাবের অভিব্যক্তি হয় না, প্রত্যেক কেন্দ্রের নিজস্ব স্বরূপ ও ক্রিয়া আছে, নিজস্ব শান্তি ও ভাবের বিকাশ আছে। সাধারণতঃ মূলাধার হতে সহস্রার পর্য্যন্ত স্থানকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। মূলাধার হতে নাভিচক্র; নাভিচক্র হতে কণ্ঠচক্র, কণ্ঠচক্র হতে সহস্রার। প্রথম অংশে প্রাণশক্তি ক্রিয়াশীল, দ্বিতীয়ে প্রাণ ও মন ক্রিয়াশীল, তৃতীয়ে উর্দ্ধতর মন ও বুদ্ধি ক্রিয়াশীল। চেতনার ক্রিয়া সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, কিন্তু উর্দ্ধ স্তরে ক্রিয়ার স্ফুরণ অধিকতর। যারা যোগরত; তারা নিম্নকেন্দ্র ও উর্দ্ধকেন্দ্রের সহিত সামঞ্জস্য স্থাপনা করতে পারেন এবং উর্দ্ধের আলোক ও শক্তির সাহায্যে নিম্ন কেন্দ্রে তামসিক ও রাজসিক অপক্রিয়ার অপনয়ন করতে সমর্থ হন। এরূপ সাধক জ্যোতিঃস্নাত হয়ে আধারকে পরম পরিশুদ্ধি করে থাকেন। আধারের সুপ্ত শক্তিগুলি জাগ্রত হয়ে কেন্দ্রশক্তির সহিত যুক্ত হয়—এই যোগ ভিন্ন সমস্ত সত্ত্বার সমতা ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠা হয় না। শক্তি-চক্র ও শক্তিব্যূহ রচিত হয় এই কেন্দ্র শক্তিকে অবলম্বন করে'। প্রত্যেক কেন্দ্রগুলি নবীনভাবে স্পন্দিত হয়ে কেন্দ্র শক্তিতেই স্ফূর্ত্ত ও ক্রিয়াশীল হয়। এই শক্তির জাগরণে যোগ-ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি লাভ হয়। তন্ত্রসাধনায় বিভূতির বিকাশ অবশ্যম্ভাবী, কারণ সত্ত্বার প্রত্যেক স্তরে দিব্যশক্তির জাগরণ ঘটে। এই শক্তিব্যূহের রচনা ও অসাধারণ প্রকাশ শক্তির অভ্যন্তরেই বর্ত্তমান। জড় ও চেতনার ভেদ-সম্বন্ধ এই জগতেই সম্ভব। অপ্রাকৃত ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা নেই বলেই তার অসাধারণত্বেরও পরিচয় হয় না। উর্দ্ধদেশে চেতনা অবাধিত ও প্রসারিত—এ জ্ঞান কুণ্ডলিনীর জাগরণেই স্ফুট হয়। এ অবস্থায় প্রাণের, হৃদয়ের, মনের, বুদ্ধির সঙ্কোচবৃত্তি অপসারিত হয়। এইটিই অসাধারণ। কুণ্ডলিনী জাগরণের এই-ই বিশেষ বিকাশ।

কুণ্ডলিনীর কূজন ঃ কুণ্ডলিনীর শক্তি যেমন জাগ্রত ও ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে তেমনি ইহার কোমল কূজন ও বর্ণের মুগ্ধকর সমাবেশ আমাদের অন্তর পূর্ণ করে। বিশ্বপ্রাণের উদ্বোধনে জ্যোতিঃ ও শব্দছন্দ ক্রিয়াশীল হয়, অন্ধকার তিরোহিত হয়, এক নবীন সৃষ্টি মানসচক্ষে উদ্ভাসিত হয়, এক দিব্য শব্দলহরীতে অন্তর পূর্ণ করে। ইন্দ্রিয়গ্রাম ধীরে ধীরে কম্পিত হয়, ধীর স্পন্দনে সত্ত্বা জাগ্রত হয়। সমস্ত সত্ত্বা তেজোদ্দীপ্ত হয়। নিথর নীরবতায় রব আছে, দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আলো আছে। কুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে চিত্তস্বচ্ছতায় অদৃশ্য বর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়। একটি সঙ্গীত-সুধাধারা কোমল স্পর্শে সত্ত্বা আপ্লুত করে। কুণ্ডলিনীর জাগরণে মানসজ্ঞানের দৈশিক ও কালিক সীমা থাকে না, দৃষ্টি হয় অতিমানসিক। তত্ত্ব, প্রাণ, মন, অহঙ্কার, বুদ্ধিতত্ত্ব প্রকৃতিতত্ত্ব, সদ্বিদ্যাতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব এ সবেরই সহিত কুণ্ডলিনীর পূর্ণ জাগরণে পরিচয় ঘটে। শক্তির ছন্দোময় স্পন্দনে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের ভেদ দূরীভূত হয়, যেহেতু এ ভেদ স্পন্দনের তারতম্য হতে উৎপন্ন হয়ে থাকে। তত্ত্বতঃ শক্তি ভিন্ন আর কিছু নেই। শক্তি ঊর্দ্ধগামী হলে শক্তির সঙ্কুচিত বৃত্তি তিরোহিত হয় এবং অধ্যাত্ম-শক্তির ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূত হয়। সাধক তখন নানা বর্ণ, নানা রূপ, নানা শব্দ-ব্যঞ্জনায় অভিভূত হয় এবং ধীরে ধীরে এসবও এক মহাশূন্যে তিরোহিত হয়। চিত্তের এ প্রসারতায় সাধক মহা ধ্যানে মগ্ন হয়।

ইহা বলা প্রয়োজন যে, মহাশক্তির দ্বিধাকরণে (Polarisation) সৃষ্টির উৎপত্তি। শুদ্ধ ভূমিকায় শক্তির ক্রিয়া সুপ্ত থাকে। প্রশ্নোপনিষদে আছে, সৃষ্টিকাম হয়ে প্রজাপতি রবি ও চন্দ্রমার সৃষ্টি করলেন। রবি প্রাণের পুংশক্তি, চন্দ্রমা স্ত্রীশক্তি। সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির মূলে এই দুই শক্তি ক্রিয়াশীল—কোথায়ও পুংশক্তি (positive), কোথায়ও

স্ত্রীশক্তি (negative)। পুংশক্তি সৃজন ব্যাপারে রত, স্ত্রীশক্তিকে রূপ দিয়ে পুংশক্তি সৃষ্টি করে। প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থে এই দুই রূপ শক্তি ক্রিয়াশীল।

কিন্তু শক্তির এই পৃথকীকরণই শক্তির একমাত্র ক্রিয়া নয় সাধারণতঃ শক্তির সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে নিত্য উৎসর্জনের সহিত আমরা পরিচিত, কিন্তু শক্তির সমতার সহিত কাহারও পরিচিত হওয়া সম্ভব নয়, যদি শক্তির অতীত ভূমিকার দিকে দৃষ্টিপাত না করি। পাশ্চাত্যরাও শক্তিবাদী, কিন্তু তারা শক্তির এই সমতা দেখেন না। শক্তির সৃজন-ক্রিয়া তাদের যেমন আকর্ষণ করে, শক্তির সমতা তেমন আকর্ষণ করে না। নব নব সৃষ্টিতে শক্তির স্ফূর্তি আমাদের বিস্ময়াবৃত করে; তাতেই আমরা আকৃষ্ট, সৃষ্টির আনন্দের উদ্বেলতায় আমরা মুগ্ধ; কিন্তু শক্তি যেখানে সমতায় শান্ত, সেখানে আমরা আকৃষ্ট হই না; কারণ এই অবস্থায় যে শান্তি, ধৃতি ও জ্ঞানের প্রসারতা—তাতে আমরা জাগ্রত নই। শক্তির এই কেন্দ্র-গতি অনুসরণে শক্তির সৃজন-বৈভব ও কৌশলের চেয়ে ব্যাপক বৃত্তির পরিস্ফুট। এতে আছে শান্তি ও প্রসারতা, ও প্রাণের সংক্ষোভ হতে মুক্তি। মহাপ্রাণের ছন্দে জাগরিত হলে শক্তির সৃজন সঙ্কোচের স্থলে শক্তির সমতা ও ব্যাপকতার অনুভূতি হয়। এই অনুভব এমনি যে, এর পরিচয় হলে শক্তির দ্বিধাকরণ (polarisation) ভূমিকা অতিক্রম করে সমীকরণ ভূমিকার (depolarisation) দিকে আমরা ধাবিত হই; কিন্তু এতে আবশ্যক হয় যে সৃষ্টির উৎসর্জনের প্রতি অনাসক্তি, তা সর্ব্বত্র না থাকবার জন্য এ ভূমিকা আয়ত্ত করা শক্ত হয়। এই দ্বিধাকরণ ও সমীকরণ প্রকৃতির ভিতরও দৃষ্ট হয়, প্রকৃতি এইভাবে তার সৃজন শক্তি ও সংরক্ষণ শক্তি রক্ষা করে। জীবনের মূলে আছে ক্রিয়া ও সমতা। অধ্যাত্ম-জীবন শক্তির সমীকরণ—

শক্তির দ্বিধাকরণ ও সঙ্কীর্ণতা হতে মুক্তি। সাধারণ সৃষ্টির গতি অধ্যাত্ম জীবনের গতির বিপরীত।

অধ্যাত্ম-জীবন শুধু সৌন্দর্য্যের সুষমাই নয়, পবিত্রতায় শুদ্ধ ও পুণ্যের স্পর্শই নয় বা রূপান্তরিত সত্তাই নয়, অথবা ধর্ম্মবোধের জাগরণ বা সংরক্ষণই নয়—এ সবই জীবনের অতি গভীর ভাব-বিকাশ। কিন্তু এ সব ব্যক্তি-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত ও স্ফূর্ত্ত—ব্যক্তিবোধকে অতিক্রম করে' তারা থাকতে পারে না। ব্যক্তিত্ব (Personal life) ধর্ম্ম জীবনের সঙ্গে এত ঘনিষ্ট যে, ব্যক্তিত্ববোধ ভিন্ন অধ্যাত্মজীবনের কথা ভাবা যায় না। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিত্বের পরিধি সঙ্কীর্ণ। ধর্ম্মের অতি উচ্চ বিকাশেও এর কেন্দ্র অতিক্রান্ত হয় না। ধর্ম্ম, জ্ঞান ও সত্যকে সাধারণতঃ উপস্থিত করা হয় ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করেই। পরন্তু সত্য যেখানে তার শাশ্বত অব্যক্তস্বরূপে প্রকাশিত, সেখানে ব্যক্তির কোনো স্থান নেই। সত্যের জ্যোতিঃরূপে সত্য ভিন্ন কিছুই ভাসে না। ধর্ম্ম বিশ্বাস্তিত্বকে কেন্দ্রীভূত করে'ও সত্তার প্রসারিত ভূমিকার জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক বিশ্বকে নিজ কেন্দ্রে গ্রহণ করে। এটি খুব সত্য। কিন্তু আমাদের অধ্যাত্ম-জীবনের আদর্শ এইখানেই শেষ নয়। তন্ত্র শুধু ব্যক্তির প্রসারিত জ্ঞান ও ব্যাপক জীবনকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেনি। তন্ত্র চেয়েছে জ্ঞানের সেই ভূমিকা যেখানে শক্তির পূর্ণ সমীকরণ; এরূপ স্থিতি ব্যক্তির জীবনের রমণীয় বিকাশ ও প্রসারিত সত্তা হ'তেও উচ্চতর—এমন কি বিশ্ববোধের ও বিশ্ব-ব্যাপক বৃত্তিরও (cosmical feeling) অতীত।

যদিও কুণ্ডলিনী চৈত্যপুরুষে (চিতিসত্তা যার আলোকে দীপ্ত হয়) জাগ্রত হয়ে উজ্জল আলোকে ও নবীন ছন্দে পূর্ণ করে, তবুও সকল মহিমা উত্তীর্ণ হয়ে কুণ্ডলিনী শক্তির স্বাভাবিক গতি শান্ত স্তব্ধতার দিকে। কারণ, সেখানেই পরম বিশ্রান্তি। এই ভূমিকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূমিকা।

এরূপ ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা সর্ব্বশেষ লক্ষ্য হলেও, তন্ত্র শক্তির রমণীয় প্রকাশ ও মহিমময় বিকাশকে অধ্যাত্মসম্পদরূপে গ্রহণ করেছে এবং জীবনকে পূর্ণতার দিকে প্রতিষ্ঠা করতে তাদের সাহায্য নিয়েছে। এই যে শক্তির বরণ, এ কোন কার্য্যকারিতার জন্য নয়, শক্তির কুশলতা বা প্রতিষ্ঠার জন্যও নয়; পরন্তু অধ্যাত্মজীবনে শক্তির মহিমাকে ও সৌন্দর্য্যকে অনুভব করবার জন্য। শক্তিতে আন্দোলিত হয়ে কিরূপে জীবন গরীয়ান্ হয়ে ওঠে, কিরূপে মানুষের তথা বিশ্ব-সত্তার স্তরে স্তরে শক্তি মহিমময় হয়ে প্রকাশিত হয়, তাই প্রদর্শন করাই তন্ত্রের উদ্দেশ্য। জ্ঞান ও আনন্দই এর লক্ষ্য। ব্যবহারিক জীবনের কৃতকার্য্যতার কথা থাকলেও, শক্তি সাধনায় অত নিকৃষ্ট বিষয়ে লক্ষ্য থাকে না। যেখানে এরূপ লক্ষ্য আছে, সেখানে বুঝতে হবে সাধনার পথে আবর্জনা পুঞ্জীভূত হয়েছে। উহা দূরীভূত করবার জন্যও জাগ্রত শক্তির প্রয়োগ আবশ্যক। তন্ত্র সমগ্র জীবনের নিয়মন করে; সাধনার অঙ্গস্বরূপে যাহা থাকা আবশ্যক, তার জন্য শক্তি প্রয়োগ করে। আচার-আচরণের দ্বারা পারিপার্শ্বিক আয়ত্তাধীন না হ'লে সাধনাও পুষ্ট হয় না। এই জন্য কখন কখন শক্তি পরিচালনার আবশ্যক; তাই বলে এ কথা বলা ভুল হবে যে, মাত্র ধর্ম্ম-কর্ম্মেই তান্ত্রিক সাধনা নিহিত। মূলতঃ সত্য প্রতিষ্ঠা এ সাধনার লক্ষ্য, শক্তি সাধনা তার ভিত্তি।

বৈরাগ্য বা ত্যাগই তন্ত্রের পথ নয়—তন্ত্রের পথ বৃহত্তর ও দিব্যতর জীবনের পথ। শক্তির উদ্বোধনে মানুষের অশেষ মহিমা প্রকাশ পায়—কর্ম্মে, ভাবনায়, জ্ঞানে। এ শক্তি কখনও দিব্য কবিত্বে, কখনও দিব্য প্রজ্ঞায়, কখনও দিব্য সিদ্ধিতে প্রকাশ পায়। মানুষের জীবন দিব্য মহিমায় পূর্ণ হয়। দিব্য শক্তিগুলিকে জাগাইয়া জীবনের দিব্য সম্ভাবনার উদ্বোধন করে। অপ্রাকৃত শক্তিকে আহ্বান করে' সত্তার স্তরে স্তরে ছন্দ-বিন্যাস করাই এর প্রশস্ত উপায়। তন্ত্র মানুষের ভিতরের অন্ধকার

দূরীভূত করে' সত্তাকে স্বচ্ছতায়, স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিষ্ঠা করে। সঙ্কীর্ণ মনোবিজ্ঞান এ সুপ্ত শক্তিগুলিকে অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান, আনন্দরূপে অভিহিত করেছে। এই আন্তর শক্তির অনুরূপ শক্তি বিশ্বের অন্তরেও ক্রিয়াশীল। ইহারা পূর্ণরূপে ভিন্ন নয়। যা অন্তরে, তাই বাহিরে। যা বাহিরে, তাই অন্তরে। কেবলমাত্র স্থূল—এরূপ কোন পদার্থই নাই। স্থূলের অন্তরে আছে সূক্ষ্ম। স্থূল ও সূক্ষ্ম সবই এক ইচ্ছাশক্তির ঘনীভূত কেন্দ্র, এ সামান্যরূপে ইঙ্গিত করে মাত্র। আমাদের মানসিক অবস্থা বা বিকার এই সূক্ষ্ম শক্তিগুলির ক্রিয়া ও তার অবশ্যম্ভাবী ফল। আমাদের প্রত্যেক জ্ঞান-স্পন্দন ও ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তাদের উৎপত্তি হয় বিজ্ঞানে, নয় মনে, নয় প্রাণে। এর একটি ভাব মানুষের ভিতর থাকলেই ক্রিয়া থাকতে পারে। এই বিশ্লেষণ দেখিয়ে দেয় যে, সূক্ষ্ম শক্তি স্পন্দন মাত্রেরই মূলে থাকে এবং এর পরিবর্ত্তন দ্বারা আমাদের ভাব ও ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হয়ে থাকে। এই সম্ভাবনা আছে বলেই শক্তির স্পন্দনের দ্বারা ভাবকে উজ্জ্বলতর করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন চক্রের সহিত ভিন্ন ভিন্ন ভাবসম্পদের সম্বন্ধ এবং সমস্ত চক্রের শক্তির সহিত কুণ্ডলিনীর সম্বন্ধ। অতএব কুণ্ডলিনীর জাগরণে চক্রের শক্তির সহিত ভাবগুলি আমাদের আয়ত্ত হয়। এ অবস্থায় সত্তা পূর্ণরূপে কেন্দ্রীভূত হয়। এই শক্তির দ্বারা সাধক বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত হয়। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রেরণা (instinct) বিনষ্ট হয় না; কিন্তু তাদের অধ্যাত্মরূপ ও অধ্যাত্ম জীবনে তাদের বিন্যাস ও কার্য্যকারিতা সুস্পষ্ট হয়। প্রবৃত্তির স্বাভাবিক পরিণতি হয় আধ্যাত্মিকতায়। তাদের প্রকাশ হয় স্বচ্ছ, ক্রিয়া হয় অধ্যাত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ। যখন সকল শক্তিই কেন্দ্রশক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন তাদের রমণীয় স্বরূপ প্রকাশ পায়। তন্ত্রমতে আমাদের নিম্ন শক্তি-কেন্দ্রগুলির সঙ্গে উচ্চ কেন্দ্রগুলির সম্বন্ধ আছে। এ সম্বন্ধ যোগীর প্রত্যক্ষ। আধ্যাত্মিকতার

পূর্ণতা তখনই সম্ভব, যখন শরীর, প্রাণ ও মনের সাধারণ স্বভাবের রূপান্তর হয়। তন্ত্র স্পষ্টই বলেন যে, স্থূল শরীরে ও প্রাণে চেতনা অনুস্যূত হয়ে আছে। যখন অধ্যাত্মশক্তি সক্রিয় হয়, তখন একটী সজীবতার ছন্দ দেহে, প্রাণে, মনে জেগে ওঠে। তন্ত্র সাধনা বস্তুতঃ একটী অপূর্ব্ব কৌশল যাতে সত্ত্বার প্রত্যেক পর্য্যায়ে ছন্দ জাগ্রত হয়ে বিরাটের ছন্দে অনুপ্রবেশ করে। এর ফল হয় অতিমানসিক সৃষ্টি, মানব সত্ত্বার উচ্চতা ও ব্যাপ্তি, মহাশক্তির উদ্বোধন এবং অবশেষে পরম ধৃতি ও শান্তি।

শক্তির কেন্দ্র ঃ

তান্ত্রিক সাধক সত্ত্বার ভিতর কতকগুলি কেন্দ্র অনুভব করে। এ কেন্দ্রগুলির প্রত্যেকটিই এক একটি শক্তির কেন্দ্র। সাধারণতঃ এ কেন্দ্রগুলি মস্তিষ্ক হতে গুহ্যপ্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং একই সূত্রে গ্রথিত। বিভিন্ন কেন্দ্রের শক্তির ক্রিয়াও বিভিন্ন। এই কেন্দ্রগুলি অধিমানস ও অতিমানস স্তরের পরিচয় দেয়। ঊর্দ্ধ কেন্দ্রগুলি অতিমানসের, নিম্ন কেন্দ্রগুলি অধিমানসের প্রকাশ করে' থাকে। কেন্দ্রগুলি সক্রিয় হ'লে শক্তির স্বরূপানুভূতি হয়।

একথা বললে ভুল হবে যে, কেন্দ্রগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে অবস্থান করে। প্রত্যেক কেন্দ্রের স্বকীয় শক্তি আছে এবং সে শক্তি তৎ কেন্দ্রে ক্রিয়াশীল হলেও, কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকেও তা ছড়িয়ে পড়ে এবং তাকে জীবন্ত করে, তার বোধশক্তি বাড়িয়ে তোলে। যেমন হৃদয়-কেন্দ্র জাগ্রত ও ক্রিয়াশীল হলে হৃদয়-বৃত্তিগুলি বিশেষ অনুভূত হয় এবং হৃদয়প্রদেশ আলোকিত হয় এবং স্বচ্ছ উদার বৃত্তি হৃদয়প্রদেশে বিশেষ কার্য্যকরী হয়। নানা অলৌকিক জ্ঞান হয়। এ জ্ঞান সত্যধৃত বলেই একে ঋতম্ভরা বলা হয়। হৃদয়ের গভীর কেন্দ্র ক্রিয়াশীল হলে সাধারণ হৃদ্‌গত ভাবেরই শুধু নয়, হৃদ্‌প্রদেশে অসাধারণ ভাবের এবং শক্তিরও বিকাশ হয়ে থাকে।

হৃদয় যে সর্বোচ্চ সূক্ষ্মবিশ্বের প্রকাশ! এইরূপে প্রত্যেক কেন্দ্রই একপ গভীর সত্বার ও শক্তির উদ্বোধন প্রত্যক্ষীভূত করে। প্রত্যেক কেন্দ্রই তার বৈশিষ্ট্য অনুভব করে। এই কেন্দ্রগুলি যেন সত্বার এক একটী চাবী। এদের উন্মেষে সত্বার অনমনীয় আবরণ দূরীভূত হয়। ঐ স্থান সক্রিয় হলেই সূক্ষ্ম জ্ঞান ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এক নূতন বিশ্বের তখন উদ্বোধন হয়। সত্বায় ব্যাপকতা ও সূক্ষ্মতার স্ফূর্তি হয়। এসব কেন্দ্রগুলির ক্রিয়াশীলতায় মানুষের শক্তির, জ্ঞানের, ভাবের সঙ্কীর্ণতার অপসারণ হয়। নানাবিধ সূক্ষ্মবিশ্বের আবির্ভাব হয়। স্থূলভাবেও সব কেন্দ্র নমনীয় ও প্রসারশীল নয়। সূক্ষ্মভাবে এরা পরিচয় দেয় সূক্ষ্ম জ্ঞানের দাক্ষিণ্যমণ্ডিত বেদনার ও শক্তির।

কেন্দ্রগুলি একই গ্রন্থিতে গ্রথিত বলে এদের পরস্পরের সঙ্গে কখনও বিলয় হয় না। নিম্নতম হতে উর্দ্ধতম কেন্দ্রগুলি একই সূত্রে বিন্যস্ত। এই সূত্রই কেন্দ্র-সূত্র, এক তেজোময় দীপ্ত অধ্যাত্ম-পথ। এই পথটি উন্মোচিত হলে জ্ঞানের উচ্চতর ভূমিকা প্রকাশ পায়। জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়। সাধক অধিমানস ও অতিমানসকে বেশ সুস্পষ্ট অনুভব করে।

নাভি হতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত প্রাণময় বিশ্ব। নাভি হতে হৃদয় পর্য্যন্ত প্রাণমন বিশ্ব; হৃদয় হতে আজ্ঞাচক্র মনোবিজ্ঞানময় বিশ্ব। আজ্ঞাচক্রে দিব্য জ্ঞানের ও ইচ্ছার কেন্দ্র। আজ্ঞাচক্র হতে মস্তিষ্ক অতিমানস বিজ্ঞানের কেন্দ্র। সহস্রার জ্যোতির্ম্ময় পুলকে পূর্ণ, শান্ত ও দীপ্ত।

ব্যক্তিগত কুণ্ডলীর গতি এই পর্য্যন্ত; কুণ্ডলিনী শক্তি এই ভূমিকায় আরূঢ় হলে পরম শান্ত ও উপরত হয়। সৃজন-ক্রিয়া হতে বিরত হয়। শিবাভিমুখী শক্তি সৃজন-বিকাশ করে না। সৃষ্টিতে শক্তির কেন্দ্রীভূত ভাব; লয়ে প্রসারিত ভাব। ব্যক্তিগত কুণ্ডলী ভিন্নও তন্ত্রে মহাকুণ্ডলীর কথা আছে। ব্যক্তিগত কুণ্ডলী ব্যক্তির অভ্যুদয় ও বিকাশের নিয়ামক। এ কুণ্ডলী অধ্যাত্মজ্ঞানের পরিচালক। মানুষের আভ্যন্তরীণ শক্তির

নিয়মন ভিন্ন, এ কুণ্ডলীর বিশ্বের উপর কোন ক্রিয়া নাই। কিন্তু রহস্য শাস্ত্র মতে অধ্যাত্মজীবনের সহিত আধিদৈবিক জীবনের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধকে অবলম্বন করে' তন্ত্র মহাকুণ্ডলীর কথায় বলছেন যে, কুণ্ডলী বিশ্বের মূলে। এই মহাকুণ্ডলীতে আরূঢ় হতে পারলে সাধক তার ব্যক্তিগত ভাব ও অবস্থাকে অতিক্রম করে' বিশ্বগত ভাব ও অবস্থাতে প্রতিষ্ঠ হয়।

সহস্রদল কমলই ব্যক্তিগত কুণ্ডলীর লয় স্থান; কারণ, ওই মূল-কেন্দ্র—ওখান হ'তে শক্তি সৃজনাভিলাষে নিম্নাভিমুখী হ'য়ে নানা কেন্দ্রের ভিতর দিয়ে লীলায় ক্রিয়াশীল হয়। শক্তি আবার আরোহে ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠা পেলে ব্যক্তিগত কুণ্ডলীর ক্রিয়া শেষ হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত কুণ্ডলিনী শক্তি যদি নিম্নাভিমুখী না হয়ে মহাকুণ্ডলীর মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়, তবে বিরাট্ জগতের ও পুরুষের জ্ঞান হয় এবং তাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই বিরাটের স্পর্শ ও তাতে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার পথ সহস্রদল কমলে—শুধু লয়ের আনন্দে শক্তি যদি বিশেষ আকৃষ্ট না হয়, তবে মহাকুণ্ডলীতে এই শক্তি প্রবিষ্ট হয়ে বিরাটের বিকাশের সহকারী হয়। এখানে ব্যক্তিগত ভাবের পরিপূর্ণ বিষয়ে ব্যক্তিত্ব থাকে না—থাকতেও পারে না। সমস্ত সত্তাটী তখন বিরাট্ বিকাশের কেন্দ্র হয়। অবশ্য উদ্বোধিত অবস্থায় এ পথ পূর্ণ জাগরণের ও সৃষ্টির অধিকারের পথ। এ পথে শক্তি ও বিভূতির বিকাশ। এ অবস্থায় জ্ঞানের কোন সীমা থাকে না, বিশ্ব প্রতিবিম্বিত হয় চিত্ত-দর্পণে; চিত্ত বিশ্বাভিমুখী হয় ও স্বাভাবিক সঙ্কীর্ণতা হতে মুক্ত হয়।

সামগ্রিক ভাব ও জ্ঞানের একটা বিরাট্ সমন্বয় এখানে হয়। মস্তিষ্ক যেন বিরাটের কেন্দ্র, দেশ ও কালের ব্যবধান অতিক্রম করে' জ্ঞানের স্বাভাবিক ও সহজ প্রকাশ সম্ভব হয়। মস্তিষ্ক অনন্তের সুর-সঙ্গীতে এবং সহস্র ভাব-দ্যোতনায় জাগ্রত হয়। এ অবস্থায় অশেষ অনন্তমুখী প্রকাশের ভিতর ছন্দের পতন কখনই হয় না।

শক্তির প্রসারিত ভূমিকায় ছন্দের অশেষ বিকাশের মধ্যে এক অতীন্দ্রিয় সুসামঞ্জস্য বর্ত্তমান; যতই উর্দ্ধলোকে জ্ঞানের গতি ততই বিরাট্ ছন্দের অনুভূতি। বিশ্ববিজ্ঞান ঋতের, আনন্দের ছন্দে পূর্ণ। ব্যক্তিগত লয়ের পরিবর্ত্তে সাধক এ মার্গে ছন্দোময় আনন্দের ও শক্তির বিরাট্ সম্ভাবনায় পূর্ণ হয়। হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্, ঈশ্বর, সদাশিব তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়। পরিশেষে সাধক পরমশিবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ব্যক্তিগত কুণ্ডলীমার্গে এ সম্ভাবনা থাকে না। সাধক নিজে ব্যক্তিগত সত্ত্বা ও জ্ঞানকে লয় করে' নির্ব্বাণপাদ লাভ করে। বিশ্ব-কুণ্ডলীর উদ্বোধনে এ বিরাট্ সম্ভাবনা জাগ্রত হয়। সাধক এ পথে সিদ্ধিলাভ করলে বিরাটের বিভিন্ন স্তরে উন্নীত হয়ে পরিশেষে পরমশিবে স্থিতি লাভ করে। তার ব্যক্তিচৈতন্য পূর্ণরূপে লয় পায়। ক্রমশঃ বিশ্বাত্মা তার সত্ত্বাকে অধিকৃত করে। সে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু দেখতে পায়, প্রতি অনুতে পূর্ণের প্রকাশ দেখে। এ অবস্থায় তার জ্ঞানের সাধারণ মানসানুভূতির সীমা ও সঙ্কীর্ণতা থাকে না।

তন্ত্র মতে কুণ্ডলিনীর জাগরণে যোগের সকল স্তরগুলির বিকাশ। এ বিকাশ সহজ ও সরল। আত্মপ্রচেষ্টায় নয়, শক্তির উদ্বোধনে তত্ত্বগুলির বিকাশ, পরিশেষে জ্ঞানভূমিকায় শক্তির লয়। তান্ত্রিক সাধক শক্তির কাছে আত্ম-নিবেদন করলে মহাশক্তিই ক্রিয়াশীল হয়ে সাধকের কাছে জীবাত্মার স্বরূপ, পরমাত্মার স্বরূপ প্রকাশ করে। সাধারণতঃ জীবত্বের ক্রিয়া নাভি হতে গুহ্য পর্য্যন্ত (অর্থাৎ প্রাণস্তরে) আবদ্ধ থাকে। তার অনুভব, ভাবনা, বেদনা এই স্থূল প্রাণকম্পন ভিন্ন কিছু নয়। প্রাণকম্পন মনস্তর স্পর্শ করেই এ স্তরের জ্ঞান ও ভাবনার স্বরূপ প্রকাশ করে।

প্রায় সকল জীবই এই কেন্দ্রাভিমুখী। স্থূল পৃথিবীর আকর্ষণ এখানেই। এই পার্থিব আকর্ষণ অতিক্রম করে' উঠ্‌তে হয় নতুবা উচ্চতর জীবনের সম্ভাবনা লুপ্ত হয়। এ কেন্দ্র সঙ্কোচশীল, প্রাণ-

স্পন্দন মন্দ, অস্বচ্ছ। যোগের পরিভাষায় বললে এ প্রদেশ পৃথ্বী, অপ, তেজের স্থান।

এই পার্থিব আকর্ষণ হৃদয়প্রদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। প্রাণস্পন্দনে স্নেহ, মমতা প্রভৃতি বৃত্তি হৃদয়ে জাগ্রত হয়। পরন্তু হৃদয়ে গভীর অনুপ্রবেশ হ'লে বিজ্ঞানকোষের সন্ধান মিলে। হৃদয়ের গহন প্রদেশে দহর আকাশ। হৃদয় কেন্দ্র আমাদের সত্বার কেন্দ্র। ইহাই উর্দ্ধতর ও নিম্নতর বিশ্বের সংযোগস্থল। হৃদয় গুহা হতে প্রসৃত আলোক-পথ উর্দ্ধে গমন করে' মস্তিষ্ক ভেদ করে। এই পথ বিরাট্ প্রজ্ঞার পথ।

হৃদয়কেন্দ্রের গভীর গুহায় প্রবিষ্ট হলে বিজ্ঞানালোক ও তদূর্দ্ধ লোকের সূত্র পাওয়া যায়। এই বিজ্ঞানালোকেই দিব্যতর ও মহত্তর জীবনের ঋত ও সত্যলোকের সন্ধান। এই বিজ্ঞানালোকে উর্দ্ধলোক এবং অধোলোকও দীপ্ত। সিদ্ধ সাধক যত উর্দ্ধলোকে অবস্থিতি লাভ করে ততই নিম্নলোকগুলিও তার আয়ত্তাধীন হয়। সত্তা উর্দ্ধমূল। এই মূলে সব কিছুরই প্রতিষ্ঠা। এই মূল অধিকৃত হলে সত্বার স্তরগুলি অধিকৃত হয়। তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ এরূপে উর্দ্ধমানস ও অধিমানস কেন্দ্রে স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন। উর্দ্ধমানস ও অধিমানস কেন্দ্র তার নিকট পূর্ণ প্রকাশিত হয়। উর্দ্ধমানসে আরূঢ় হলে তার জ্যোতিঃ ও আনন্দ অধিমানসে সম্পাত করে।

অধিমানস ক্রমশঃ উর্দ্ধজ্যোতিশ্ছন্দে ছন্দায়িত হয়। দিব্য বিজ্ঞানের দ্যোতনায় সত্তা পূর্ণ হয়। সিদ্ধ সাধক এরূপে বৃহতের জ্ঞানে ও ছন্দে প্রাণলোকের মূর্চ্ছনায় দীপ্ত ও ছন্দায়িত হয়েন। সত্বার কোথায়ও থাকে না এতটুকু বাধা—রাজসিক চাঞ্চল্য বা তামসিক জড়তা—সবটাই যেন প্রাণের ছান্দসিক মূর্চ্ছনায় ও বিজ্ঞানালোকে স্ফূর্ত্ত হয় এরূপ উর্দ্ধ ও অধের সংযোগ এক বিরাট্ সিদ্ধি। সাধকের জীবনের সঙ্কোচ আর থাকে না। বিরাট্ সত্ব তার সত্বাকে অধিকৃত করে। এর উপরে সাধক

অগ্রসর হ'লে ঊর্দ্ধ ও অধঃ বোধ আর থাকে না; দেশ এবং কালবোধও থাকে না। চেতনার সৃষ্টি-অভিমুখী ক্রিয়া অথবা ঊর্দ্ধবিকাশাভিমুখী ক্রিয়াও থাকে না। সকল ভেদ ও বিধানের অতীত ভূমিকায় সাধক স্থিতি লাভ করে।

সিদ্ধ সাধক এরূপ অবস্থায় নিশ্চিতরূপে অনুভব করেন—চেতনা ঊর্দ্ধকেন্দ্রে কিরূপ উদার ও প্রসারিত, নিম্নকেন্দ্রে কিরূপ সঙ্কুচিত ও ম্লান। এই উন্নয়ন ও অবনয়নের কালেই সিদ্ধ সাধকেরা চেতনার সঙ্কোচ ও বিকাশের কথা বলে থাকেন। সিদ্ধ ভূমিকায় সাধক আর চেতনার বৃহৎ ও সঙ্কোচ ভাব অনুভব করে না। প্রথমটী ব্রহ্ম বা শিবভাব, দ্বিতীয়টী জীবভাব। জীবভাবের সঙ্কোচ ও বিকাশ আছে। বদ্ধাবস্থায় সঙ্কোচ ভাব, ক্রমোন্নত সিদ্ধ ভূমিকায় বিকাশ ভাব। জীবভাব সিদ্ধ ভূমিকায় বিশ্ব ও বিশ্বাতীগ চেতনার স্পর্শ পায়, অতি উচ্চ সিদ্ধ সাধক স্বকীয় চেতনায় বিশ্বাতীগ ভাবও উপলব্ধি করেন। চেতনার সঙ্কোচে জীবভাব, বিকাশে ঈশ্বর ভাব।

মন্ত্র ও মন্ত্রশক্তি :

হিন্দু অধ্যাত্মশাস্ত্রের অভিমত—অনাহত শব্দ দিব্য প্রজ্ঞাবৃত—যা সৃজন বিকাশের প্রাথমিক ছন্দে উদ্বোধিত হয়। দিব্য বিজ্ঞানের এই প্রথম প্রকাশ এবং এই সূত্র ধরে দিব্য জীবন আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। এই প্রাথমিক অনাহত স্পন্দন অন্তরে গভীর ছন্দানুভূতি জাগিয়ে তোলে এবং সত্বায় গভীর অধ্যাত্মবোধের সঞ্চার করে। সত্বার স্বচ্ছতায় শব্দচ্ছন্দের আহত এবং অনাহত রূপের গভীর সংবেদনার স্ফুরণ। এই রূপগুলি সূক্ষ্ম, এই স্পন্দন সূক্ষ্মতর; অতীন্দ্রিয়বোধে তাদের সুস্পষ্ট বিকাশ। এই অনাহত শব্দচ্ছন্দের জগতে আমাদের প্রবেশাধিকার হলে নানারূপ বর্ণ-বৈচিত্র্যে আমাদের অন্তর পূর্ণ হয়।

এই অনাহত শব্দ অধ্যাত্মচ্ছন্দের প্রাথমিক প্রকাশ এবং ইহাই নানা ছন্দে ও মন্ত্রে প্রকাশিত। পরশুরামকল্পসূত্রে বলা হয়েছে—মন্ত্র এক পরাশব্দের প্রকাশ, যার ভিতরে সার সত্যের সন্ধান মিলে।

আমরা পূর্ব্বেই বলেছি, বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের পরিণতি এই বর্ণ ও শব্দচ্ছন্দে। বর্ণ ও শব্দচ্ছন্দ নিত্য, অন্য যা কিছু পদার্থ সবই এদের প্রতিভাস মাত্র, বর্ণ ও শব্দ কেন্দ্রীভূত হলেই পদার্থের উৎপত্তি। এই বর্ণ ও শব্দচ্ছন্দ সকল সংজ্ঞার, সকল ভাবস্পন্দনের অতীত (names, ideas, concepts) জগতে আমাদের নিয়ে যায়। এই জগৎ মানস ভাব ও বিজ্ঞানের অতীত চেতনার লহরীতে পূর্ণ। মন্ত্রশক্তি তেজোময় সত্তাকে উদ্ধার করে, প্রাণ-মনের আবর্জ্জনা দূর করে। অন্তরের অন্তরে আছে যে জ্যোতির্ম্ময় সত্তা, তার সাথে মন্ত্রচ্ছন্দের বিশেষ সম্বন্ধ। মন্ত্রের শক্তিস্পন্দন ঘনীভূত হয়ে অন্তরতম প্রদেশ আলোকিত করে' এক তেজোমণ্ডল সৃষ্টি করে। এই তেজঃ স্তরে স্তরে বিদীর্ণ হয়ে অন্তর-সত্তাকে তেজোমণ্ডিত ও শক্তিস্পন্দনে পূর্ণ করে।

তন্ত্র মতে শব্দ-প্রকাশের ভূমিকা চারিটি : পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী। পরা বাক্‌ই বাক্, অন্যগুলি এরই স্পন্দনের ক্রমিক ঘনীভূত অবস্থা। মহার্থমঞ্জরী বলেছেন—এই পরাবাক্ পরমেশ্বরে নিহিত এবং সকল ব্যক্ত সৃষ্টির অতীত দিব্য বিজ্ঞানে ধৃত। বস্তুতঃ, এই পরাবাক্‌ই দিব্য বিজ্ঞান (Divine Wisdom)। এই বাক্ নাদ, ক্রিয়া ও শক্তিরূপা। এই বাক্ জ্ঞানে ধৃত হয়েও আবার জ্ঞানের বিধৃতি। এই জন্যই উপনিষদে আছে "এই আলম্বন শ্রেষ্ঠ, এই আলম্বন পর, এই আলম্বন ব্রহ্মলোক প্রতিষ্ঠা করে।"—এ ব্রহ্মস্বরূপ।

এই পরা বাক্ আগমের ভাষায়, "স্বরূপজ্যোতিরেব"। ষট্‌চক্র কোষ ধ্বনি ও বর্ণের ভিতর বিভেদ করেছে। ধ্বনি মূল শব্দ, বর্ণ রূপে প্রকাশিত হয়। কুণ্ডলিনীর নিঃশব্দ কূজনে ধ্বনির উৎপত্তি। স্বচ্ছন্দ

তন্ত্রে (চতুর্থ পরিচ্ছেদ, ২৪৮) উক্ত হয়েছে শব্দ প্রাণের কম্পন, বর্ণ প্রাণের কম্পনের রূপ। স্বচ্ছন্দ তন্ত্রে আরও বলা হয়েছে, শব্দ শক্তির প্রাথমিক বিকাশ। শব্দ হ'তে জ্যোতির উৎপত্তি, জ্যোতির্ব্বিন্দু হতে মন্ত্রের উৎপত্তি।

একথা নিঃসন্দেহ যে, তন্ত্রে পরাবাক্ নিত্য জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানে শক্তির সঞ্চার হলে পরাবাকের কূজন অনাহত শব্দরূপে শুনতে পাওয়া যায়। জ্ঞানের সঞ্চারই শক্তি। শক্তির প্রকাশ বাক্। আমাদের ভাষায় আমরা বলেছি, তেজচ্ছন্দ ও শব্দচ্ছন্দে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্ত্তমান। একই তত্ত্বের এরূপ দ্বিধা প্রকাশ। এখানেও পাচ্ছি মূল শব্দ ধ্বনি, সেই ধ্বনি হ'তে বর্ণের (স্বর ও ব্যঞ্জন) উৎপত্তি। শব্দ অনাহত ও আহত ; আহতের উৎপত্তি অনাহতে। পরাবাক্ সকল বাক্যের সার, সকল বাক্-এরই উৎপত্তি এবং লয় এখানেই। বাক্যের ভিতর দিয়েই অরূপ রূপ (formation) গ্রহণ করে। এই অরব শব্দের বা ধ্বনির কূজন কিরূপে রূপ নেয়, তা অত্যন্ত রহস্যময়। এর নিম্নভূমিকায় শব্দ-শক্তি "পশ্যন্তী-বাক্"-রূপে প্রকাশ পায়। বাক্ এখানে ঘনীভূত ; পরা-ভূমিকায় এ প্রসারিত বলেই এর কোন রূপ নেই। 'পশ্যন্তী-বাক্' পূর্ণরূপে ঘনীভূত না হলেও, ঘনীভূত ও প্রস্তুত হবার চেষ্টা এখানে দেখতে পাওয়া যায়। মহার্থমঞ্জরীতে বলা হয়েছে যে, 'পশ্যন্তী-বাক্' ভূমিকাতে বাকের সৃজনশক্তির প্রকাশ পায়। পরাতে শক্তির অস্ফুট কম্পন, পশ্যন্তীতে স্ফুট। বাক্ এখানে প্রাথমিক ইচ্ছাময়ী।

এর নিম্ন ভূমিকায় বাক্ মধ্যমা, বাক্ জ্ঞানরূপা (ideation) বুদ্ধিবৃত্তির চালক। কামকলাবিলাসে একে মধ্যমা বলা হয়েছে। বাকের প্রকাশ দুই রূপে হয় : এক স্থূলরূপে আর এক সূক্ষ্মরূপে। স্থূলরূপে এ প্রকাশ হয় স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণে (নববর্গ নববর্গাত্মা), আর সূক্ষ্মরূপে প্রকাশ হয় শব্দের ঝঙ্কাররূপে সূক্ষ্ম জ্ঞানের সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ। এই প্রকাশ অতীন্দ্রিয় প্রকাশ।

জ্ঞানরূপা বাক্ সংজ্ঞারূপ. ইচ্ছার প্রকাশে মানসিক সংজ্ঞার উদ্ভব হয়, এই সংজ্ঞার রূপ সূক্ষ্ম ও স্থূল। এই জ্ঞানরূপ বাক্ প্রাথমিক জ্ঞান নয়—ইচ্ছার মূর্ত্ত সংবেগ। জ্ঞানরূপা (ideation) প্রকাশের ভিতর থাকে ইচ্ছার সঞ্চার—মূর্ত্ত সৃষ্টি সম্ভব হয় এই বিজ্ঞানের ক্রিয়ায়। ইচ্ছার স্থূলতর পরিণতি বিজ্ঞানের সংজ্ঞায়। শব্দ বৈখরী বাণীতে প্রকাশিত হবার পূর্ব্বে ইচ্ছা ও সংজ্ঞায় পরিণত হয়।

শব্দ-স্পন্দনই প্রাথমিক শক্তি-স্পন্দন, ইচ্ছা ও মানস-বিজ্ঞান এর ক্রমিক প্রকাশ। স্বর ও ব্যঞ্জন, বৈখরী বাণীর দুই প্রকাশ। তারা কোন বিশেষ অর্থের জ্ঞাপক নয়, কারণ সৃষ্ট পদার্থের সহিত তাদের কোন সম্বন্ধ নেই। তারা সৃষ্টির কোন বিষয়কে জ্ঞাপন করে না। তাদের অর্থ থাকলেও, সে অর্থ শব্দস্পন্দন এবং তার গতি ভিন্ন অন্য কিছু হতে পারে না। অনেক সময় তাদের শক্তির ক্রিয়া স্পষ্ট অনুভূত হয়, আমাদের সত্তাকে সঞ্চারিত করে এবং সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলে। প্রত্যেক শব্দটি এক একটি শক্তির উদ্বোধন করে। তন্ত্রে শব্দের আলৌকিকতা এবং শব্দের সহিত অধ্যাত্মশক্তির সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়েছে এবং এর উপর তন্ত্র এক বিরাট্ সাধনাস্তম্ভ রচনা করেছে। এই বর্ণশক্তি মানসজ্ঞানের অতীত অতিমানসের উদ্বোধন করে—সত্তার গভীরতর স্তর এর স্পন্দনে ও ক্রিয়ায় আন্দোলিত ও প্রকাশিত হয়।

মন্ত্রশক্তি বিভিন্ন প্রকারের। এই বিভিন্নতা তাদের ক্রিয়ার দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। কোন মন্ত্রে ইচ্ছার প্রাধান্য, কোন মন্ত্রে আনন্দের, কোন মন্ত্রে সৃজন শক্তির, কোন মন্ত্রে শান্তির প্রাধান্য। মন্ত্রমাত্রই আমাদের সত্তাকে স্পর্শ করলেও সকল মন্ত্রের শক্তি একরূপ নহে। মন্ত্রের প্রসারের শক্তি অদ্ভুত। সকল মন্ত্রেরই গতি সূক্ষ্মের দিকে। সব মন্ত্রই সূক্ষ্ম ভূমিকার বিকাশ করতে চায়—তমসা ও জড়তা হতে মানুষের দিব্য শক্তি ও প্রকৃতিকে মুক্ত করতে চায়। মন্ত্রমাত্রই অপরোক্ষ জ্ঞান বর্দ্ধিত করে,

সার্ব্বভৌমিক ইচ্ছাকে জাগ্রত করে, দ্যোতনশীল ভাবনা ও কল্পনা জাগিয়ে তোলে। মন্ত্র প্রতি সাধকের হৃদয়কোষে তার প্রোজ্জ্বল সত্তাকে জাগিয়ে তোলে, তার উর্দ্ধতর বিকাশের পথ নির্ণীত করে। শক্তির জাগরণে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় এইজন্য যে, সব আধারে সব শক্তি নির্ব্বিঘ্নে ক্রিয়াশীল হয় না; বিশেষতঃ কামনাক্লিষ্ট জীবনে বৃহত্তর ও উর্দ্ধতর শক্তির জাগরণ হয় না; বিরুদ্ধ শক্তি একই অধিকরণে ক্রিয়াশীল হলে আধারের বিনাশ পর্য্যন্ত হতে পারে। তন্ত্র সত্বার স্বাভাবিক শক্তিকেই অবলম্বন করে' অগ্রসর হতে উপদেশ দেয়। ভিতর হতে ধীরে ধীরে সত্বার রূপান্তর সাধন করতে হয়। সাধনার উদ্দেশ্য হচ্ছে: শক্তিমাত্রের উদ্বোধন ও উন্নয়ন ও সত্বার রূপান্তর। সাধনায় ক্রমশঃ সত্বার স্বাভাবিকতা বদলে যায়। তন্ত্রসাধনার এই-ই বিশেষত্ব। গ্রীসদেশীয় অরফিক্ (Orphic)-সম্প্রদায়ে মন্ত্রের সাধনা প্রচলিত ছিল। "সঙ্গীত ও মন্ত্রসাধনার দ্বারা মহাশক্তিকে (যিনি দেবজননী) আকর্ষণ করা হত। এই দেবজননী দিব্য জাগরণের আকর।" (জি. আর. এস. মিড—অরফিয়াস, পৃষ্ঠা ১৯৬-১৯৭)

দীক্ষা ও শক্তিপাত:

তন্ত্র দার্শনিকতাকে অধ্যাত্মবিজ্ঞান হ'তে ভেদ করেছে। দার্শনিকতায় বিজ্ঞান থাকলেও অধ্যাত্মবোধ না থাকতে পারে। দার্শনিকতা বুদ্ধির স্বচ্ছতা আনয়ন করতে পারে কিন্তু সত্বার স্বচ্ছতা তাতে নাও থাকতে পারে। এই সত্বার স্বচ্ছতা ভিন্ন কিন্তু সত্যের সাক্ষাৎকার সম্ভব নয়। সত্বার অধ্যাত্ম-নমনীয়তার ও গ্রহণশীলতার উপর অধ্যাত্মবিকাশ নির্ভর করে। আধ্যাত্মিকপ্রবণতা সংযম ও অনুশীলনের সাথে বর্দ্ধিত হয়—স্বাভাবিক আধ্যাত্মিকপ্রবণতাকে অনুশীলন বর্দ্ধিত করতে পারে।

অধ্যাত্মজীবন ক্ষণিক বা স্বল্পস্থায়ী আলোকসঞ্চার নয়, সত্যিকার অধ্যাত্মজীবনে চেতনা ও আনন্দবিকাশের ফল্গুপ্রবাহ অবিচ্ছিন্নরূপেই থাকে—কখনই অভাব হয় না। অধ্যাত্মজীবনের স্বরূপও এই। এরূপ জীবন বস্তুতঃ দীক্ষার সহিত আরম্ভ হয়। দীক্ষায় অন্তর চেতনার আলোকে দীপ্ত হয় ও ব্যাপক সত্ত্বা ও চেতনার জ্ঞান সুস্পষ্ট হয়। দীক্ষা—সঙ্কোচ ও সঙ্কীর্ণতার দূরীকরণ, ব্যাপকতর, শুদ্ধতর জীবনের আহ্বান। কাশ্মীর-শৈববাদ কিন্তু মনে করে, দীক্ষা ভিন্নও প্রত্যভিজ্ঞা উজ্জ্বল জ্ঞান দিত পারে। প্রত্যভিজ্ঞতা—একাত্মতার পরিচয়। এ প্রজ্ঞার পথ—যাকে অতীন্দ্রিয় দর্শনে বলা হয় "জ্ঞান-চক্ষুর"র (eye doctrine) পথ। এমন উচ্চ সম্ভাবনার অধিকারী খুবই অল্প—যাদের আদৌ কোন দীক্ষার প্রয়োজন নাই। দীক্ষায় অন্তরে শক্তির অনুপ্রবেশ। এ পথকে বলা হয় জ্যোতিষ্মতী (হৃদয়চিদের—heart-doctrine) পথ।

প্রজ্ঞার পথ যদিও বুদ্ধির পথ, তবুও শুধু বিচারবিতণ্ডার পথ নয়। এ পথে বিজ্ঞানের ছন্দে ও আলোকে (intellectual intution) বুদ্ধি উদ্ভাসিত হয়—পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়। কোন শক্তিসম্পাত এ পথে আবশ্যক হয় না। অপর পক্ষে শ্রদ্ধা ও প্রেমের পথ হৃদ্-চিদের পথ—শক্তির অনুপ্রবেশ এ পথে আবশ্যক। প্রেম-ভালবাসা শক্তি বিকীরণ করে' আকর্ষণ করে। দীক্ষাতে এই শক্তিরই আবির্ভাব।

দীক্ষা দু' প্রকার—অন্তর্দীক্ষা ও বহির্দীক্ষা। বহির্দীক্ষায় অনেক বাইরের প্রক্রিয়া আছে, তাদের প্রয়োজন চিত্তের সাত্ত্বিক জাগরণের জন্য। সত্যিকার দীক্ষা অন্তর্দীক্ষা; এ শক্তির জাগরণ। এই অন্তর্দীক্ষায় চিত্ত দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং কুণ্ডলিনীর জাগরণ হয়—যা' বহির্দীক্ষায় সম্ভব নয়। (রত্নত্রয়—শ্লোক ১২)।

দীক্ষা অন্তরের কালিমা দূরীভূত করে এবং জীবনকে ছন্দোবদ্ধ করে' পূর্ণ আলোকসঞ্চার করে। দীক্ষা অধ্যাত্মশক্তিকে উদ্বোধিত ও চালিত

করবার কৌশল। এক নীবন জীবনের সঞ্চার—এক নূতন জন্ম—স্বচ্ছতায়, পবিত্রতায় এবং আনন্দে। ভাগবত সুষমা সত্যের বিমল জ্যোতিঃ দিয়ে হৃদয় অধিকার করে—যে সব পুণ্যাত্মা জীবনের ছন্দে যুক্ত এবং যেখানে সত্যের জন্য উন্মুখতা তীব্র, আধারের আগ্রহশীলতা ক্ষিপ্র, সত্যের শান্ত জ্যোতিঃ স্বভাবতঃই সেখানে অবতরণ করে।

নিত্যোৎসবের ও পরশুরাম কল্পসূত্রকারের মতে দীক্ষা তিন প্রকার—(১) শাম্ভবী, (২) শাক্তী, (৩) মান্ত্রী। প্রথমটি দেয় শুদ্ধি—পরম পবিত্র সত্যের চিন্তায় সত্ত্বার জড়তা ও মলিনতা বিদূরিত হয়, কিছুটা শক্তির জাগরণ হয়। চিন্তাশক্তি (thought-force) এখানে বিশেষ কার্য্যকরী হয়।

দ্বিতীয়ঃ শক্তি-দীক্ষা এক অধ্যাত্ম-আনন্দের পুলকে সত্ত্বাকে পূর্ণ করে। এই দীক্ষায় অধ্যাত্মশক্তির কম্পন সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। নবীন আলোক ও শক্তি চাঞ্চল্যকর উল্লাসে ভরে' দেয়।

তৃতীয়ঃ মান্ত্রী দীক্ষা—এতে মন্ত্রশক্তি ও দেবতা জাগ্রত হয়। অধ্যাত্মশক্তি এখানে নির্দ্দিষ্ট রূপ নেয়—মন্ত্র-ছন্দঃ রূপায়িত বা অরূপ জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। নির্ব্বিশেষ শক্তির অনুভূতি শেষ অনুভূতি। সত্ত্বার কম্পন ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রে বিভিন্ন। সবিশেষ জ্ঞান ও শক্তির অনুভূতি নির্ব্বিশেষ অনুভূতির অব্যবহিত পূর্ব্বেই। স্বচ্ছন্দতন্ত্রে উক্ত হয়েছে—প্রত্যেক ভূমিকালাভের পূর্ব্বে একটা একটা দীক্ষার বিধি প্রচলিত আছে। অধ্যাত্মচেতনা ক্রমিকভাবে জাগ্রত হয়। সর্ব্বশেষ স্তরেই নির্ব্বাণদীক্ষা দেওয়া হয়—শিবাদ্বৈত তত্ত্বানুভবের জন্য। শৈবমতে মুক্তি শক্তির সঙ্কীর্ণতা ত্যাগপূর্ব্বক, পূর্ণতর শক্তির প্রতিষ্ঠা (মহার্থমঞ্জরী, ৫৩)। এই শিব-শক্তির সহিত অভিন্নতাকে জীবনমুক্তি বলা হয় (মহার্থমঞ্জরী), কিন্তু এই জীবনমুক্তি শুধু শান্তি ও জ্ঞান-প্রতিষ্ঠাই নয়—এ মহাশক্তির

উদ্বোধন। দীক্ষাতে শক্তিসম্পাত এমনি হতে পারে যে, কর্ম্মের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে' তাতেই জ্ঞানের বিকাশ হয়। বস্তুতঃ তন্ত্রমতে সেই পরম দীক্ষা, যা' শ্রেষ্ঠ অনুভূতিতে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা জাগিয়ে দেয়। দীক্ষার অর্থ ই বাধা ও বিঘ্ন ক্ষালিত করে' জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ। মন্ত্রে সে শক্তি আছে এবং মন্ত্র-দীক্ষায় তা পূর্ণ প্রকাশ হতে পারে, যদি মলগুলি নিষ্কাশিত হয়।

আণব মল সত্তার সঙ্কীর্ণতা নিয়ে আসে শিবের জীবভাব সৃষ্টি করে'। এ বুদ্ধিকৃত নয় অথবা এ বুদ্ধিবিষয়ক অজ্ঞানও নয়। এ মল আমাদের জীবত্বের মূল। শক্তি বা শিবের সহিত অভিন্নতা সম্ভব নয়, যদি এই আণব-মল অপগত না হয়। বুদ্ধিগত মল বিদূরিত হ'লে জ্ঞান সম্ভব হয়; কিন্তু আণব মল বিনষ্ট না হ'লে, ব্রাহ্মীশক্তির অবতরণ হয় না—সত্তার রূপান্তর হয় না, দিব্য শক্তিরও উদ্বোধন হয় না—মহাশক্তির সহিত একত্ব প্রতিষ্ঠা হয় না। এই আণব-মল স্বতন্ত্র শক্তির কার্য্য, এর তিরস্কারণ না হলে শিব-শক্তির সহিত তাদাত্ম্য লাভ হয় না।

অন্য মল মায়ীয় মল—মায়ীয় মল বিষয়-বিষয়ী-বোধের কারণ, অহঙ্কারের মূল। এই অহঙ্কারই কর্ম্ম-মল উৎপন্ন করে। এই মল সুখ, দুঃখ, অবসাদ, উল্লাসের হেতু।

এই তিনটি পরস্পর সংযুক্ত। আণব-মল সত্তাকে আবৃত করে, ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে—অহং-বুদ্ধির উদয় হয়। জ্ঞানে বিষয়-বিষয়ী ভাব সৃষ্ট হয়, বিষয়ের স্বাতন্ত্র্যের অবভাস হয়। বিষয়কে অবলম্বন করে' বিষয়ী তার সকল ভোগের উপাদান গ্রহণ করে। এইভাবে জীব-চেতনা বিষয় হতে বিষয়ান্তরে বিচরণ করে, তার তৃপ্তি বিষয়ে, মুক্তির পথ ঠিক ইহার বিপরীত। মূল আণব মল বিদূরিত হলেই মুক্তির সম্ভাবনা। মুক্তির পথে বিষয় বিচ্ছিন্ন হয়ে বিষয়ীর অববোধ, বিষয়ীবোধের লোপ হলে চেতনার অববোধ স্বাভাবিক। ইহা তখনই

সম্ভব, যখন মল বিদূরিত হয়। চৈতন্যের যে ব্যক্তিত্ব তার হেতু এই আণব মল। ব্যক্তিত্বের অপসারণেই মুক্তি। দীক্ষায় যে শক্তি সঞ্চারিত হয়, তার শেষ পরিণতি মুক্তিতে।

দীক্ষা একটি বিশেষ বিষয়ে শক্তিপাত। শক্তির অবতরণ (বা ঈশ্বরকৃপা) কি এবং তাহা অপেক্ষ বা অনপেক্ষ? জীবনের পূর্ণ স্ফূর্ত্তির জন্য এ বিষয়ের অবশ্যম্ভাবিতা আছে। শৈব-সিদ্ধান্তে শক্তিপাত বা ঈশ্বর-কৃপা অহেতুকী—কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। কর্ম্মের দ্বারা ঈশ্বর-কৃপা নিয়ন্ত্রিত হয় না। ঈশ্বর নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছার দ্বারা স্বয়ং আবৃত হন এবং স্বেচ্ছায়ই আবার আবরণ ভঙ্গ করেন। বস্তুতঃ ঈশ্বর ভিন্ন কোন কিছু বস্তুই নাই, তিনিই একমাত্র তত্ত্ব। তাঁর কোন প্রিয় বা অপ্রিয় নাই যে, তিনি কাকেও অনুগ্রহ করবেন বা কাকেও নিগ্রহ করবেন। যেখানে দ্বৈত সেখানে কর্ম্ম, পাপ, পুণ্য দ্বারা ঈশ্বরানুগ্রহ নির্ণীত হয়। ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্যত্ব স্বীকার করলে, তাঁর অনুগ্রহ বা নিগ্রহ তাঁর ইচ্ছাধীন হয়েও জীবের কর্ম্মাধীন হয়; কিন্তু যেখানে ঈশ্বরই সব, সেখানে কোন কর্ম্মের পাপ বা পুণ্যের কথা উঠতে পারে না এবং শক্তিপাত পাপ ও পুণ্যকে অপেক্ষা করে না। শৈবমতে শক্তিপাত কোন কারণাধীন নহে, কেবলমাত্র ঈশ্বরেচ্ছাই (unconditional) এর হেতু। মায়ার অন্তর্গত কোন ব্যাপার মায়ার অতীত বস্তুকে স্পর্শ করতে পারে না। শক্তিপাত সর্ব্বতোভাবে মায়া-নিরপেক্ষ। মায়িক জীবের পক্ষে মায়াতীত বস্তুর সন্ধান কিরূপে হবে, তার চেষ্টাই বা কিরূপে হবে? ধ্যান ইত্যাদি মায়িক উপায়েই হতে পারে না। এই সব দেবতা মায়িক বিশ্বে কাজ করেন, তাঁরা স্বাধিকার বোধে ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করেন। যাঁরা মায়ার দ্বারা আক্রান্ত নন, তাঁরা শক্তিপাতের ফলেই ভোগ ও মোক্ষরূপা সিদ্ধি পেয়ে থাকেন।

মোটের উপর শৈবসিদ্ধান্ত ঈশ্বরকৃপাকেই একমাত্র কারণ বলেছেন— ভোগ ও মোক্ষের। ঈশ্বরই ইচ্ছা করে' সঙ্কুচিত বৃত্তি নিয়ে জীবস্বরূপে ভোগ করেন, ঈশ্বরেচ্ছাতেই আবার জীব অসঙ্কুচিত চিদ্‌বৃত্তিসম্পন্ন হয়ে মোক্ষ লাভ করে। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছাকৃত। কর্ম্ম এর মধ্যে কোথাও নেই, সৃষ্টিপ্রবাহের পূর্ব্বে কর্ম্ম ক্রিয়া করে না। সৃষ্টির অতীত হ'লেও কর্ম্ম কোন ক্রিয়া করতে পারে না। জীবের ভোগ ও মোক্ষ পূর্ণরূপে ঈশ্বরাধীন। জীব ঈশ্বরেচ্ছা ভিন্ন দিব্য ভোগ বা মোক্ষ আয়ত্ত করতে পারে না। একমাত্র শক্তিপাত হলেই সব সম্ভব হয়। শক্তিপাত না হ'লে সঙ্কোচ-বৃত্তির অপসারণ সম্ভব নয়; যেহেতু শক্তির সঙ্কোচও ঈশ্বরেচ্ছাধীন—তার অপসারণ জীবের চেষ্টায় সম্ভব নয়। জীবের আস্পৃহা থাকলেও, ঈশ্বরানুগ্রহ ভিন্ন কোন অধিকারসম্পন্ন হওয়া যায় না। বস্তুতঃ ঈশ্বর-অনুগ্রহ স্বাভাবিক; ঈশ্বরই জীব হয়েছেন বলে' জীবত্বের সঙ্কীর্ণতার অপসারণও ঈশ্বরেরই স্বভাবধর্ম্ম। চিতিশক্তির প্রসারের জন্য এই সঙ্কোচ অপনীত হয়। শক্তিপাত বা কৃপা ঈশ্বরের নিত্য-ধর্ম্ম— আবরণ উন্মোচন করা তাঁর স্বভাব।

শক্তিপাত দুই প্রকার—পরা ও অপরা, শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট। প্রথমটিতে কৃপার পূর্ণ বিকাশ, দ্বিতীয়টি কৃপার আংশিক প্রকাশ। প্রথমটি শুদ্ধ আত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত করে, পূর্ণ সম্প্রসারিত সত্তার স্বরূপ উদ্বোধন করে এবং পরা শান্তির বিধান করে। পরম শিব পূর্ণ কৃপা সঞ্চার করতে পারেন—তিনি চিরতরে আবরণের উন্মোচনে সমর্থ।

অপরা শক্তিপাতে দিব্য ভোগের সঞ্চার—আধ্যাত্মিক বিভূতি ও শক্তির উদ্বোধন। পরাশক্তিপাত পূর্ণরূপে কেন্দ্রাভিমুখী করায়, অপরা শক্তিপাত প্রকৃতির উপর কর্ত্তৃত্ব করে' দিব্য ঐশ্বর্য্য ভোগ করে। অপরা শক্তিপাত দেবতারা করতে পারেন। এই দেবশক্তিসমন্বিত হয়ে অনেকে উচ্চাধিকার প্রাপ্ত হন, কিন্তু শিবত্ব পেতে পারেন না।

এই অপরা বা আংশিক শক্তিপাতে বিবেকসম্পন্ন সাধক প্রকৃতি-বন্ধন হতে মুক্তিলাভ করতে পারেন বটে, কিন্তু কালে সঞ্চিত দিব্য কর্ম হতে মুক্ত হতে পারে না। সেটা সম্ভব হয় তখনই, যখন শক্তিপাত হয় পরা ও তীব্র। বিজ্ঞানবান্ পুরুষ এক প্রকার কৈবল্যানন্দ অনুভব করে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আণব মল পূর্ণরূপে বিধৌত হয় না। এই আণব মল পূর্ণ রূপা বা শক্তিপাতে বিদূরিত হয়। আংশিক শক্তিপাতে এ সম্ভব নয়।

শক্তিপাত তীব্র, মধ্য ও মন্দ ভেদে তিন প্রকার। এরাও আবার তীব্র-তীব্র, তীব্র-মধ্য, তীব্র-মন্দ; মধ্য-তীব্র, মধ্য-মধ্য, মধ্য-মন্দ, মন্দ-তীব্র, মন্দ-মধ্য, মন্দ-মন্দ ভেদে বিভক্ত। তীব্র-তীব্র শক্তিপাতে শিবত্ব (বা মোক্ষ প্রাপ্তি) হয় অব্যর্থ ও অব্যবহিত। এ ক্ষেত্রে প্রারব্ধভোগের আবশ্যক থাকে না।

মধ্য-তীব্রে অজ্ঞান তিরোহিত হয়। কিন্তু শরীরের অনুবৃত্তি থাকে। জ্ঞান প্রতিভা থেকে উৎপন্ন হয়—কোন শাস্ত্রের বা উপদেশের অপেক্ষা রাখে না। কিরণাগমতন্ত্রে উক্ত হয়েছে, জ্ঞান শাস্ত্র ও গুরুর সাহায্যে কিম্বা স্বপ্রতিভা হতে স্বাভাবিক-রূপে উৎপন্ন হয়। যারা শ্রেষ্ঠ অধিকারী তাদের জ্ঞান প্রতিভোৎপন্ন—শাস্ত্র বা গুরুর অপেক্ষা থাকে না।

প্রশ্ন হতে পারে—শক্তিপাতের নির্দ্দেশ বা চিহ্ন কি? উত্তর—শক্তিপাতের প্রধান লক্ষণ ভক্তির উদয়। শক্তিপাত মাত্র অন্তর স্বচ্ছতম হয়ে ঈশ্বরাভিমুখী শুদ্ধতম বৃত্তির (ভক্তি) উদয় হয়। এই ভক্তি সকলের অন্তরেই থাকে, শক্তিপাত হলে তার বিকাশ হয় মাত্র। ভক্তির উদয়ে সব বাধা-বিঘ্নের অপসারণ—মেঘমুক্ত আকাশে নবারুণ সূর্য্যোদয়ের ন্যায় স্বচ্ছ হৃদয়ে ভক্তির উদয়। এই ভক্তি কেন্দ্রগতি—চিৎশক্তির কেন্দ্রাভিমুখী বৃত্তি। এই বৃত্তি ঈশ্বরাববোধ জাগিয়ে মুক্তি দেয়। ভক্তি স্বাভাবিকী ভাগবতাভিমুখী বৃত্তি। এই বৃত্তি থাকলে আর কোন সাধনার আবশ্যক হয় না। সত্ত্বা সহজভাবেই কেন্দ্রাভিমুখী হয়ে

কেন্দ্রগতি প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরসাক্ষাৎকার অনতিবিলম্বেই সম্ভব হয়। দেব-প্রসাদে এই ভক্তি সমুল্লসিত হয়।

দীক্ষা—বহির্দীক্ষা বা অন্তর্দীক্ষা। বহির্দীক্ষা বাহ্য পূজা, হোম প্রভৃতি বাহ্য ক্রিয়ার উপরই নির্ভর করে। অন্তর্দীক্ষা শুদ্ধ-বিদ্যার সমুল্লাস—বাহিরের কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। এ দীক্ষায় অন্তর দীপ্ত হয়ে' চেতনার বিকাশ হয়।

জ্ঞান দীক্ষা হ'তে জাত হয়; প্রতিভোৎপন্নও হতে পারে। জ্ঞান অর্থাৎ প্রজ্ঞা। প্রতিভোৎপন্ন জ্ঞানে কোন পরতন্ত্রতা থাকে না, দীক্ষালব্ধ জ্ঞান পারতান্ত্রিক। এই সর্ব্ববিষয়ক, সকল-কালীন, অক্রম জ্ঞান সর্ব্বশেষে অনবচ্ছিন্ন পরাজ্যোতিঃ শিবজ্ঞানে পরিণত হয়।

অপরা বা গৌণ শক্তিপাত দেয় ঈশ্বরে অবিচলিত শ্রদ্ধা-ভক্তি। ঈশ্বরাভিমুখীনতায় শক্তিপাত অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু গ্রহণসামর্থ্যের উপর শক্তি-অনুপ্রবেশ নির্ভর করে। যেখানে গ্রহণসামর্থ্য নেই, শক্তিপাত সেখানে কার্য্যকরী হয় না। শক্তিপাত অবশ্যম্ভাবীরূপে আধ্যাত্মিক অভ্যুদয় ও পরিশেষে মুক্তি দেয়। ভক্তিই মুক্তি দেয়। মন্ত্রসিদ্ধি দেয় ভোগ। মন্ত্রসিদ্ধি প্রবৃত্তির বশ্যতা সম্পাদন করে এবং দিব্য ভোগের সঞ্চার করে। ভক্তি দেয় ঈশ্বরসাযুজ্য ও সর্ব্বশেষে ঈশ্বরস্বরূপে অবস্থিতি ও ঈশ্বরের সহিত ঐক্য। যে পরিমাণ শক্তিপাত, সেই পরিমাণ জ্ঞানসিদ্ধিরও সম্ভাবনা। যারা তীব্র-মন্দ, তারা মৃত্যুর পর কোন লোকে অণিমাদি ভোগ প্রাপ্ত হয়, তারপর ক্রমশঃ উচ্চ স্তর প্রাপ্ত হয়ে ঈশ্বরের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়। মধ্য-মন্দ লোকবিশেষে ঐশ্বর্য্য ভোগ করে—সেখানে ভুবনেশ্বরের দ্বারা দীক্ষিত হয়ে অবশেষে পূর্ণত্ব লাভ করে।

মন্দ-মন্দ—এখানেই সালোক্য, সাযুজ্য, সামীপ্য ভোগ করে' ভুবনেশ্বর হতে দীক্ষা গ্রহণ করে' শিবত্ব লাভ করে।

তীব্র-মধ্যের দীক্ষার পরই শিবত্বের সঞ্চার হলেও, দৃঢ়ভাবে শিবত্ব উপলব্ধ হয় না।

তন্ত্রের আচার ঃ পশু, বীর, দিব্য

তন্ত্রশাস্ত্রে আচার এক প্রসিদ্ধ বিষয়। আচার শব্দে সাধনার পদ্ধতি বা প্রণালী বুঝায়। এই তান্ত্রিক অনুশাসন অবলম্বন করে' সাধককে অগ্রসর হতে হয়। প্রত্যেক আচার বিভিন্ন, তাতে বিভিন্ন নির্দ্দেশ আছে, যা অবলম্বন করে' আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মস্ফুরণ করতে হয়। আচার কৌশলবিশেষ। কুশলী পুরুষ আচার অবলম্বনে সিদ্ধিলাভ করে। আচারে সিদ্ধি নিহিত।

সাধকের শক্তি ও চিত্তবৃত্তির গঠনানুসারে আচার বিভিন্ন। পশু আচার প্রাথমিক সোপান। সাধারণ জীবের জন্য এই আচারের ব্যবস্থা। পশু শব্দের অর্থ জীব। এ আচার শাস্ত্রবিধিসম্মত স্বাধ্যায়, দেবতা পূজা, যম, নিয়ম, ধ্যান ইত্যাদি। এ বিধিমার্গসঙ্গত অনুষ্ঠানপ্রধান আচার। অষ্টাঙ্গ যোগের ধ্যান, ধারণাও এতে অন্তর্ভুক্ত। ধ্যান দেবতায়। পশুমার্গে জীবভাব থেকে যায়। জীবত্ব শিবত্বে আরূঢ় বা লয় হয় না। জীবভাবের সংস্কারাদির সাধন হয় মাত্র, কিন্তু তার লয় হয় না।

বীরাচার পশ্বাচার হতে দু'টী বিষয়ে বিশেষভাবে পৃথক্—ভাবে ও ব্যবহারে। বীরাচারী সাধক জীবভাবের স্থলে শিবভাব প্রতিষ্ঠায় তৎপর। এই আচার প্রাণের সংযম ও নিয়মনের মধ্য দিয়া গভীর ধ্যানের দ্বারা অন্তর্নিহিত শিবত্বকে জাগরণ করে এবং ব্যবহারে তার পরীক্ষা ও প্রকাশ করে। বীরভাবের সাধক শিব-অভিন্ন ভাব নিয়ে সাধনা করে; এবং চিচ্ছক্তির দ্বারা তার ভিতর অসীম শক্তি আকর্ষণ করে। পশু শক্তির দ্বারা চালিত—বীর শক্তির চালক। যে শক্তি অন্তরে সুপ্ত, বীর সাধক তাকে জাগ্রত করে' শিবভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ব্যবহারেও এই শক্তি চালিত করে' সে অন্তের ভিতর প্রতিষ্ঠা করিয়ে শিবশক্তিরূপে বিরাজ করে। সাধারণতঃ বীরভাবের সাধক প্রকৃতি (স্ত্রী) মিডিয়াম নিয়ে তার ভিতর বিশ্বশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। স্ত্রী আধারে শক্তি উদ্বোধিত করে' সকল অংশকে দিব্য শ্রী ও শক্তিতে মণ্ডিত করে। তখন তাদের ব্যবহার হয় স্বতন্ত্র—সাধারণ বিধিনিষেধ অতীত হয় এবং সমস্ত সত্বাকে অধ্যাত্মসম্পদে পূর্ণ করে। স্থূলে অধ্যাত্মকে জাগরণ করে' তাকে রূপান্তর করা বীর সাধকের কার্য্য। নানাবিধ রূপে বীর সাধকের কথা তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয়েছে; বিচিত্র স্থূল ক্রিয়া বা অনুষ্ঠানের দ্বারা শক্তির উন্মেষ। বস্তুতঃ স্থূলাধারকে সম্পূর্ণরূপে অধ্যাত্মশক্তির আয়ত্তাধীন করা বীর সাধকের লক্ষ্য। তার সাধনাই স্থূলে—শরীর ও প্রাণে—অধ্যাত্ম শক্তিসম্পাত করে' তার স্বাভাবিক রূপ বদলিয়ে দেওয়া এবং সেখানেই আনন্দানুভব করা। এজন্য বীর সাধকের প্রাণশক্তির প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত আবশ্যক। প্রাণই স্থূলকে পূর্ণরূপে নিয়মন করে। বীর সাধক স্থূল আধারে ক্রিয়াশীল ব'লে তার স্থূল জগতের সিদ্ধি লাভ সুগম। এ সিদ্ধিতে বীর সাধক স্থূল বিশ্বে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে। অবশ্য সূক্ষ্মে প্রতিষ্ঠাই শেষ পর্য্যন্ত স্থূলের উপর দেয় প্রতিষ্ঠা ও শক্তি। পশ্বাচারী সাধক শক্তিতে শরণাপন্ন, ভক্তির ভাবে প্রতিষ্ঠ। বীরাচারী সাধক শক্তিকে আয়ত্ত করে' শক্তিকে চালিত করে। তার কাজই প্রাণজগতের উপর পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব বিস্তার; প্রাণের ও হৃদয়ের পূর্ণ নিয়মন এবং বীরভাবে তাদের পরিচালন।

দিব্যাচার মার্গ বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠ। বিজ্ঞান ভূমিকায় এর সাধনা আরম্ভ এবং শিব ভূমিকায় সমাপ্তি। দিব্যাচার মার্গে সাধক কুণ্ডলিনী শক্তিকে শুধু শরীরাভ্যন্তরে চালনা করে না, তাকে বিজ্ঞানের উর্দ্ধে বিরাট্ স্বরূপে চালিত করে' বিরাটে স্থিতি লাভ করে। দিব্যাচারী প্রকৃতরূপে শক্তির উজ্জ্বল শ্রী, ব্যাপিকা, উন্মনী বৃত্তি প্রভৃতি অনুভব

করে। তার সাধনা ও সিদ্ধি জ্ঞানস্বরূপতায়। বিভূতি ও শক্তির বিস্তার ও খেলায় তার আসক্তি থাকে না। বিজ্ঞান-কেন্দ্রে শক্তির ব্যাপিকা-বৃত্তিতে শক্তির সর্ব্বগতত্বে ও বিশ্বাতীত বিকাশে তিনি পরম শান্ত হন। সকল বিভূতি, কামবসায়িত্ব, প্রকৃতির সকল স্তরে ইচ্ছাপূর্ব্বক অনুপ্রবেশ তার সহজ আয়ত্তাধীন। কিন্তু তাতেও দিব্য সাধক আকৃষ্ট নন, তার স্থিতি ব্রহ্মরূপে এবং প্রাপ্তি ব্রহ্মস্বরূপকে। সিদ্ধিতে আকৃষ্ট না হয়েও, স্বভাবতঃ সিদ্ধির অধিকারী হন তিনি। সিদ্ধিও তিনি পরিচালন করেন না। ব্রহ্মমগ্ন যিনি, তাঁর সিদ্ধিতেও কোন আকর্ষণ থাকে না। সিদ্ধি পরিচালনায় সাধককে উচ্চতম ভূমিকা ত্যাগ করে' অবতরণ করতে হয়। সত্বাকে সঙ্কুচিত করতে হয়। শক্তির আধার হয়েও তিনি শক্তির অতীত হয়ে বিচরণ করেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বিশ্বের কল্যাণের প্রয়োজনে তাঁর অপ্রতিহত সঙ্কল্পের প্রয়োগই যথেষ্ট।

দিব্য সাধকের সত্বা দিব্য রূপেই পরিণত। আধারের সকল স্তরই দিব্য ভাবের স্পন্দনে স্পন্দিত—কোথাও রূঢ়তা, জড়তা থাকে না, তার প্রাণ-মন, এমন কি শরীর পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের ছন্দে ছন্দায়িত। প্রাণবোধ, প্রাণাধার কেন্দ্রগুলি সূক্ষ্মতররূপে ক্রিয়া করে। প্রকৃতি যেন দিব্য হয়ে ওঠে। দিব্য সাধক অধ্যাত্ম ছন্দের মূর্ত্ত প্রতীক।

বীর সাধক এত উর্দ্ধ-ছন্দঃ অধিকৃত করতে পারে না বলেই ঋদ্ধি, সিদ্ধির দিকে তার আকর্ষণ। বীর সাধকের প্রকৃতির উপর কর্ত্তৃত্ব তার স্বকীয় শক্তিতে; প্রকৃতিকে নিজ স্বভাবগত ছন্দে রূপায়িত করতে পারে না সে। প্রকৃতি তখনও তার কাছে পূর্ণ নমনীয় হয়নি। দিব্য সাধকের কাছে প্রকৃতি শক্তির অধ্যাত্মছন্দে পূর্ণ, কোথাও ছন্দপাত হয় না—উচ্চতম হতে নিম্নতম সত্বা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ছন্দের অভিব্যঞ্জনা। সৃষ্টি সর্ব্বত্রই ছন্দে আন্দোলিত। এই বিশ্ব ও বিশ্বাতীত ছন্দে দিব্য সাধক পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। বীরের জীবনে দ্বন্দ্ব আছে, যুদ্ধ আছে, বিজয়শ্রী

আছে ; কিন্তু দিব্যের জীবন ছন্দের অতীত হয়ে বিরাট্ ছন্দের সহিত একীভূত। জীবনগ্রন্থির স্তরে স্তরে এই ছন্দঃ নেমে আসে, উর্দ্ধে এর কেন্দ্র, জীবন-ছন্দঃ তার পূর্ণ বিকশিত। বিরাট্ অবকাশ হতে বিজ্ঞানে, বিজ্ঞান হতে হৃদয়ে ও প্রাণে, প্রাণ হতে অন্নময় কোষে এর প্রবেশ। সত্য ছন্দে জীবন ধৃত, এর প্রত্যক্ষ পরিচয় দিব্যের জীবনে। আধারের প্রতি কেন্দ্র, প্রতি প্রাণ-গ্রন্থি এই ছন্দে স্ফূর্ত্ত—এর ভিতর দিয়ে বিরাটের শক্তি, সামর্থ্য, জ্ঞান দিব্য সাধকে মূর্ত্ত হয়। ছন্দেই সিদ্ধির সঞ্চয় ও প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সিদ্ধির প্রতি আকর্ষণ থাকলে ছন্দঃ মহিমময় হয় না, তার শক্তিও রুদ্ধ হয়—তার বিরাট্ অভিব্যঞ্জনা হয় না।

তত্ত্বানুপ্রবেশের পথ হচ্ছে মূর্ত্তকে ও মূর্ত্তের ছন্দকে অতিক্রম করে' অমূর্ত্তকে স্পর্শ করা। মূর্ত্তের ছন্দের আবেষ্টনী সসীম, তাই অমূর্ত্তের স্পর্শ তাতে সম্ভব নয় ; এইজন্য ছন্দের মহিমময় বিকাশের ভিতর দিয়ে বিরাটে পৌঁছতে হয়। সেই ছন্দধারা ক্রমশঃ আরও উর্দ্ধ শক্তি প্রকাশ করে এবং শিব-ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করে।

যোগদর্শনে অস্মিতার অনুভূতি ও তাতে প্রতিষ্ঠা মুক্তির পথরূপে আদৃত। এই অস্মিতা প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম বিকাশ, সত্ত্বে উজ্জ্বল এবং অন্য সকল বিকৃতি হতে ভিন্ন—তাদের মূলে অস্মিতা বিদ্যমান থাকলেও, তাদের সাথে একীভূত হয় না। এখানে প্রকৃতির স্থূল, সূক্ষ্ম বিকৃতি হতে মুক্তিলাভ করা যায় না। অস্মিতানুভবসম্পন্ন পুরুষ অধিকার করে সকল শক্তি ; কিন্তু শক্তি হতে তিনি অস্মিতভাবে অধিকতর শান্তি অনুভব করেন ; চিত্ত এই স্তরের কোন মূর্ত্ত বিকাশে লিপ্ত হয় না। এক উদার শান্ত উদাসীন বৃত্তিতে পূর্ণ হয়ে শুদ্ধ অস্মিতাতে প্রতিষ্ঠা পায়।

সাংখ্যের অস্মিতার গতি বহু দূরে—ব্যক্তিগত অস্মিতা হ'তে বিরাট্ অস্মিতা, বিরাট্ অস্মিতা হতে শুদ্ধ অস্মিতাতে এর প্রতিষ্ঠা। এই শুদ্ধ অস্মিতা মহৎ তত্ত্ব। অস্মিতাতে ক্রিয়া থাকলেও, তা 'আমি'

মাত্র বৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। তন্ত্রসাধক এরূপ বিশুদ্ধ অস্মিতায় আরূঢ় হলেও, শক্তির ছন্দঃ তাতে অন্তর্হিত হয় না। তন্ত্র অবশ্য অস্মিতাকে বুদ্ধিতেই পর্য্যাবসান করেছে এবং তদূর্দ্ধে সদাবিদ্যা, ঈশ্বর প্রভৃতি তত্ত্বকে স্বীকার করছে; কিন্তু সিদ্ধ সাধক বিশ্বগত চেতনা, বিশ্বাতীত চেতনায় স্থিতি লাভ করলেও, ক্রমিক উর্দ্ধ স্তরের ছন্দকে অবলম্বন করে' তার সত্বার উন্মীলন করে। চেতনা যত স্বপ্রতিষ্ঠামুখী হয়, ছন্দ হয় তত বিরাট্। বৃহত্তর সম্প্রসারিত গতিতে তান্ত্রিক সাধকের এই উন্মীলনাভিমুখী ছন্দই হয় প্রধান অবলম্বন। শুদ্ধ 'আমি'-বৃত্তির ছন্দবোধ সূক্ষ্ম ও প্রসারিত। এই সূক্ষ্ম 'আমি'-বোধ ছন্দ বিশ্বের অন্তর স্পর্শ করে' তাকেও অতিক্রম করে' বিশ্বাতীত বিশ্বের পরিচয় দেয় এবং তাকে অতিক্রম করে। কারণ, ছন্দের উর্দ্ধ গতিতে পরাশক্তি স্পর্শ করে এবং পরাশক্তির কেন্দ্রেই তার স্বাভাবিক গতি। কেন্দ্রে গিয়ে সকল ছন্দের নিবিড় শান্তিস্বরূপতা লাভ হয়। প্রকৃতি জগৎ উদ্ভিন্ন শক্তিছন্দে সহজেই উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়—বিবেকজ জ্ঞান মহিমা স্বভাবে উদ্ভাসিত হয়; কিন্তু শক্তিছন্দ এখানেই স্থিতিলাভ করে না। শক্তির স্বভাবই কেন্দ্রগতি, এই কেন্দ্রের আকর্ষণে সে সকল মহিমা উত্তীর্ণ হয়ে কেন্দ্রে স্থিতিলাভ করে। উদার জ্ঞানে সে ক্রমিক জ্ঞানধারাকে অতিক্রম করে' অক্রম জ্ঞানকেও অতিক্রম করে। অধ্যাত্মজীবনের বিকাশ স্বাভাবিক ধর্ম্ম; এই বিকাশ জ্ঞানের অতীত হয়ে অতিমানসিক দেশ ও কালে সমস্ত বিশ্বের দর্পণস্বরূপ হয়। কিন্তু চিৎ-শক্তি সেখানেও দেশ ও কালকে নিয়ে কেন্দ্রীভূত। শুদ্ধ চিদের প্রকাশ মহিমা তখনও সাধকের অগোচর।

এই দেশকালাতীন চেতনার জ্ঞানই পরা জ্ঞান। এজন্য মানস ও অতিমানসিক ছন্দকেও অতিক্রম করতে হয়। চেতনার এই দেশ-কালরাহিত্যই তার স্বরূপ। মুক্তি অর্থে দেশকালবিচ্যুত চেতনার

আভাস। এ শুধু রমণীয় ছন্দের গতি নয়, এ শুধু চিৎ-শক্তির বিস্ময়কর স্ফূর্ত্তি নয়, চিদ্‌শূন্যে চিদ্‌লহরীর স্বরূপ প্রকাশ নয়, এ অতিমানসিক প্রসারিত অনুভূতিও নয়—চেতনার দেশকালশূন্যতা ও প্রকাশশূন্য স্বরূপতা। এই প্রতিষ্ঠাই শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা; দিব্য মার্গের সাধকের রমণীয় ছন্দোবিকাশের ভিতর দিয়ে এই প্রতিষ্ঠাই লক্ষ্য। ত্যাগ এর ভিত্তি, অ'দিব্য ও দিব্যকে ত্যাগ করেই এখানে স্থিতি। বিন্দুমাত্র শক্তির বিস্ময়কর প্রকাশে আকর্ষণ থাকলে এ স্থিতি লাভ হয় না। ছন্দের ভিতর দিয়েই শক্তি সত্ত্বার সব পর্দ্দা খুলে দেয়। অবশেষে ছন্দের অতীত চেতনার নির্ব্বিশেষ ভূমিকায় শুদ্ধ চেতনার প্রতিষ্ঠা। এ চেতনার প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে শক্তি দ্বিধাকরণবিহীন হয়ে তার নির্ব্বিশেষস্বরূপ প্রকাশ করে। এরূপ নির্ব্বিশেষে শক্তির আধাররূপে শিব বিরাজিত। শক্তি-সাধনায় শক্তিকে নিয়েই শক্তি-ভূমিকার উর্দ্ধে অবস্থিতি। সাধকের এখানে একটা অচিন্ত্যনীয় পরিবর্ত্তন (inversion) শক্তিই ঘটিয়ে দেয়! যে শক্তির কাছে সাধক আত্মসমর্পণ করে, সেই শক্তিই তার জীবত্বকে অপসারিত করে' সাধকের শিবস্বরূতার মধ্যে শক্তির আশ্রিতত্ব প্রকাশ করে। শক্তি-সাধকের এ এক বিচিত্র স্বরূপ। যাকে আশ্রয় করে' সাধন, সেই হয় অবশেষে আশ্রিত। এ পরম রহস্য। শক্তি-সাধনায় সাধকের ভক্তভাব, ঈশ্বরভাব ও শিবভাব—তিনটিরই বিকাশ হয়। ভক্তভাবে আত্মসমর্পণ করে' শক্তির সাযুজ্যলাভ। সাধকের অন্তরে শক্তির বিস্ময়কর বিকাশ—কখনও বা প্রেমে দীপ্ত, কখনও শক্তিতে দৃপ্ত। ভক্তি সাধককে ইষ্টের অন্তরে প্রবেশাধিকার দেয়। কখনও সাধকের প্রেমবিগলিত ভাব, কখনও ইষ্টের শক্তি ও ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পায়। কিন্তু এ অবস্থার উর্দ্ধে, সাধক ক্রমে ইষ্টের সহিত একীভূত হয়ে ঈশ্বরভাবের বিকাশ করে; সাধকের এত বেশী ইষ্টনিষ্ঠা হয় যে, ঈশ্বরপার্থক্য বোধ থাকে না। এই ঈশ্বর ভূমিকায় জীববোধের অপসারণ,

বিশ্ব কুণ্ডলীতে সাধক জাগ্রত হয়ে বিরাট্ স্বরূপে অবস্থান করে। দেশ ও কালের ব্যবধান থাকে না। অবিভাজ্য দেশেও কালের ব্যবধান থাকে না। অবিভাজ্য দেশে ও কালে সাধক বিচরণ করে।

কিন্তু এখানেও শিবভাবের প্রতিষ্ঠা নেই—শক্তির স্ফুরণ এখানে এমনি যে, কাল ও দেশের পার্থক্য থাকে না—এক বিরাট্ অবভাসের মধ্যে অখণ্ড কালের বা গতির (এ ভূমিকায় শক্তি ভিন্ন কালের কোন সত্তা নেই, কাল গতিরূপা—বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, অতীত কিছু নেই) নিত্য বিকাশ। অকালের সন্ধান এ কালে নেই—এ ভূমিকাতেও চেতনার কালে প্রকাশ আছে। অকাল শিবস্বরূপতা (Timelessness) এরও ঊর্দ্ধে। এ অকাল কাল-অকালের ধারণার অতীত, অকাল শুধু কালাকাল নয়—ভাবাভাবেরও অতীত—পরম তত্ত্ব।

তন্ত্রের সাধক পশ্বাচারে ভক্তিমার্গে বিচরণ করে এবং শক্তির শরণাপন্ন হয়ে সেখানে আত্মোৎসর্গ করে। বীরমার্গে শক্তিকে ধার করে' তার আত্মপ্রকাশ—ঐশ্বর্য্যে ও মাধুর্য্যে। বীরমার্গের প্রকাশ স্পষ্টতর হলে সাধকের দিব্যমার্গে প্রবেশ। এখানে শক্তিকে নিয়ে সিদ্ধ সাধক যে কোন স্তরে মহিমা বিকাশ করিতে পারেন এবং অবশেষে স্ব-স্বরূপতায় লীন হন, দিব্য রমণীয় বিকাশকে ত্যাগ করে'। এই-ই পরাকাষ্ঠা। এইখানেই পরমা স্থিতি।

* *
*

উপসংহার ঃ তন্ত্র ও জীবন

তন্ত্রের পরিচয় শেষ হয়েছে। প্রশ্ন ওঠে বর্ত্তমান জীবনে এর উপযোগিতা কি? এ দেশে বস্তুতঃ অধ্যাত্ম-মার্গের কোনও পথই আজকার দিনে তাহার প্রয়োজনীয়তা হারায় নাই। যে পটভূমিকায় জীবনকে আজ দেখছি, তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এ সব সাধনার স্থান কোথায়ও নাই। কিন্তু সত্যিই কি তাই? গভীরভাবে পর্য্যালোচনা করলে ইহাই স্পষ্ট প্রতীত হবে যে, মানুষের চিত্তে ঊর্দ্ধ ও অধোগতি আছে। তার আকর্ষণ বিশ্বের দিকে ও বিশ্বাতীতের দিকে। বিষয়ের পরিবেষ্টনে মানুষ তার সঙ্কীর্ণতাকে অতিক্রম করতে পারে না। এতে কিন্তু তার প্রাণ, মন তৃপ্ত হতে পারে না, যদিও বিষয় নিয়েই তার জীবন। মানুষের বিষয়ের প্রতি প্রীতি যেমন স্বাভাবিক, তার প্রতি বিরক্তিও তেমনি স্বাভাবিক। কারণ মানুষের উদার সত্ত্বা বিষয়াসক্ত হ'য়ে স্ফুরিত হয় না। জীবনের অভিজ্ঞতা বলে দেয়, প্রাণের বৃত্তি ইন্দ্রিয়চরিতার্থতায় সুখ পায় না। তাই সে প্রাণের সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টনী হ'তে চায় মুক্তি। এটা চিরন্তন প্রশ্ন।

কিন্তু এও সত্য যে, জীবনের বৃত্তি ভোগের চরিতার্থতা চায়। এই ভোগস্পৃহা সহসা দূরীভূত করা যায় না। জীবনে ভোগ স্বাভাবিক বৃত্তি, এতেই জীবনের স্ফূর্ত্তি, বৃদ্ধি ও অখণ্ড অনুবৃত্তি—এর বিকাশ সহসা নিরোধ করে' এর উল্লাস নষ্ট করতে তন্ত্র চায় না। জীবনের সবখানিই তন্ত্র গ্রহণ করেছে—ভোগ ও মোক্ষ। জীবনবাদ ও মোক্ষবাদ, দুই-ই তন্ত্রে স্থান পেয়েছে। তন্ত্র দেখিয়েছে জীবন ও মুক্তির সমন্বয়—জীবন্মুক্তি।

ভোগের সব উপকরণ ও উপায়ের কথা তন্ত্রে আছে। তন্ত্রের সাধনা ভোগের প্রাচুর্য্য, পূর্ণতা ও স্বায়ত্তীকরণের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করেছে। স্থূলভোগ, প্রকৃতি বশ্যতা, সঙ্কল্প সিদ্ধি, তান্ত্রিক সাধক সবটাই আয়ত্ত করতে চেয়েছে। কিন্তু এ ভোগ শুধু ভোগের জন্যই নয়।

ভোগমাত্রই কাম্য নয়। ভোগের ভিতর আছে যে বিজ্ঞান সেই বিজ্ঞানই লভ্য। তন্ত্রের প্রত্যেক স্তরের সহিত পরিচিত হবার কৌশল এ বিজ্ঞান দেয়। এই বিজ্ঞানের বলেই তান্ত্রিক সব স্তরেই স্বাধীনভাবে বিচরণ করে। ভোগের ভিতর তিনি থাকেন উদাসীন। জীবনের সব বৃত্তিগুলির সহিত তান্ত্রিক সাধক পরিচিত বলে স্পষ্টতঃ তার প্রতীতি হয় যে, এ সব বৃত্তি পঞ্চভূতের দ্বারা নিয়মিত—এরা পঞ্চভূতেরই বিকাশ। ভূতের সূক্ষতায় বৃত্তির সূক্ষতা। ভূতের শুদ্ধিতে বৃত্তির শুদ্ধি। বৃত্তি বিশ্লেষণ (Psycho analysis) আজ মনোবিজ্ঞানে প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই বিশ্লেষণ অধিমানস বৃত্তির দ্বারা। মানস এই ক্ষেত্রে বৃত্তির স্বভাব নির্ণয় করে; কিন্তু বৃত্তির মূলগত তত্ত্বানুসন্ধানে তাঁরা দক্ষ নন। এ তত্ত্বগুলি অধিকৃত হলেই বৃত্তির উপর পূর্ণ আধিপত্য জন্মে এবং মানুষের স্বভাব একেবারে বদলে যায়।

যে সব ভোগবৃত্তি মানব জীবনকে এত চঞ্চল করে সেগুলি তন্ত্র একেবারে উচ্ছেদ করতে চায় না, বৃত্তিগুলি জীবনে এমনভাবে অনুস্যূত যে, তাদের বিনাশে জীবনেরই বিনাশ। তত্ত্বের অধিকারের দ্বারা (তত্ত্বগুলিও বৃত্তির কারণ) তন্ত্র তাদের নিয়মণ, সংস্করণ ও সূক্ষ্ম স্ফূর্তি করতে চেয়েছে। স্থূল বৃত্তিগুলিকে সূক্ষ্মে পরিণত করাই এ সাধনার প্রথম স্তর। মহাশক্তিকে আকর্ষণ করে' জীবনের বৃত্তিগুলিকে সজীব ও সুতীক্ষ্ণ করা ও তাদের পূর্ণ বিকাশ করাই তন্ত্রের লক্ষ্য। শক্তিহীনতা নয়—শক্তির পরিপূর্ণতাই তার কাম্য।

তন্ত্রের বীরমার্গ প্রকৃতিকে নিঃমিত করে' ভোগের বৃত্তিগুলিকে অধিকৃত করতে চেয়েছে, কিন্তু বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ এতে হয় না। বীরমার্গে নিম্নপ্রকৃতি বশীভূত হয় বটে, পরন্ত পূর্ণরূপে দিব্য হয়ে ওঠে না। বৃত্তির উপাদানে তখনও থাকে অনমনীয়তা, বাধা। বীরমার্গে প্রকৃতি তার বশ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে, যদিও তাকে দমন করে' বীরসাধক

প্রকৃতির হাত হতে মুক্তি পায়, তবুও সেখানে প্রকৃতির দ্রোহিতার সম্ভাবনা থেকে যায়। বীর-মার্গেই সাধকের জী ন শক্তি-উল্লসিত, প্রাচুর্য্য-ভোগ ও সূক্ষ্ম শক্তি বাড়ে। সাধক অতিমানব (Superman) হয়, তার ইচ্ছা হয় অপ্রতিহত, ক্রিয়াশক্তি অদমিত, জ্ঞানের আবরণ সূক্ষ্মলোক হতে হয় উন্মোচিত।

দিব্যমার্গে যেখানে রূপান্তর হয় পূর্ণ, সেখানে প্রবৃত্তির কোন জড়তা, রুক্ষতা বা বাধা থাকে না। সাধকের সবটাই হয় দিব্যশক্তিতে বিভূষিত ও পূর্ণ। সত্ত্বার কোথায়ও এতটুকু আবরণ থাকে না। সবটাই হয় স্বচ্ছ, তেজোময়, অন্তর দিব্যশক্তিতে চালিত হয়, বুদ্ধিসত্ত্বা এত শুদ্ধ হয় যে বিশ্বদর্পণের কাজ করে। উর্দ্ধলোক, অধঃলোক হয় প্রকাশিত; প্রাণ বিশ্বপ্রাণে, বিজ্ঞান বিশ্ববিজ্ঞানে হয় উদ্ভাসিত। দিব্যমার্গের সিদ্ধ সাধক ঈশ্বরবৎ বিচরণ করেন, বিশ্ব কেন্দ্রীভূত হয়। তিনি হন বিশ্বাত্মা। এত বড় সম্ভাবনা এক্ষেত্রে বর্ত্তমান; দিব্য জ্ঞান, দিব্য শক্তি, দিব্য সম্পদের হন তিনি অধিকারী।

অভিব্যক্তির শেষ সীমায় দিব্য ভাবের অধিকারী হ'য়ে তাঁরা হন স্বরূপস্থিত। সাধারণ অভিব্যক্তি বাদে এতবড় অভিব্যক্তির কল্পনাও করা যায় না। এ শুধু অতিমানবের (Superman) কল্পনা নয়। তাতে শক্তির দিব্য দ্যোতনা নেই—কারণ তার ভিতর থাকে না বিশ্বের উপর কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি বা নিয়ন্ত্রণ ইচ্ছা। দিব্য-সম্পদে পূর্ণ পুরুষ সকল কর্ত্তৃত্বে থাকেন উদাসীন, শক্তির এমনি গৈরিকপ্রবাহ সেখানে যে, সব স্ফূরণ হয় স্বাভাবিকরূপে, সব অধিকার হয় সহজরূপে।

বর্ত্তমানে জীবনের এরূপ অভিব্যক্তির কথা কেহ ভাবে না, কল্পনাও করে না; কিন্তু জীবনের শক্তি-সম্ভাব্যে এটা যে অনুস্যূত তাতেও সন্দেহ নেই। এরূপ জীবনই সকল সজ্ঘর্ষ, সকল বিরোধ হতে মুক্ত। এরূপ জীবনে পৃথিবীর সব স্পর্শ থাকে, দিব্যভাবের

অভিব্যক্তির দ্বারা তারা পার্থিব জীবনকে সুন্দর, মধুর ও কল্যাণময় করে তোলেন। এই তো মানবতার চরম বিকাশ! তন্ত্রের মতে এরূপ বিকাশের সম্ভাবনা মানুষের মধ্যে আছে—ইচ্ছা (will) নিয়ন্ত্রণমূলক সাধনার দ্বারা এরূপ বিকাশের পথ উন্মুক্ত করাই উচ্চতর অভ্যুদয়ের পথ। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে বা সামাজিক জীবনে যে দ্বন্দ্ব, তার কারণ বিকাশের পথে মলিন কামনা ও অশোভনীয় সত্তার উপস্থিতি। তন্ত্র সাধনার দ্বারা এই দ্বন্দ্ব ও মলিন সত্তাকে নিরাকৃত করতে চেয়েছে। মানুষের দিব্যভাবের দ্বারা তার মলিন সত্তাকে পরিচ্ছন্ন করে' ব্যক্তির ও সমাজের উচ্চতর বিকাশ-সাধনই তন্ত্রের উদ্দেশ্য। দিব্য জীবনের সুষমায় পূর্ণ করে' মানুষকে সুন্দর ও মহিমান্বিত করতে চেয়েছে তন্ত্র। জীবনকে দিব্যভাবে পূর্ণ করে' দিব্যসঙ্ঘ রচনা করতেও তন্ত্র চেষ্টা পেয়েছে। জীবনের মূল থেকে দ্বন্দ্ব উৎপাটিত করে' জীবনের সুষ্ঠুতর পরিণতি তন্ত্র শুধু আকাঙ্ক্ষা করে নি, পূর্ণ করেছে, আর দিয়েছে তার সাধনার ইঙ্গিত।

এখানেই তন্ত্রের নূতন সমাজ-বিধান। চেতনার পূর্ণ সঞ্চারে যা' কালিমাযুক্ত তাকে অপসারিত করে' দিব্য দ্যোতনায় পূর্ণ ব্যক্তি নবীন সমাজতন্ত্রের উদ্বোধন করে। এরূপ সমাজতন্ত্র ব্যক্তি বা সমাজের মধ্যে কোন বৈষম্য সৃষ্টি করে না—চেতনা ও প্রাণের শুদ্ধি হেতু এমন ভাবে সাধক জাগ্রত হয় যে, সমষ্টির সত্তায় সে উদ্বোধিত হয়, সমষ্টি প্রাণে একপ্রাণতা অনুভব করে, একই ভাবে ভাবান্বিত হয়, একই বিজ্ঞানে পরিচালিত হয়। এটা শুধু একটা দার্শনিক দৃষ্টি নয়—বিজ্ঞানালোককে প্রাণকেন্দ্রে নামিয়ে এনে প্রাণের পরিশুদ্ধির দ্বারা প্রাণকে স্বচ্ছ করে' সমষ্টির ভিতর একপ্রাণতা প্রতিষ্ঠা করা। বিজ্ঞান ও প্রাণের অশুদ্ধিতার জন্যই এত সংঘর্ষ এবং একে বাইরের মতবাদ বা চেষ্টার দ্বারা কিছুতেই নিবারণ করা যায় না। সাধক তাই বুঝে দিব্য সঙ্ঘ রচনা করেন। অনন্ত প্রসারিত দৃষ্টি সাধককে দেয় সত্যের পরিচয়, তাই তারা মানব

সমাজে দিব্য প্রেরণা সঞ্চার করে' উজ্জলতার ও মধুরতার সাক্ষাৎকার করতে চেয়েছেন।

এই বিজ্ঞানালোকই প্রাণের ছন্দঃ-প্রতিষ্ঠ পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধের উপর নূতন আলোকসম্পাত করে। নারী—নারী, বিশ্বশক্তির মহাধার। তাই তন্ত্রে নারী উপাস্য—মহাশক্তির চিন্ময় বিগ্রহ। নারীর ভিতর শক্তির জাগরণ সহজ ও স্বাভাবিক, নারীর আধারে জাগ্রত শক্তি পুরুষকে কল্যাণের পথে করে উদ্বোধিত। নারীকে অধ্যাত্মজীবনে সাধারণতঃ দূরে রাখা হয়েছে; তন্ত্র কিন্তু তাকে আহ্বান করে' সিদ্ধির পরম সহায়রূপে গ্রহণ করেছে। নারীসত্তার সবটুকুই পবিত্র, নারী শক্তির প্রতীক। এই নারী প্রতীকে মহাশক্তির উদ্বোধন সহজ, তাই জীবন্ত স্ত্রী-প্রতীকে শক্তির জাগরণ ও অবতরণ তান্ত্রিকের পরম কাম্য। আধারের প্রতিটি কেন্দ্রের বাধা বিঘ্ন ও অশুদ্ধি অপসারিত করে' নারী ও পুরুষ উভয়েই হয় পুঞ্জীভূত শক্তির বিকাশের কেন্দ্র। নারী দিব্যশক্তির বিভূতিতে হয় পূর্ণ ও বিভূষিত। এরূপে পুরুষ নারীতে এবং নারী পুরুষে শক্তির সঞ্চারে তাদের ভিতর ব্যবধান দূরীভূত করে' পারস্পরিক জীবন-ছন্দে অলৌকিক সমতা ও একপ্রাণতা প্রতিষ্ঠা করে এবং উভয়েই পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। তন্ত্রের ভাষায় "সাম্য রস" বিধানে পরম শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়।

এ বিষয়ে তন্ত্রের মত প্রচলিত স্মার্ত্ত মত হতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। স্মার্ত্তমতে বিরুদ্ধ শক্তি হতে দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ রূপে বিবেচিত হয়েছে। তন্ত্র কিন্তু এই বিরোধী শক্তি নিয়েই যোগসাধনা করেছে এবং শক্তি-বিজ্ঞানে দক্ষ হয়ে বিরোধের স্থানে অপূর্ব্ব সমতা প্রতিষ্ঠা করে' শক্তির সাহায্যে জীবনের ও সাধনার পথ সুগম, সুন্দর ও সহজ করেছে। স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ যদি নিম্নাভিমুখী না হয়, তবে এই আকর্ষণই চিত্তের গভীর ছন্দোবৃত্তি জাগিয়ে তোলে—যাতে হয় সত্তার জাগরণ। সাধনায় নারী-পুরুষ পরস্পর সহায়ক হয়। একজন ঊর্দ্ধ-সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হলে'

আর একজনের সেই ছন্দের আকর্ষণে সত্ত্বার গভীর সংবেদন ও আন্দোলন উপস্থিত হয়। আর যেখানে পরস্পরের প্রেম-প্রীতির আকর্ষণ খুব বেশী এবং সমস্ত স্বার্থ-বিদ্বেষ হতে মুক্ত, সেখানে কুণ্ডলিনীর জাগরণ অবশ্যম্ভাবী। তন্ত্র এভাবে জীবনের স্বাভাবিক লৌকিক সম্বন্ধকে ছন্দানুবৃত্তি লাভে উদ্বুদ্ধ করে' সত্ত্বার বিভিন্ন কেন্দ্রস্থানগুলিতে চেতনার ও প্রাণের তীব্র সঞ্চার করার ইঙ্গিত দিয়েছে। তন্ত্র-সাধক ক্রমশঃ উর্দ্ধ-প্রাণ সঞ্চার করে' বিরাট্ ব্যাপ্ত চেতনায় অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়। এই অনুপ্রবেশ সহজ ও স্বাভাবিক হয় নারী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণমূলক সমুন্নয়নে। সত্ত্বার এই অপূর্ব্ব জাগরণ তখনই সম্ভব যখন উভয়েরই লক্ষ্য এক পরম কেন্দ্রাভিমুখী হয়ে থাকে।

তন্ত্রের লক্ষ্য হচ্ছে, সব ব্যবহারে সঙ্কীর্ণ ভাব ও গতিকে প্রসারীভূত ভাব ও গতিতে পরিণত করে' দিব্য জীবন প্রতিষ্ঠা করা। এ সম্ভব হয় শক্তির গভীর প্রেরণা হতে, যাতে বিরাটের অভ্যুদয়। জীবনের প্রতি সঞ্চারে আছে যে বিরাটের ছন্দ, তাকে ধরেই এই সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলার ইঙ্গিত তন্ত্রে যেমন সুস্পষ্ট এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। আমাদের আধুনিক জীবন ও পরিবেশের সর্ব্বক্ষেত্র যেরূপ ছন্দোহীন বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ ও স্বার্থক্লিষ্ট তুচ্ছ দ্বেষ-বিদ্বেষে ভরে উঠেছে তাতে এই তন্ত্র-সাধনার ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধিই পেয়েছে। তন্ত্রের অনুশাসন আমাদের সাধন ও সাধারণ জীবনের ক্ষেত্রে নিত্তনৈমিত্তিক অনুষ্ঠিত হলেও, তন্ত্রের গভীর মর্ম্ম এবং জীবনে তার পরিপূর্ণ প্রয়োগ, সিদ্ধি ও বিকাশের বিষয় আমরা তেমন অবহিত নই। অপরপক্ষে তন্ত্রের রহস্য বিদীর্ণ করতে না পেরে বরং বিরূপ মনোভাবই লক্ষ্যে পড়ে। অথচ জীবন-বিকাশের এমন পরিপূর্ণ ইঙ্গিত আর কোথাও আছে কিনা, সন্দেহ। এই জন্যই তন্ত্রের মর্ম্মোদ্ঘাটন করার জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। ইহা সফল হ'লে আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

সমাপ্ত